মাসুদ রানা

মৃত্যুঘণ্টা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মৃত্যুঘণ্টা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

খুন হয়ে গেলেন জেনেটিক্স বিজ্ঞানী আহসান মোবারক। এবার খুন হবে তাঁর মেয়ে মোনা? বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল বিজ্ঞানীর বাড়ি! ইউএন অফিসে কে বা কারা দিল ভাইরাস মাখা চিঠি? এ কোন্ কাল্ট, লড়ছে ধর্মের বিরুদ্ধে? দুবাইয়ের বুর্জ আল আরব হোটেলের বলরুমে রানার সঙ্গে বেধে গেল মরণপণ লড়াই! সত্যিই কি অমৃত তৈরি করছিল বাপ-বেটিতে মিলে? মস্ত ঝুঁকি নিয়ে খুঁজতে গেল ও উত্তপ্ত মরুভূমিতে। ...তারপর? মোনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ইরানের পরিত্যক্ত এক দ্বীপে রানা দেখা পেল ভয়ঙ্কর এক শত্রুর! কণ্ঠে অকৃত্রিম ঘৃণা নিয়ে সে বলল:
'এবার পারলে বাঁচতে চেষ্টা করো দেখি, বাঙালি গুপ্তচর!'
বুঝল রানা, সত্যিই আজ বেজে গেছে ওর মৃত্যুঘণ্টা!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

মাসুদ রানা ৪৪৮

মৃত্যুঘণ্টা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

...::ShOpNoHiN::...

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7448-3

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৬

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১১৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-448
MRITYUGHANTA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' চৌত্রিশ টাকা

ShOnNoHiN::..

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

আহত বিড়ালের মত করুণ সুরে ওঁয়াউঁ-ওঁয়াউঁ শব্দে বিলাপ করছে মরুভূমির ঝোড়ো হাওয়া। থম মেরে তাঁবুতে বসে দমকা বাতাসের মাতম শুনছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবু রশিদ। এক ঘণ্টাও হয়নি খাড়া করেছেন তিনি এই তাঁবু। বাইরে জোরালো ফড়াৎ-ফড়াৎ শব্দে তাঁবুর পাতলা দেয়ালে চাপড় মারছে এখন দমকা হাওয়া, যে-কোনও মুহূর্তে বালির গর্ত থেকে হ্যাঁচকা টানে উপড়ে নেবে খুঁটি, ছেঁড়া পাতার মত উড়াল দেবে এই পলকা আশ্রয়। ক্রমেই আরও বাড়ছে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার তোড়।

দক্ষিণ ইরান, উনিশ শ' ঊনআশি।

ওদিক থেকে মন সরিয়ে প্রাচীন কবরে চোখ রাখলেন আবু রশিদ। ক্যানভাসের তাঁবু ভেদ করে আসছে দিনের কাদাটে-ধূসর আলো, কিন্তু পৌঁছুবে না পাঁচ ফুট গভীর কবরের মেঝেতে। তার প্রয়োজনও নেই, নিজ কাজ ঠিকই করছে লণ্ঠনের হলদে রশ্মি।

কবরের সংকীর্ণ মেঝেতে শুয়ে আছে এক নরকঙ্কাল, ঊরুর পাশেই ধাতব টিউব। ওটাকে এখনও দু'হাতে জাপ্টে ধরে আছে প্রাচীন মানুষটা।

খুব সাবধানে ধাতব টিউবটা তুলে নিলেন আবু রশিদ।

ওটা সম্ভবত তামার তৈরি। একসময়ে খাপের ভেতর ছিল, কিন্তু বিগত সাত হাজার বছর ধরে নিষ্ঠুর মরুভূমির নিচে থেকে ক্ষয়ে গিয়ে ওই চামড়া এখন ক' ফালি জীর্ণ আবর্জনা।

আবু রশিদের পেছনে বসে আছে রোদে পোড়া এক তরুণ। সোনালি কোঁকড়ানো চুল, জুলফি মিশেছে দাড়ির সঙ্গে। ব্যস্ত হয়ে ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে ট্র্যানযিস্টর রেডিয়োতে ধরতে চাইছে বিবিসির বার্তা। বারবার ফাইন টিউন করছে, কিন্তু বারবারই ওকে কাঁচকলা দেখিয়ে আরও বাড়ছে ঝড়ের তাণ্ডব, হারিয়ে যাচ্ছে সংবাদ-পাঠকের দুর্বল কণ্ঠ।

..::ShOpNoHiN::..

'ধুৎ!' খুব সাবধানে ডায়াল নেড়ে আরেকটু ভাল সিগনাল চাইল তরুণ।

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখলেন আবু রশিদ। 'ওটা রাখো, টম।' হাতের ইশারা করলেন এগিয়ে আসতে। 'বুঝতে পারছ, কী পেয়েছি আমরা? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কবর! বলতে পারো, এই লোক ছিল প্রায় আদমের বয়সী একজন!'

টম কনোরি আমেরিকান অ্যানথ্রপোলজিস্ট, মাত্র কিছু দিন আগে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। আবু রশিদের দক্ষিণ ইরান পুরাকীর্তি খনন কাজে যোগ দেয়ার জন্যে এসেছে সে এবং তার মত আরও কয়েকজন আমেরিকান তরুণ। মূল কাজ চলছে এখান থেকে মাত্র বিশ মাইল পুবে। রশিদের ধারণা, তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন ইরানের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি। ওটা এমন কী ইরাক সীমান্তবর্তী 'আর' শহরের চেয়েও পুরনো। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন সেই আমলের বাণিজ্যপথ। আর সেটা অনুসরণ করে এখানে এসেই পেয়েছেন এই হাজার হাজার বছর আগের কবর।

রহস্যময় কবর উন্মোচিত হতে না হতেই আকাশের কালো, গম্ভীর মুখ দেখে বুঝে গেলেন প্রফেসর, এবার সহজে মুক্তি নেই

তাঁদের। টমের সাহায্য নিয়ে তাড়াহুড়ো করে দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন আশ্রয়স্থল। আগে ভাবেননি, পরিবেশ এতই খারাপ হবে যে ঠাঁই নিতে হবে তাঁবুর ভেতর। বলতে গেলে প্রায় হঠাৎ করেই এল সাইমুম। যদিও, তার আগে পুরো দুটো দিন মুখ গোমড়া করে ছিল আকাশ। ঘণ্টাখানেক আগে নর্তন-কুর্দন শুরু করেছে খেপা প্রকৃতি। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া এখন কিছুই করার নেই, কিন্তু সময়টা পুরো নষ্ট করেননি তিনি, এগিয়ে নিয়েছেন খনন কাজ। এবার চারপাশটা ভালভাবে খুঁজে দেখবেন বলে ঠিক করেছেন, এমন সময় রেডিয়োতে তেহরানের রাজনৈতিক আঙিনার দুর্যোগের দুঃসংবাদ এল। সব শুনে মুখ শুকিয়ে গেল টম কনোরিির।

'পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, স্যর,' বলল তরুণ টম।

'তুমি কী করে বুঝলে? রেডিয়োতে তেমন কিছুই তো বলছে না।'

'বোঝা তো সহজ,' জোর দিয়ে বলল টম, 'বন্ধ করে দিয়েছে এয়ারপোর্ট। তেহরানের দিকে আসা সব বিমান গিয়ে নামছে আশপাশের সব দেশে।'

শাহ্ ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন যত বেড়েছে, আবু রশিদের দলের আমেরিকান ছাত্রের সংখ্যা ততই কমেছে, তারা সময় থাকতে ত্যাগ করেছে এই দেশ। রয়ে গেছে শুধু টম কনোরি ও তার এক বন্ধু। টমের এখন আফসোস হচ্ছে, জীবনের ওপর এই মারাত্মক ঝুঁকি না নিলেই ভাল করত ওরা।

'ওরা চাইছে পলাতক শাহ্‌কে ফিরিয়ে এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে,' বলল টম, 'সেজন্যে জিম্মি করছে বিদেশি... বিশেষ করে আমেরিকানদেরকে।'

গত কয়েক মাসে খুবই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে বিশাল এই

দেশ। এবার বুঝি ফুরিয়ে এল সাধারণ মানুষের ওপর শাহের দুঃসহ নির্যাতন। অত্যাচারী ওই দানবের চারপাশের দেয়াল ও ছাত ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মত। আর এই পরিবর্তন যে আসবেই, তা অনেক আগেই বুঝেছেন আবু রশিদ। কিন্তু দুঃখ তার, আজ যে-লোকের পেছনে জড় হয়েছে জনতা, সে নিজে এক নিষ্ঠুর মনের ধর্মান্ধ লোক। শুধু তা-ই নয়, সত্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জেঁকে বসেছে সে অশিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে। মহানবীর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ও পবিত্র কুরআনের আয়াত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজ লোকদের বুঝিয়েছে: আসলে প্রয়োজনে আত্মহত্যা করা জায়েজ। তাতে সমস্যা হবে না বেহেস্তে প্রবেশে।

এখনও অনেকে আশা করছেন, যারা শাহ্-র বিরুদ্ধে লড়ছে, তারা দেশে কায়েম করবে গণতন্ত্র। কিন্তু বেশিরভাগ পর্যালোচক ভাবছেন, এবার সত্যিই মধ্য যুগে ফিরবে ইরান। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন রশিদ, যেন বড় কোনও সর্বনাশ না হয় দেশটার। কিন্তু মনে মনে জানেন, একবার ভালভাবে পেণ্ডুলাম দুলিয়ে দিলে, ওটা যাবেই উল্টো পথে। শাহ্‌র অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। তখন নতুন দলের অন্ধ-ক্রোধের বলি হবে নিরপেক্ষ অনেকে। হয়তো তাদেরই একজন হবেন তিনি।

'তেহরান এখান থেকে বহু দূরে,' বললেন রশিদ। 'তবুও ভাবছ, ঝড়ের ভেতর এক শ' মাইলেরও বেশি মরুভূমি পাড়ি দেবে ওরা দু'জন আমেরিকানকে হাতের মুঠোয় পেতে?'

চারপাশে তাকাল টম কনোরি। জোর আওয়াজ তুলে তাঁবুর ওপর আছড়ে পড়ছে তুমুল হাওয়া। ওর মনে হলো, সত্যিই, মাত্র দু'জন আমেরিকানকে বাগে পেতে এত কষ্ট করবে না বিপ্লবীরা।

'তা ছাড়া, তুমি রোদে পুড়ে প্রায় আমার মতই তামাটে,' বললেন রশিদ। 'দরকার পড়লে বোরকা পরিয়ে দেব, মুখটা ঢেকে নিলেই সবাই ভাববে তুমি আমার বিবি।'

'তাতেও দারুণ কষ্ট পাব মনে, স্যর,' বলল টম।

মুচকি হাসলেন রশিদ। 'আমারই কি ভাল লাগবে নাকি তা হলে! ধেড়ে এক যুবক আমার বউয়ের অভিনয় করছে!'

খুবই উদ্বিগ্ন টম, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ঠোঁটে দেখা দিল দুষ্টু হাসি। একবার মাথা নেড়ে মেঝেতে রেডিয়ো রেখে ক্রল করে চলে এল ট্রেঞ্চের মত কবরের পাশে। 'বলুন তো, আপনি আসলে কীজন্যে এত উত্তেজিত?'

'মনোযোগ দাও, টম,' ধাতব টিউব দেখালেন রশিদ। মুড়িয়ে রাখা পাতে কিছু চিহ্ন। আঁকা বা রং করা হয়নি। যেন বড় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গভীর দাগ বসিয়ে দেয়া হয়েছে পাতের বুকে।

চোখ বিস্ফারিত হলো টম কনোরির। 'তার মানে, ডেড সি এলাকা থেকে পাওয়া ওই তাম্রলিপির মত?'

'ঠিক তা-ই,' সায় দিলেন রশিদ। 'আমাদের থিয়োরি ঠিক হলে, এই ধাতব পাত হয়তো আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বেশি পুরনো তাম্রলিপি। অর্থাৎ, সাত হাজার বছর আগের! হয়তো এক শ'টা তথ্য জানতে পারব আমরা দুর্মূল্য এই জিনিস থেকে— জানব সেই সময়ের সমাজ সম্পর্কে।'

সাবধানে কবরে নেমে পড়লেন তিনি, কিছুই এলোমেলো না করে চলে গেলেন পাথরের এক ট্যাবলেটের সামনে। ঘোড়ার রোমের ব্রাশ দিয়ে ওটার ওপর থেকে বালি সরাতেই, দেখা দিল ছোট একটা সিম্বল। তখনই রশিদ বুঝলেন, ওই ট্যাবলেট পাথরের নয়, কাদা বা অ্যাডোবি দিয়ে তৈরি। পরে শুকিয়ে নেয়া হয়েছে আগুনে বা রোদে। পাথরের না হলেও খুব পোক্ত

মনে হলো ওটাকে।

সতর্ক হয়ে খোদাই করা চিহ্নের ওপর ফুঁ দিলেন রশিদ। ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলেন ওপরের অংশ।

ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো ফেলল টম কনোরি।

হলদে আলোয় অক্ষরগুলো দেখলেন রশিদ।

'কী বুঝছেন, স্যর?' জানতে চাইল টম।

বুকের ভেতর অদ্ভুত এক অনুভূতি টের পেলেন রশিদ। একই সঙ্গে চেপে বসল হতাশা। 'প্রোটো-এলামাইট।' অত্যন্ত প্রাচীন আমলে লেখা, কিন্তু দুঃখজনক, আজও এসব লেখার অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি কেউ। কখনও অনুবাদ হয়নি এই জিনিস।

চোয়াল শক্ত হলো আবু রশিদের। না, রহস্যময় লেখা হিসেবে রয়ে যাবে কাদার তৈরি এই ট্যাবলেটও। কঙ্কালের হাত থেকে নেয়া তামার লিপি আবারও দেখলেন। কাদার ট্যাবলেটের মতই একই ভাষায় কিছু লেখা।

একবার মাথা দোলালেন রশিদ, এখন আর ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনছেন না। আবারও চোখ রাখলেন ট্যাবলেটের মাঝের চিহ্নে। ওটা বৃত্তের মত, কিন্তু চারদিকে চারটে খাঁজ। দেখতে অনেকটা কমপাসের কাঁটার মত। বৃত্তের ভেতরে চারকোনা এক অংশ, তার বুকে খাড়া আয়তক্ষেত্র।

সবমিলে এই সিম্বল মোটেও প্রোটো-এলামাইট স্ক্রিপ্টের মত নয়। গভীর চাপ দিয়ে তৈরি। ট্যাবলেটের অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে মিল নেই এই চিহ্নের। তবুও মনে হলো, আগেও দেখেছেন ওটা।

ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও শোনা গেল যিপার টেনে তোলার আওয়াজ। এই ঝঞ্ঝায় কে এল দেখতে ঘুরে তাকালেন রশিদ। তাঁবুতে ঢুকেছে দ্বিতীয় আমেরিকান ছাত্র, পিটার ক্যাস্টিল, ভয়ে

ফ্যাকাসে মুখ।

'তাঁবুর ফ্ল্যাপ বন্ধ করো,' তাড়া দিলেন রশিদ। চোখে-মুখে এসে পড়ছে এক রাশ বালি।

'এখান থেকে চলে যেতে হবে,' রশিদের দিকে না চেয়ে সরাসরি টম কনোরিকে বলল ক্যাস্টিল।

'পিটার!' ধমকের সুরে বললেন রশিদ।

'ওরা আসছে,' জবাবে বলল তরুণ, 'সব খনন এলাকায় যাচ্ছে আমেরিকানদেরকে বন্দি করতে।'

রশিদের দিকে তাকাল টম কনোরি।

'এবার আসবে এখানে, ট্রাকে করে আসছে,' জোর দিয়ে বলল ক্যাস্টিল। 'ওদের সঙ্গে আছে বন্দুক। জান বাঁচাতে চাইলে পালাতে হবে।'

'তোমার কোনও ভুল হচ্ছে না তো, পিটার?' জিজ্ঞেস করল টম কনোরি।

'এমি আর ফারহানকে গুলি করেছে। তার আগে বলেছে ওরা বিশ্বাসঘাতক। তখন পালাতে শুরু করি আমরা।'

'অন্যরা ঠিক আছে?' জানতে চাইল টম।

মাথা নাড়ল ক্যাস্টিল। যা দেখে এসেছে, তাতে চোখে-মুখে নিদারুণ ভয়। 'না, ওরা ভাল নেই।'

ট্যাবলেটের দিকে ঘুরলেন রশিদ, দ্রুত চলছে মগজ। ভীষণ অসুস্থ বোধ করছেন। এমি আর ফারহান তাঁরই ছাত্র, ইরানিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করত। অন্যতম সেরা ছাত্র। খুন হয়ে গেছে বিপ্লবীদের হাতে।

'মিস্টার রশিদ, পালাতে হবে আমাদেরকে,' মিনতির সুরে বলল ক্যাস্টিল

রশিদ বুঝতে পারছেন, ছেলেটা ঠিকই বলেছে। আসলে তারই ভুল, গ্রামের দিকে এভাবে লেলিহান আগুনের মত বিপ্লব

ছড়িয়ে পড়বে, মোটেও বুঝতে পারেননি।

'শুনুন,' ফুল ভলিউমে রেডিয়ো ছাড়ল টম কনোরি।

স্ট্যাটিকের ভেতর ভাঙা ভাঙাভাবে এল সংবাদ পরিবেশকের কথা: '...ওরা এখন দখল করছে আমেরিকান এম্বেসি, চারপাশের রাস্তা ভরে গেছে ভিড়ে। জ্বলছে আমেরিকার পতাকা। সবাই চিৎকার করে বলছে, আমেরিকা নিপাত যাক...'

'বাঁচতে চাইলে পালাতে হবে,' বলল কনোরি।

মাথা দোলালেন রশিদ। যদিও মেনে নিতে পারছেন না। ব্যস্ত হয়ে টুকটাক কিছু জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছে কনোরি। আনমনে মাটির ট্যাবলেট দেখলেন রশিদ। আশ্চর্য, আগে কোথায় দেখেছেন ওই সিম্বল?

তাঁবু থেকে বেরোল ক্যাস্টিল। দরজায় থেমে ঘুরে রশিদকে দেখল কনোরি। 'আসুন, এখানে থাকলে মরবেন।'

'আমার কিছুই হবে না,' বললেন রশিদ।

'ভুল ভাবছেন,' বলল তরুণ, 'ওরা জানে, আপনি কাজ করেন আমেরিকানদের সঙ্গে। আমাদেরকে এখানে না পেলেও আপনাকে পাবে। তখন আর জানে বাঁচতে দেবে না।'

যুক্তিটা বুঝলেন রশিদ, কিন্তু মন চাইছে না পালাতে। বুঝতে পারছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়ে যাওয়ার খুব কাছে পৌঁছে গেছেন। সেটা বিপ্লব বা অস্ত্রের জোরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের চেয়েও অনেক জরুরি কিছু।

'এই সিম্বল, আগেও দেখেছি,' ট্যাবলেট দেখালেন তিনি।

ওঁউওঁ-ওঁউওঁ শব্দে হাহাকার করছে ঝোড়ো হাওয়া, থরথর করে কাঁপছে গোটা তাঁবু। এসব বিপদ যেন কিছুই নয়, চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা খাটাতে চাইছেন রশিদ।

'ওটা আগে দেখুন বা না দেখুন, এখন কিছুই যায় আসে না,' বলল টম কনোরি।

'ভুল বললে!'

'স্যর, আপনি যদি মরেই যান, সিম্বল দিয়ে কী করবেন?'

আবারও ফ্ল্যাপের ভেতর মাথা ঢোকাল ক্যাস্টিল। 'ওরা ট্রাক ছেড়ে দিচ্ছে।'

আসলেই কিছু করার নেই। রশিদ বুঝে গেছেন, তাঁকে যেতেই হবে। শেষবারের মত সিম্বলটা দেখলেন তিনি। মনে গেঁথে নিলেন চিহ্নটা, তারপর কবর থেকে উঠে দরজার দিকে যেতে গিয়েও থামলেন, খপ করে তুলে নিলেন কঙ্কালের কাছ থেকে পাওয়া তামার লিপিটা।

তাঁবু থেকে বেরোবার সময় শপথ করলেন, জান থাকতে বিপ্লবীদের হাতে পড়তে দেবেন না তাঁর আবিষ্কার। এক হাতে টেনে তুললেন তাঁবুর একটা খুঁটি। বাকি কাজ সারল দমকা হাওয়া। ভেতরে বাতাস ঢুকতেই বেলুনের মত ফুলে উঠল তাঁবু, মরুভূমির ওপর দিয়ে সুতো কাটা, মস্ত এক ঘুড়ির ভঙ্গিতে উড়ে গেল।

চল্লিশ গজ দূরে অপেক্ষা করছে বড় এক ডিজেল ট্রাক। এরই ভেতর ওদিকে দৌড় শুরু করেছে ক্যাস্টিল ও কনোরি।

'আসুন, স্যর!' চিৎকার করল ক্যাস্টিল।

চোখের ওপর হাত রেখে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে ট্রাকের দিকে ছুটলেন রশিদ। কিছুক্ষণ পর দুই আমেরিকানের পেছনে উঠে পড়লেন ট্রাকের বেডে। বসে আছে আরও তিনজন। ক্যাব ভরে গেছে আগেই।

দূরে আবছা রোদে আয়নার ঝিলিক দেখলেন রশিদ। ওদিক থেকে আসছে বেশ কয়েকটা গাড়ি। একটু পরেই পৌঁছে যাবে এখানে।

হাতে সময় নেই। চালু হলো ট্রাক।

গিয়ার বদলাতে গিয়ে হোঁচট খেল ট্রাক, মেঝেতে হুমড়ি

খেয়ে পড়লেন রশিদ। হাত থেকে ছুটে গেছে তাম্রলিপি। ট্রাকের বেডের পেছনে খটাং করে পড়েই ছিটকে চলে গেল নিচের বালিতে। এদিকে গতি তুলেছে ট্রাক।

হায়-হায় করে উঠলেন রশিদ। প্রায় ক্রল করে চলে গেলেন ট্রাকের বেডের শেষ মাথায়। ঠিক করেছেন লাফিয়ে নেমে পড়বেন। অবশ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝলেন, অনেক জোরে ছুটছে ট্রাক। ঘুরে খপ করে কনোরির বাহু ধরলেন তিনি। 'ড্রাইভারকে থামতে বলো! খুবই জরুরি!'

ঝড়ের মাতম আর ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজের ওপর দিয়ে প্রায় হারিয়ে গেল তাঁর কথা।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে!' চিৎকার করে বলল কনোরি।

'না!' প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন রশিদ, ঠিক করেছেন দ্রুতগামী ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামবেন। কিন্তু শক্ত হাতে তাঁর কাঁধ চেপে ধরল কনোরি।

'আমাকে ছেড়ে দাও!'

'না, স্যর। অনেক দেরি হয়ে গেছে! ওটা আর পাবেন না!'

এরই ভেতর অন্তত তিরিশ মাইল বেগে ছুটছে ট্রাক। বিপ্লবীরা আসছে পুব থেকে। ট্রাক থেকে নেমে পড়লে বাঁচতে পারবেন না রশিদ।

হতাশার কারণে শিথিল হলো তাঁর দেহ। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল কনোরি। ঝড়ের ভেতর দিয়ে বহু দূরে তাকালেন রশিদ। দমে গেছে মনটা। দেখা গেল না তাম্রলিপি।

মাত্র দু'মিনিটে সাগরের ঢেউয়ের মত ঝোড়ো বালির তলে হারিয়ে যাবে ওটা। হয়তো এক ঘণ্টার ভেতর বালিতে বুজে যাবে সব গর্ত, অথবা সময় নেবে কয়েক দিন। চিহ্ন না থাকলে চিরকালের জন্যেই হারিয়ে যাবে ওই কবর। কেউ জানবে না ওটাতে কী আছে।

দুই

বর্তমান সময়।

নিউ ইয়র্কে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি বিল্ডিঙের সিকিউরিটি চেক পয়েন্টে আইডি দেখালেন মিয ডেবি ম্যাকেঞ্জি। আসলে দরকার নেই, কারণ প্রতি দিন ভোরে তাঁকে দেখে গার্ডরা। ইস্ট কোস্টের হিসাব অনুযায়ী সকাল ঠিক ছয়টায় আসেন ডেবি। অন্য ডিপ্লোম্যাটরা কেউই এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন না।

গার্ডদের হাতের ইশারা পেয়ে গেট পেরোলেন কাঠির মত সরু, লম্বা ডেবি; হাতে ব্রিফকেস, অন্য হাতে 'মোকা ল্যাটে'। হনহন করে হেঁটে থামলেন সিকিয়োর এলিভেটরের সামনে। মাত্র এক মিনিটে উঠে এলেন বারোতলা দালানে নিজ অফিসে।

আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নেয়ার পর গড়ে নিয়েছিলেন ভাল একটা অভ্যেস— সবসময় অফিসে পৌঁছান অধস্তনদের আগে। তাতে যেমন নিজেকে তুলে ধরতে পারেন উদাহরণ হিসেবে, তেমনি অন্যদেরকে রাখতে পারেন চাপের মুখে। বস্ কঠোর পরিশ্রম করছেন, কাজেই অন্যরা আয়েস করবে, তা একেবারেই অসম্ভব।

এত চট্ জলদি অফিসে আসার আরেকটা কারণ আছে। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করলে ভাল পোকা পায় না অলস পাখি। তা ছাড়া, একটু তাড়া কম থাকে ভোরের এ সময়ে। চটপট দেখে নেয়া যায় নিজের কাজ।

মাত্র একঘণ্টা যেতে না যেতেই শুরু হবে একের পর এক টেলিফোন কল। নানান অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো আছেই, তারপর বিকেলে টেলিকনফারেন্স, প্রেস ব্রিফিং ও পাবলিক হিয়ারিং। মনে হবে চোখের পলকে পেরিয়ে যাবে দিনটা। তখনও ডেস্কে থাকবে ফাইলের স্তূপ। ডেবি ম্যাকেঞ্জির মাঝে মাঝে মনে হয়, একই জায়গায় বসে সারাটাদিন আসলে কোনও কাজই করেননি তিনি।

নিজ অফিসে ঢুকে ডেস্কে মোকা ল্যাটে রেখে কমপিউটার চালু করলেন ডেবি। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্টের ডেস্কে ফাইল ও চিঠি। রাতে আসা সব জমা করে রেখেছে মেয়েটা।

একটার পর একটা চিঠি দেখছেন ডেবি। এগুলো রিপোর্ট। আবারও ব্লকেড দিয়েছে গাজায়। ভয়াবহ খারাপ হয়ে উঠেছে ইস্ট টিমোরে আইন শৃঙ্খলা। সিরিয়া, মিশর, লিবিয়ার ওপর পুরু সব ফাইল। এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার আগেই অন্য দিকে মনোযোগ গেল ডেবির। একপাশে ইণ্টারনাল-ইউয এনভেলপ।

ওটা খোলা হয়নি।

খামের ওপর লেখা: 'ডিপ্লোম্যাটিক মেটারিয়াল, প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনশিয়াল।'

এই খাম সরাসরি এসেছে সেক্রেটারি জেনারেলের অফিস থেকে। রিসিপিয়েন্ট-এর স্লটে লেখা ডেবি ম্যাকেঞ্জির নাম। একই সঙ্গে চারটে ফাইল ও ওই খামটা নিয়ে নিজ অফিসে ফিরলেন ডেবি।

চারটে ফাইলে এমন কোনও দুঃসংবাদ থাকবে না যে কেঁপে উঠবে পৃথিবী। কাজেই ওগুলো ইনবক্সে রেখে বড় ম্যানিলা প্যাকেজটা খুললেন ডেবি।

ভেতরে লিগার সাইযের এনভেলপ। এসব খাম ব্যবহার করেন সেক্রেটারি জেনারেল। এক চুমুকে বেশ কিছুটা দামি কফি

গিলে নিয়ে পেপার-মগ নামিয়ে রাখলেন ডেবি। লেটার ওপেনার দিয়ে খুললেন এনভেলপের একদিক। কেমন যেন চটচটে এনভেলপটা, যেন ওয়াটারপ্রুফ। ভুরু কুঁচকে ডেবি ভাবলেন, অফিস সাপ্লাই হিসেবে অনেক দামি জিনিসপত্র ব্যবহার করেন সেক্রেটারি জেনারেল।

এনভেলপ থেকে চিঠি বের করে চোখ রাখলেন তিনি।

শাস্তি দেয়া হবে তোমাকে। শাস্তি দেয়া হবে তোমাদের সবাইকে। অনেক অপেক্ষা করেছি, সহ্য করেছি অনেক কষ্ট।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডেবি। প্রতি দিন ইউএনও সদর দপ্তরে হুমকি দিয়ে পাঠানো হচ্ছে শত শত চিঠি, আসছে ফোনকল। এসব করে উন্মাদ বা মানসিকভাবে অসুস্থরা। বেশিরভাগই ফাঁকা বুলি। এদের ধারণা, কালো হেলিকপ্টার থেকে নেমে গোটা পৃথিবী দখল করে নিচ্ছে ইউএনওর লোকেরা। এসব কেন ভাবে পাগলরা, তা ভাবতে গিয়ে নিজেই বিরক্ত হলেন ডেবি। আবার মনোযোগ দিলেন চিঠিতে।

তোমাদের কারণে উপকৃত হইনি, প্রতি দিন আরও গভীর বিপদে ঠেলে দিয়েছ আমাদেরকে। উন্নতির নামে আমাদেরকে বানিয়েছ ক্রীতদাস। দয়ার নামে করেছ আমাদের অভুক্ত। শান্তির কথা বলে আমাদের খুন করেছ নির্বিচারে।

তোমাদের সাহায্য পাওয়ার জন্যে আর বসে থাকব না আমরা। নিজেরাই বদলে দেব এই পৃথিবী।

সাধারণত এসব হুমকি একেবারেই পাত্তা দেন না ডেবি, কিন্তু কেন যেন এই চিঠিটা কাঁপিয়ে দিল ওঁকে। যে লিখেছে, সে ভাল করেই জানে কীভাবে ঢুকে পড়া যায় এই সংগঠনের ভেতর। নইলে ওর অফিস পর্যন্ত এই এনভেলপ আসত না। ভয় লাগছে সেই কারণেই। ঘামতে শুরু করেছে মুখ ও হাত।

প্রচণ্ড কষ্টের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছি আমরা। আমাদের

শ্রমের ফসল তোমরা গিলেছ। তোমরা ভাবছ, হারিয়ে দিয়েছ আমাদেরকে। কিন্তু যারা আবারও উঠে আসে গায়ের শক্তি খাটিয়ে, তারা এরই ভেতর অর্ধেক জয় করে ফেলেছে শত্রুকে।

তোমরা যে অত্যাচার করেছ, চাইলেও তা ঠেকাতে পারিনি আমরা। কিন্তু এরপর থেকে নিজেদের সঙ্গে তোমাদেরকেও টেনে নামিয়ে নেব। আর তুমি, ডেবি ম্যাকেঞ্জি, আমাদের হয়ে বার্তা পৌঁছে দেবে পৃথিবীর ক্ষমতাশালী সব দেশের লম্পট, লোভী, নিষ্ঠুর নেতাদের কাছে। হ্যাঁ, ঠিক, অ্যাম্বাসেডর ম্যাকেঞ্জি, তুমিই আমাদের প্রতিশোধের বার্তাবাহক। সত্যি যদি এত দূর পর্যন্ত পড়ে থাকো চিঠি, এরই ভেতর তুমি বহন করছ ভয়ঙ্কর এক সংক্রামক মহামারীর বীজ।

ভয়ে আঁকড়ে আসতে চাইল ডেবির হৃৎপিণ্ড। তবুও পড়তে লাগলেন বদ্ধ উন্মাদটার চিঠি। তিরতির করে কাঁপছে ওঁর হাত, টিপে দিলেন ফোনের ইণ্টারকম বাটন।

'সিকিউরিটি,' ওদিক থেকে বলল এক পুরুষ কণ্ঠ।

'আমি... বলেই থেমে গেলেন ডেবি, দেখতে পেয়েছেন ফোনের বাটনের ওপর চট-চট করছে লাল তরল। দেখলেন হাতের তালু। আঙুলের ডগায় লালচে-খয়েরি আঠালো কী যেন!

হাতে কেমন এক গন্ধ, যেন ভাজি করা হচ্ছে কী যেন। বামহাতে এখনও ধরে আছেন চিঠি, মনে হচ্ছে পুড়ছে আঙুল। চিৎকার করে উঠে কাগজটা ফেলে দিলেন ডেবি, ঝটকা দিয়ে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। ফলে ডেস্ক থেকে পড়ে গেল কফির মগ।

আতঙ্কিত ডেবি দেখলেন, রক্তের মত লাল হয়ে গেছে হাতের তালু ও আঙুল, বুদ্বুদ উঠছে চামড়ার ওপর। ছুটন্ত ঘোড়ার মত লাফ দিচ্ছে ওঁর হৃৎপিণ্ড।

'ম্যাডাম অ্যাম্বাসেডর?' ফোনে বলছে লোকটা, 'আপনি ঠিক

আছেন তো? ...ম্যাডাম অ্যাম্বাসেডর?’

কথা বলতে পারলেন না ডেবি। হতবাক হয়ে দেখছেন মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজ। ওটার বুকে দেখা দিয়েছে রক্ত বা লাল রঙের আঠার মত কিছু। কাগজ লাল হয়ে গেলেও বড় ফন্টে বোল্ড অক্ষরে লেখা শেষ বাক্য পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে:

নরকে স্বাগতম!

তিন

ডেবি ম্যাকেঞ্জির ওপর ভীতিকর ভাইরাস হামলার বারো ঘণ্টা পর।

বিশাল, বিস্তৃত ওয়্যারহাউসের প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ। আশপাশে কোথাও কারও পদচারণা নেই। বিশাল দালানের সামনের সরু, নির্জন রাস্তায় চলছে না কোনও গাড়ি। দালানের অভ্যন্তর থেকেও কোনও আওয়াজ নেই। এমন কী পেছনের সারি সারি লোডিং ডক খালি। নিচে টেনে তালা মেরে দেয়া হয়েছে গ্যারাজের দরজার মত সব গেট।

গাঢ় কালো সানগ্লাস পরা এক লোক লাফিয়ে উঠল লোডিং ডকে। পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট। সে ভাল করেই জানে, এই ওয়্যারহাউস বন্ধ বলে মনে হলেও আসলে ভেতরে আছে লোক। তারা জরুরি মাল নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

জায়গাটা ডুবরোভ্‌নিক, ক্রোয়েশিয়া।

দরজার দিকে পা বাড়াল যুবক। এক হাতে ব্রিফকেস, অন্য

হাতে একবার স্পর্শ করল শোল্ডার হোলস্টারে রাখা .৩৮ ক্যালিবারের ওয়ালথার পি.পি.কে.। ছোট এক জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

প্রথমে দেখল নিজ প্রতিবিম্ব। ক্রু-কাট কালো চুল, কপালের নিচে কালো সানগ্লাস। মুখে দু'দিনের না কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

বিরক্ত হয়েছে সে। সূর্যের আলো এড়াতে কপালে হাত রাখল, নতুন উদ্যমে উঁকি দিল জানালায়। হারিয়ে গেছে বাঁকা কাঁচে ওর বিদঘুটে চেহারা। এবার পরিষ্কার দেখল ওয়্যারহাউসের মাঝে চারজন লোক। তাদেরকে খুব বিরক্ত মনে হচ্ছে। আঙুলের গিঁঠ ব্যবহার করে জানালার কাঁচে বার কয়েক জোরে টোকা দিয়ে পিছিয়ে এল যুবক।

যার কাছে এসেছে, সে চিনবে ওকে। হঠাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত এসেই বেশ কয়েকটা গ্রাঁ প্রি রেস জিতে নিয়েছিল মরিস রেইনার। তারপর উধাও হয় ওই আঙিনা থেকে। হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাবান সেই ড্রাইভারের কথা আজও আফসোস করে বলে দর্শকরা। অবশ্য এখন যার কাছে এসেছে সে, ওই লোক জানে ওর আরও দুটো পরিচয়। মরিস রেইনার আসলে দুর্ধর্ষ এক মার্সেনারি। কখনও কখনও কাজ করে আর্মস্ ডিলার হিসেবেও। তার মত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও কঠোর লোক নাকি হয় না।

বেশিরভাগ মানুষের জানার কথা নয়, বেপরোয়া এই বাঙালি যুবক বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেরা এজেন্টদের একজন, দেশের বিরুদ্ধে কোথাও ষড়যন্ত্র হলেই তার কাজ তা নস্যাৎ করে দেয়া। প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে। অমোঘ আকর্ষণে কাছে টানে যে-কাউকে, অথচ অদ্ভুত একাকী জীবন ওর। এক ঘনিষ্ঠ আমেরিকান বান্ধবীর অনুরোধে এই কাজ করবে বলে আপাতত এখানে এসেছে।

খটাং শব্দে ভেতর থেকে খুলে গেল ওয়্যারহাউসের দরজার বল্টু। সরসর করে দু'ফুট সরল স্লাইডিং ডোর। ফাঁকা জায়গায় দেখা দিল এক লোক। আকার দেখে তাকে বলা যেতে পারে বাচ্চা হাতি। একবার মাথা দুলিয়ে পিছিয়ে গেল।

বড় করে দম নিয়ে ওয়্যারহাউসে পা রাখল মাসুদ রানা।

এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওই চার সশস্ত্র লোক। রানার বামে এখন পঞ্চম লোকটা, টেনে ধুম্ করে বন্ধ করল দরজা। ঘুরে হাতের ইশারা করল। 'আমার সঙ্গে আসুন।'

বাচ্চা হাতি দুলে দুলে রওনা হতেই পেছনে চলল রানা। মস্ত ওয়্যারহাউসের গভীরে ঢুকছে ওরা। দালানের ভেতর দামি সব মালামাল। এক দিকের দেয়ালে ক্রেট ভরা সব ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট। পাশে ঠাঁই নিয়েছে সারি সারি হ্যাঙার থেকে ঝুলন্ত ফার কোট; সেগুলোর ভেতর দুটো আসল মুক্তা দিয়ে কারুকাজ করা। একটু দূরে বারো সিলিণ্ডারের কয়েকটা টার্বোচার্জড্ জাগুয়ার। ওগুলোকে একেবারে নতুন বলে মনে হলো রানার।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করছে বাচ্চা হাতি। 'ওগুলো সরাসরি এসেছে ফ্যাক্টরি থেকে।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

চোরাই গাড়ি পেরিয়ে দালানের মাঝে থামল ওরা। এখানে মেঝেতে দু'ধরনের দীর্ঘ আয়তাকার ক্রেট। প্রতিটির ওপর ছিল ন্যাটোর সামরিক চিহ্ন। চেষ্টা করা হয়েছে সব চিহ্ন মুছে দেয়ার। তবুও আবছাভাবে দেখা গেল লেখা ও প্রতীক। পরিষ্কার চিনল রানা আলফানিউমেরিক কোড: এফআইএম-৯২।

স্টিংগার সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল দেখতেই এখানে এসেছে রানা। রং স্প্রে করার সময় ঢেকে দেয়া হয়নি মিসাইলের ক্রেটের ওপরের দুটো অক্ষর। ওগুলোর কারণে বুঝল রানা, ভেতরের মাল এক্সটেণ্ডেড-রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্ট— কমপক্ষে পাঁচ

মাইল একেবারে নিখুঁতভাবে গিয়ে আঘাত হানবে লক্ষ্যে।

কয়েক বছর আগে ন্যাটোর এক কনভয় থেকে হারিয়ে গেছে এসব অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সিআইএ। কিন্তু নানান দিকে খোঁজ নিয়েও মিসাইলের ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। যে চুরি করেছে, সে বুঝে গিয়েছিল, হাতের মাল অনেক বেশি গরম। বিক্রির কোনও চেষ্টা হয়নি চোরাই মার্কেটে, নইলে ঠিকই ফাঁস হতো সব।

বামে অপেক্ষাকৃত চওড়া ও দীর্ঘ সব ক্রেট দেখল রানা।

'ওগুলো নগদ টাকায় কিনেছে আরেক কাস্টমার,' ছায়ার ভেতর থেকে এল ভারী কণ্ঠ।

ঘুরে তাকাল রানা। মোটা গলার মালিক বেরিয়ে এসেছে ছায়া থেকে। ছাতের হলদে বাতির কারণে চকচক করছে তার টাক, যেন পালিশ করা হয়েছে। ঝিলিক মারছে নাকের ডগা, ভোঁতা চোয়াল ও গণ্ডারের মত ঘাড়।

মনে মনে 'বাপরে' বলে উঠল রানা। ওর পাশের মোটকু এর কাছে রীতিমত শিশু। ছায়া থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে, সেটা পূর্ণবয়স্ক মদ্দা হাতি। দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি হলে কী হবে, ওজন কমপক্ষে তিন শ' পঞ্চাশ পাউণ্ড। রানা বুঝল, দরকার হলে ট্যাঙ্কের মত ছুটবে এই হাতি।

নাম তার ডুক ব্রামস্ট্রি।

যেভাবে ছায়ায় লুকিয়ে ছিল, তা সত্যিকারের আর্ট। মস্ত এই ওয়্যারহাউস আস্ত গোলকধাঁধা, এটার প্রতিটি কোনা মটকুর চেনা। জানে, কোথায় রাখতে হবে নিজের লোক। প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগল রানার। বুঝে গেল, যতই প্রশিক্ষিত বা দক্ষ হোক, এদের বিরুদ্ধে একটা মাত্র পিস্তলের জোরে রক্ষা করতে পারবে না নিজেকে।

মন দিয়ে রানাকে দেখছে ব্রামস্ট্রি। 'বহু কিছু শুনেছি

আপনার নামে। ওরা বলে, আপনি মরুভূমির ঝড়। কারও ওপর রাগলে তার রক্ষা নেই। নিজেকে বাঁচাতে পারবে না কেউ।'

'সব কথা বিশ্বাস করবেন না,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'যা শুনেছি, তার অর্ধেক মেনে নিলে আগেই মেরে ফেলতাম আপনাকে, যাতে আমার ধারেকাছে আসতে না পারেন,' বলল ডুক ব্রামস্ট্রি।

খুশি বা অখুশি হলো না রানা। এক সেকেণ্ড পর ওর মনে হলো, অন্তর থেকেই কথাটা বলেছে পূর্ণবয়স্ক হাতি। ও কার হয়ে এসেছে, তা জানে না আর্মস্ ডিলার। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। সব ঠিক করা হয়েছে খুব দ্রুত। সেজন্যে সাহায্য নিতে হয়েছে তৃতীয় এক পক্ষের। সে-ই যোগাযোগ রেখেছে রানা ও ব্রামস্ট্রির মাঝে। সেজন্যে পেয়েছে উপযুক্ত ফি।

চুপ করে থাকল রানা।

'তবে এ-ও ঠিক, আপনার ব্যাপারে যা বলেছে, তার এক শ'ভাগের একভাগও সত্যি বলে মনে করি না,' মোটা গলায় হাসল আর্মস্ ডিলার। প্রায় গড়িয়ে এসে রানার সামনে থেমে হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতির পায়ের মত মোটা হাতটা সামান্য ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল রানা। টের পেল, যথেষ্ট শক্তি খরচ হয়েছে কাঁধের পেশির।

এদিকে ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে একটা ক্রেট খুলছে ষষ্ঠ এক লোক।

অপেক্ষাকৃত বড় ক্রেট দেখল রানা। ভেতরে রয়েছে বড় সব মিসাইল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কী ধরনের জিনিস। লংগার-রেঞ্জ স্যাম, নাকি সার্ফেস-টু-সার্ফেস মিসাইল? যাক, এলেনা ওকে দরদাম করতে বলেছে স্টিংগারের জন্যে। অবশ্য, অন্যগুলো সম্পর্কে তথ্য পেলে পরে কাজে আসবে।

'অন্যান্য মালপত্র?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল ব্রামস্ট্রি। 'অনেক কিছু বিক্রি করি।'

'আপনার মিসাইলের দাম?'

'নিজে থেকে কিছুই বলব না,' মাথা নাড়ল মদ্দা হাতি।

'নিলামের ডাক দেবেন না?'

'না।'

'যার হয়ে দর করতে এসেছি, সে কিন্তু অন্য মিসাইলের ব্যাপারেও আগ্রহী।'

'অন্যগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। অবশ্য, আপনার লোক নিজে থেকে দাম বললে পরে হয়তো ওই জিনিস আরও জোগাড় করতে পারব।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। নিজে থেকে কোনও প্রশ্ন করল না। মনে গেঁথে নিল ক্রেটের আকার ও রং। তিন সেকেণ্ড পর সামনের টেবিলে ব্রিফকেস রেখে খুলে ফেলল ডালা।

'খুব ছোট ব্রিফকেস,' মন্তব্য করল ব্রামস্ট্রি। 'আমি ভেবেছি, আপনি যথেষ্ট টাকা নিয়ে এসেছেন।'

এইমাত্র ব্রিফকেস থেকে ছোট এক সেট যন্ত্র বের করেছে রানা। পাশেই রাখল একজোড়া ইলেকট্রনিক ডিভাইস— টেস্টিং ইকুইপমেন্ট।

'ডাউন পেমেন্টের ব্যবস্থা করেছি,' সহজ সুরে বলল রানা। 'তবে ওই টাকা পাওয়ার আগে আমাকে পরীক্ষা করতে দেবেন মিসাইলের গাইডেন্স, ওয়ারহেড আর প্রপালশন।'

মাথা দোলাল ব্রামস্ট্রি, মেনে নিয়েছে প্রস্তাব। 'অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন।'

পনেরো মিনিট পর ক্রেডলে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকল একটা মিসাইল। হাঁ করেছে তিন এগযামিনেশন পোর্ট। ওপরের দু' পোর্টে গাইডেন্স সিস্টেম ও শক্তি দেয়ার ব্যাটারি প্যাক। মিসাইলের নিচে লেজের পোর্ট থেকে বোঝা যাবে, কী অবস্থায়

আছে প্রপেল্যান্ট স্টেজ।

কিছুক্ষণ মিসাইলের ওপরের পোর্ট ঘাঁটল রানা। মনে হলো, বুঝে নিয়েছে সার্কিট বোর্ড ও চার্জেবল ব্যাটারি প্যাকের স্ট্যাটাস। এবার মন দিল রকেটের লেজের পোর্টে। এখন ওর হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস। কাদার মত হলদে সলিড ফিউয়েলই উড়িয়ে নেবে মিসাইল। ইউভি লাইট জ্বেলে খুব সতর্ক হয়ে জ্বালানির ওপর ঝুঁকল রানা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখছে সব।

পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। পরীক্ষা শেষ হচ্ছে না রানার। এদিকে ওর প্রায় ঘাড়ে চেপে এল ব্রামস্ট্রি আর ষষ্ঠ লোকটা।

আরও কিছুক্ষণ পর পিছিয়ে এল রানা, একবার মাথা নাড়ল।

'সমস্যা কী?' জানতে চাইল ব্রামস্ট্রি।

'মাল কত দিন আগের?'

'কেন?' প্রায় ফুঁসে উঠল চোরাই অস্ত্রের কারবারী।

'কারণ, এসব বাতিল মাল,' এককথায় জানিয়ে দিল রানা। 'আপনি নিজেও নিশ্চয়ই তা জানেন।'

'এগুলো আমেরিকার সেরা মিসাইল,' আপত্তির সুরে বলল ব্রামস্ট্রি। 'জিজ্ঞেস করে জেনে নেন ইরাকি, সিরিয়ান আর রাশানদের কাছ থেকে। ভয়ঙ্কর অস্ত্র।'

মদ্দা হাতির চোখে চোখ রাখল রানা। 'ভয়ঙ্কর ছিল। অতীতের কথা।'

'কী বলতে চান?' জানতে চাইল ছোট হাতি। রানার জন্যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে।

একবার রানার মনে হলো, আসল লোক এই ছোট হাতি। নকল লোক বড় হাতি। 'কেউ আপনাদেরকে ঠকিয়ে দিয়েছে,' সহজ সুরে বলল রানা।

‘মিথ্যা কথা!’ রাগে থরথর করে কাঁপছে বাচ্চা হাতি, পিস্তল তুলেই তাক করল রানার বুকে।

প্রতিপক্ষের চোখে সরাসরি তাকাল রানা। যে-কোনও সময়ে আরও খেপে গিয়ে গুলি করবে ছোট হাতি। আরও ঝুঁকি নেবে কি না, ভাবছে রানা। ডুক ব্রামস্ট্রির দিকে তাকাল। ‘তুমি কি তোমার কাস্টমারদেরকে খুন করে বড়লোক হয়েছ?’

সঙ্গীর দিকে ফিরল ব্রামস্ট্রি। ‘অস্ত্র নামাও।’ আবারও রানার দিকে ফিরল সে। ‘বন্ধু, আপনি যা বলেছেন, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনার।’

আবারও ইউভি বাতি জ্বালল রানা। ‘নিজ চোখেই দেখুন।’

ওর হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ঝুঁকল ব্রামস্ট্রি। চোখ প্রপেল্যান্টের ওপর। কাত করে বাতি ফেলেছে রানা।

‘চুরি হওয়ার পর কয়েক বছর বাঙ্কারে ছিল,’ বলল রানা। ‘আর আপনি বা আমি ভাল করেই জানি, ফলে কী হয়েছে।’

চোরা কারবারীর স্যাঙাতের হাতে বাতি দিল রানা, আঙুল তাক করে দেখিয়ে দিল প্রপেল্যান্টের একটা অংশ। একটু আগে ওই জায়গাটা মনোযোগ দিয়ে দেখেছে।

‘চুলের মত সরু ওই সব রেখা দেখছেন? ওগুলো হচ্ছে আপনাদের বা অন্যদের সমস্যা। ঠিকভাবে জ্বলবে না জ্বালানি। আর জ্বলে উঠলেই হয়তো বিস্ফোরিত হবে।’

সলিড ফিউয়েলে প্রায় নাক ঠেকিয়ে দিল ডুক ব্রামস্ট্রি। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো, মেনে নিয়েছে রানার কথা।

‘সরি, কিন্তু এই জিনিস ব্যবহার করতে গেলে নিজেকেই মরতে হবে,’ বলল রানা।

প্রপেল্যান্টের দিকে চেয়ে আছে ব্রামস্ট্রি ও তার স্যাঙাত। গাইডেন্স সেকশনের দিকে ফিরল রানা। হাত ভরে দিল পোর্টের ভেতর। ব্যবহার করছে ইলেকট্রিকাল ডিটেক্টর। মেপে দেখছে

পাওয়ার সাপ্লাই। কয়েক সেকেণ্ড পর হাত বের করে এনে দেখল মিটারের রিডিং।

'গাইডেন্স ঠিক আছে, তার ওপর নতুন ব্যাটারি দিয়েছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু এসব ব্যাটারি পাওয়া সহজ কাজ। কঠিন হচ্ছে মিলিটারি গ্রেড সলিড রকেট ফিউয়েল পাওয়া।'

ঘুরে ওকে দেখল ডুক ব্রামস্ট্রি। হাত সহ ম্যাগনিফাইং গ্লাস নামিয়ে নিয়েছে উরুর পাশে। খট্ শব্দে ঠিক জায়গায় পাওয়ার বাস রেখে মিসাইলের গাইডেন্স সেকশন বন্ধ করল রানা।

'আমি যদি আপনার কথা বিশ্বাস না করি?' তেড়া সুরে জানতে চাইল চোরা কারবারী।

'সেক্ষেত্রে আমাদের ভেতর মত বিরোধ হবে,' বলল রানা। আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল। 'অবশ্য, তার মানে এমন নয় যে আমরা পরে আর ব্যবসা করব না।'

'অন্য কিছু চাই আপনার?'

বড় ক্রেটের দিকে মাথার ইশারা করল রানা।

বার কয়েক মাথা নাড়ল ব্রামস্ট্রি।

ইজরায়েলি মিসাইলের কথা জানতে চাইল রানা, 'স্পাইডার হলেও চলবে, আপনার কাছে আছে?'

'চারপাশে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

'তা হলে কাজে নেমে পড়ুন,' বলল রানা। 'যে আমাকে পাঠিয়েছে, সে ওই ধরনের জিনিস পেলে আগ্রহ নিয়ে কিনবে। ব্রিটিশ, ইজরায়েলি, ফ্রেঞ্চ, রাশান বা চাইনিজ, কিন্তু জিনিসটাকে হতে হবে নিখুঁত।'

খুব উৎসাহী হলো না ব্রামস্ট্রি। অবশ্য, বার কয়েক মাথা দোলাল। তার ভাব দেখে রানার মনে হলো, ভবিষ্যতে ওর বন্ধুর কাছ থেকে কত টাকা পাবে, সে হিসাব কষছে লোকটা।

কয়েক সেকেণ্ড পর স্টিংগার মিসাইলের দিকে মাথা তাক

করে বলল হাতি, 'এই খবর বাইরে যেন প্রকাশ না পায়।' বলার মধ্যে হুমকির সুর পেল রানা।

'যার কাছ থেকে এসেছি, তাকে অন্য কারণ বুঝিয়ে বলব,' কথা দিল রানা। একটু বিরতি নিয়ে জানাল, 'কিন্তু আপনার বদলে আমি হলে এমন কারও কাছে ওই জিনিস বিক্রি করতাম, যাকে আর কখনও দেখতে চাই না।'

ভেতরে যন্ত্রপাতি সব রেখে ধুপ শব্দে ব্রিফকেস বন্ধ করল রানা। বুঝতে পারছে, সত্যিকারের বিপদ এখন। এবার এখান থেকে ওকে বেরোতে দেবে তো ব্যাটারা?

'আশা করি পরেরবার ব্যবসা হবে,' নরম সুরে বলল রানা। ঠিক করে ফেলেছে, ভুলেও বলবে না বিদায় নেবে। ব্রিফকেস হাতে ঘুরে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল ও।

পেছনে কী নিয়ে যেন আলাপ করছে মদ্দা ও বাচ্চা হাতি। কয়েক সেকেণ্ড পর বদলে গেল সুর। চলছে তর্ক।

ক্রোয়েশিয়ার ভাষা বুঝবে না, কাজেই ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে হনহন করে হাঁটছে রানা। মনে মনে বলল, আমার হাতের ভেলকি বুঝে ফেলল না তো? মুশকিল! সামনের দরজাটা মনে হচ্ছে হাজার মাইল দূরে!

পেছনে চড়া গলায় বলে উঠল ব্রামস্ট্রি, 'একমিনিট, মোসিউ রেইনার! ফ্রেণ্ড! আমার কথা শেষ হয়নি!'

জায়গায় থমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা, আটকে ফেলেছে শ্বাস।

চওড়া হাসি দিল চোরা কারবারী। দু'হাত কচলাচ্ছে। প্রায় ফুটবলের মত গড়িয়ে এল রানার দিকে। 'মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। আপনি শিয়োর তো অন্য কিছু লাগবে না?'

'না, আপাতত নয়। তবে অন্য মিসাইলের...'

'ছিহ্, ওগুলোর কথা ভুলে যান। ...আর কিছু?'

ক' সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'শহরে পৌঁছে দিতে পারবেন? সঙ্গে গাড়ি নেই।'

কৃতার্থ ব্যবসায়ীর তেলতেলে হাসি দিল চোরা কারবারী। 'এ তো ব্যাপারই নয়! যেখানে যাবেন, সেখানেই আপনাকে পৌঁছে দেবে আমার মার্সিডিজ। চলুন, ড্রাইভারের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে।'

'বেশ, চলুন।' ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

চার

চোরা কারবারী ডুক ব্রামস্ট্রির সঙ্গে মিটিং শেষ করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছল রানা। সবুজ মার্সিডিজের ড্রাইভার থামল এক্সেলশিয়র হোটেলের সিঁড়ির সামনে। দেরি না করে এগিয়ে এসে পেছনের দরজা খুলে দিল ভ্যালে, ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে পড়ল রানা। যে-কেউ ভাববে, কোনও দিকে খেয়াল নেই ওর, কিন্তু বাস্তবে চারপাশ দেখে নিয়েছে; দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়ল লবিতে। এলিভেটর ব্যবহার না করে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তেতলার ফাইভ-স্টার রেস্টুরেন্টে। ওখান থেকে চোখে পড়বে প্রাচীন বন্দর ও নীল সাগর।

দৃশ্যটা দেখার মতই, অপূর্ব সুন্দর। সাগরের তীরে প্রায় বাঁধের ওপর তৈরি বেশ কয়েক তলা এই হোটেল। যেন বন্দরের ব্যাটলমেন্টের অংশ। দোতলার রেস্টুরেন্টের সামনে সরু, দীর্ঘ ব্যালকনি, প্রায় ঘিরে রেখেছে হোটেলটাকে। দেখা যায় বন্দর ও

লোভরিজেন্যাক দুর্গ।

সার্ভিস ও খাবারের জন্যে গোটা ইউরোপে বেশ কয়েকটি নামকরা পুরস্কার পেয়েছে এ রেস্টুরেন্ট। তবে দামি ও লোভনীয় খাবারের জন্যে এখানে আসেনি রানা। সময় কাটাতে হবে। হঠাৎ করেই ক্রোয়েশিয়া থেকে বিদায় নিলে সন্দেহ করবে ডুক ব্রামস্ট্রি। সেক্ষেত্রে হয়তো মিসাইল খুলে দেখবে, ফলে মাটি হবে ওর এত পরিশ্রম।

ব্যালকনির শেষমাথায় পাথুরে দেয়ালের দিকে পিঠ রেখে টেবিলে বসল রানা। ওখান থেকে দেখল মৃদু ঢেউ তোলা সুনীল সাগর ও রাজকীয় হোটেলের সামনের সরু রাস্তা। এরই ভেতর হাজির হয়েছে ওয়েটার, তাকে এসপ্রেসো কফির অর্ডার দিল রানা। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে রুমের অগ্রিম টাকা দিলেও ঠিক করেছে, রাতে ওখানে থাকবে না। আরও কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে ব্যাগ নিয়ে ক্যাব ডেকে সোজা চলে যাবে এয়ারপোর্টে, রাতটা কাটাবে ওখানেই।

ডুক ব্রামস্ট্রি এরই ভেতর ওকে খুঁজতে শুরু না করলে, ধরে নেবে স্টিংগার মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেমের ভেতর ওর রাখা ট্র্যান্সমিটার পায়নি সে। সেক্ষেত্রে আবারও ক্রেটে মিসাইল রেখে কম খুঁতখুঁতে কাস্টমার খুঁজবে লোকটা।

সে বা তার লোকের জানার কথা নয়, ঠিক কী জিনিস খুঁজতে হবে। রানার রেখে আসা ট্র্যান্সমিটার দেখতে মিসাইলের সার্কিট বোর্ডের মতই, খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ানেরও। কাজেই রানা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত, নিজের কাজে কোনও খুঁত রাখেনি ও।

চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে সচেতন হলো রানা। ওর দিকে আসছে এক লোক। পরনে নীল কোট। চুলের অভাবে খুশি মনে কপাল গিয়ে উঠেছে মাথার মাঝখানে। মুখে বিশাল

চওড়া হাসি। হাতের লাঠির ডগা ক্রমেই তাক হচ্ছে রানার বুকে।

রানা জানে, ওই লোকের হাতের ওই হ্যাণ্ডেলে সামান্য মোচড় দিলে লাঠির ডগা থেকে বেরোবে বন্দুকের একটা এলজি গুলি।

'গুলি করার আগেই খুন হবে,' সহজ সুরে বলল রানা।

'কী করে?' জানতে চাইল টেকো যুবক। নামিয়ে ফেলেছে লাঠি। আরও সামনে এসে উঁকি দিল রানার কোলে।

টেবিলের তলায় রানার ওয়ালথার পি.পি.কে.-র নল। কাঠ ভেদ করে সোজা বুলেট বিঁধত জন গ্রাহামের মগজে।

একবার মাথা নেড়ে হতাশ হয়ে সামনের চেয়ারে বসল ব্রিটিশ যুবক। রানার প্রতি কৃতজ্ঞ এক বন্ধু, আগে ছিল এম.আই.সিক্স-এ। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আর এম.আই.সিক্স-এর এক যৌথ মিশনে শত্রু এলাকায় ঢুকে বুকে-পেটে গুলি খায় সে। ব্রিটিশ দলের জীবিত দু'জন আগেই পিছিয়ে গিয়েছিল। তখন সোহেল আহমেদ ও মাসুদ রানা জীবনের ঝুঁকি তুচ্ছ করে গ্রাহামকে তুলে নিয়ে সরে আসে নিরাপদ এলাকায়। তারপর থেকে দুই বাঙালি বন্ধুকে আপন ভাইয়ের মত জানে গ্রাহাম। প্রয়োজনে নিজের জান দিতেও আপত্তি নেই ওর।

কিন্তু ওই মিশনের পর চিকিৎসকরা ওর পাকস্থলির অর্ধেকটা কেটে ফেলেছে বলে অবসর দেয়া হয়েছে ওকে এম.আই.সিক্স থেকে। হাসি-খুশি মানুষ, চাকরি হারিয়েও ভেঙে পড়েনি। টাকার অভাব হয়নি, টুকটাক ইনফর্মেশন বিক্রির কাজ করে বেশ চলছে তার জীবন।

'হঠাৎ এখানে?' জানতে চাইল রানা।

'অতিথির প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ?' আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা

নাড়ল গ্রাহাম। 'আমি তো জানতাম বাঙালিরা অতিথি-বৎসল।'

'মতলব নিয়ে আসা অতিথিদেরকে আমরা পছন্দ করি না।'

'কোনও মতলব নেই।' ওয়েটারকে ডাকল গ্রাহাম। 'তবে কাজ আছে।'

'বলে ফেলো।'

ওয়েটারকে রাজকীয় লাঞ্চের অর্ডার দিল গ্রাহাম, তারপর নির্বিকার মুখে বলল, 'এর বিলটা দেবেন মিস্টার রানা।'

রানার দিকে তাকাল ওয়েটার।

মাথা দোলাল রানা। ওয়েটার চলে যেতেই বলল, 'বিয়ে করছ না কেন? আধা পাকস্থলি নিয়ে এত গুরুপাক খাবার খাওয়া কি ঠিক? নিষেধ করার লোক দরকার তোমার।'

'আমাকে বিয়ে করবে কোন্ মেয়ে, রানা?' করুণ চেহারা করল জন গ্রাহাম।

'শুনেছি লণ্ডনের অর্ধেক মেয়েকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল গ্রাহাম। 'ফালতু লোকের কথা।'

এবার বলল রানা, 'অবশ্য, লণ্ডনের বাকি অর্ধেক মেয়ে খুন করতে চাইছে তোমাকে, সেটাও শুনেছি।'

'তা অবশ্য ঠিক কথাই বলেছ,' নির্বিকার চেহারায় স্বীকার করল গ্রাহাম।

'কী কারণে এলে, বলবে না?'

'তোমাকে খুঁজতেই।'

'তা বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু কী কারণে? জানলে কী করে যে আমি এখানে?'

'এদিকে ভাল কানেকশন আছে,' বলল গ্রাহাম, 'তা-ই শুনলাম এখানে এসে পূর্ণিমার চাঁদের মত জ্বলজ্বলে আলো বিলাচ্ছ। অবশ্য, জানি না...' মাথা নাড়ল। 'জরুরি কোনও ইনফর্মেশন লাগবে?'

'না।'

'তা হলে বলে ফেলি, এখানে এসেছি আমাদেরই চেনা এক লোকের কারণে।' নড়েচড়ে বসল গ্রাহাম। 'তাকে তুমি সাহায্য করেছিলে। তিন বছর আগে আফ্রিকা থেকে বের করে আনো।'

চট্ করে বাঙালি জেনেটিক বিজ্ঞানী আহ্সান মোবারকের কথা মনে পড়ল রানার। ভদ্রলোকের মেয়েও ছিল তখন ওদের সঙ্গে। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে পেরোতে হয়েছিল কঙ্গো সীমান্ত।

'তুমি কি এখনও বন্ধুদের সাহায্য করো?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

'তোমার কী মনে হয়?'

'করো।'

'তোমার সাহায্য দরকার?'

'না, আহ্সান মোবারকের দরকার।'

মোনা মোবারকের বয়স তখন ছিল মাত্র বিশ। দেখতে গ্রিক দেবীর মতই সুন্দরী, প্রখর বুদ্ধিমতী, নিজেও যোগ্য বাবার যোগ্য মেয়ের মতই হয়ে উঠছিল আর এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। কঙ্গো সরকারের হয়ে বিপজ্জনক জেনেটিক মডিফায়েড ফসল নিয়ে গবেষণা করছিলেন আহ্সান মোবারক, সঙ্গে মোনা। চোখ রাখছিল আর্মির কয়েকজন জেনারেল। তারা মিস্টার মোবারককে বাধ্য করতে চাইল বায়ো ওয়েপন তৈরি করতে।

তখন বাংলাদেশ সরকারের কাছে এক সুযোগে ই-মেইল করেছিলেন আহ্সান মোবারক। ফলে বিসিআই থেকে রানাকে পাঠানো হয় রিপাবলিক অভ কঙ্গোয়। মোনার ফুপাতো ভাইয়ের পরিচয়ে ওঠে ও ওদের বাড়িতে। কয়েকটা দিন চারপাশের অবস্থা বুঝে নিয়ে ওই দেশ থেকে কীভাবে বেরোবে স্থির করেছে রানা, এরই মধ্যে ওকে ভালবেসে ফেলল মেয়েটা। একেবারে হাবুডুবু কিশোরী প্রেম।

নানাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে রানা। কিন্তু পরে বর্ষণভরা একরাতে মস্ত বিপদের মধ্যে মিলিত হয়েছিল ওরা। অবশ্য, সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর সোজা আলাদা দুটো পথে রওনা হয় ওরা। বিসিআই-এর বিশেষ একটা মিশনে যোগ দিতে ইউরোপে চলে আসে রানা। আর সোহেলের সঙ্গে বিমানে চেপে বাংলাদেশে ফেরে মোনা ও তার বাবা। এরপর মোনা বা মিস্টার মোবারকের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি রানার।

'সোহেলের কাছে শুনেছি, মিস্টার মোবারকের মেয়ে মোনা তোমাকে ভালবাসে,' বলল গ্রাহাম। 'ওখান থেকে চলে আসার পর আর কখনও দেখা বা কথা হয়নি ওর সঙ্গে?'

'না।'

'ওকে বিয়ে করলে এত দিনে গোটা দুয়েক বাচ্চা থাকত তোমার,' মুচকি হাসল গ্রাহাম।

'ছেলে না মেয়ে?' ঠাট্টা করল রানা। তারপর বলল, 'উচিত হতো না। শুনেছি ভাল ক্যারিয়ার পেয়েছে।'

'হয়তো।'

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মোনা?'

'না, তার বাবা। অ্যাথেন্সে দেখা হতেই এক পর্যায়ে জানাল, খুব উপকৃত হবে আমি তোমাকে খুঁজে বের করলে। সে নাকি মস্ত বিপদে আছে। কে বা কারা নাকি খুন করতে চাইছে তাকে।'

'তুমি নিজেই ওঁকে সাহায্য করতে পারতে।'

লালচে হয়ে গেল গ্রাহামের মুখ। 'বলেছিলাম। এমন কী বলেছি, দরকার হলে নগদ টাকার ব্যবস্থা করে দেব। তখনই বলল, টাকা দিয়ে বিপদ এড়াতে পারবে না। আসলে তোমার মত করে আমাকে বিশ্বাস করেনি সে।'

রানার মনে পড়ল, মোবারক সাহেবের ওপর বিসিআই-এর

ফাইলের তথ্য। সবসময়ে বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে মিশতেন। বা বলা যায়, তাঁকে খুঁজে নিত তারা। অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে কাজ করতে রাজি নন। আর এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের হয়ে জেনেটিক ফসলের ওপর গবেষণা করতেও আপত্তি ছিল তাঁর।

পাগলাটে, প্রৌঢ় বিজ্ঞানী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন কঙ্গোয়। বাংলাদেশে ফেরার কিছু দিন পর আবার উড়াল দেন ইউরোপে। রানা বুঝতে পারছে, আবারও একদল বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছেন তিনি।

'কী ধরনের বিপদে আছেন, সে সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত দিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'না। তবে বাস্তবতা থেকে অনেক সরে গেছে ভদ্রলোক। দেখে মনে হয়েছিল আধমরা। বলেছিল, সাক্ষাৎ ইবলিশ লেগেছে তার পেছনে।' কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল গ্রাহাম, 'কথা বলতে গিয়ে "তারা আনফরগিভিং" শব্দ দুটো ব্যবহার করেছিল।'

'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলেছেন?'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দেখা করবে প্যারিসে। চেক ইন করতে বলেছে ট্রিয়ানন প্যালেস হোটেলে। তোমাকে খুঁজে নেবে।'

মস্ত এক ট্রে নিয়ে এসে টেবিলে লাঞ্চ নামাল ওয়েটার। সে বিদায় নেয়ার পর কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল হার্ড ডিস্ক বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল গ্রাহাম। 'বলেছে, এটার ভেতরের জিনিস দেখলেই অনেক কিছু বুঝবে।'

এক সঙ্গে এক শ' একটা চিন্তা চেপে বসল রানার মনে। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মোবারকের সঙ্গে আছে মোনা?'

'নো, মেইট। ওই পাগলের ধারেকাছে থাকবে কে? খোঁজ নিয়েছি, প্রথম সুযোগেই ওর বাবার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।'

বাপ-মেয়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না, মনে পড়ল রানার। হয়তো ভালই হয়েছে যে বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে মোনা। অবশ্য, মিস্টার মোবারক ঝামেলায় থাকলে, হয়তো মেয়েটা নিজেও আছে মস্ত বিপদে। ওর বাবার ওপর চাপ তৈরি করতে ওকে বন্দি করে নির্যাতন চালাতে পারে যে-কেউ।

'মোনা কোথায় আছে, তা জানো?'

মাথা নাড়ল গ্রাহাম।

'হয়তো ওর মাথার ওপরও ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। লুকিয়ে পড়তে হয়েছে।' গোগ্রাসে মুখে খাবার তুলছে গ্রাহাম, সাগরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ওকে দেখল রানা। 'খুঁজে বের করতে পারবে মেয়েটাকে?'

ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল গ্রাহাম। 'পারব না কেন? ওকে পেলে দেরি না করে ফোন দেব।'

চেয়ার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল রানা।

'হায়-হায়! এই হাজার ডলারের খাবারের বিলটা দেবে কোন্ শালা?' পেছন থেকে কাতরে উঠল গ্রাহাম।

ঘুরে তাকাল রানা। 'বিল দেবে তোমার এই দুলাভাই! কারণ তোমার বোনকে কাছে পেয়ে আমি খুব খুশি।'

'শালা! আসল কথা কী?' নাক কুঁচকে ফেলল গ্রাহাম।

গলা নামাল রানা।

'আমেরিকার এনআরআই-এর হয়ে কাজ করছি, সব বিল তারাই দেবে,' বলে রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা। সোজা ফিরল নিজের রুমে। ওখান থেকে ব্যাগ নিয়ে নেমে এল লবিতে। কাউণ্টারে বলতেই রেস্টুরেণ্টে যোগাযোগ করল ক্লার্ক, জেনে নিল ওখানে কত বকেয়া হয়েছে।

বিল পরিশোধ করে হোটেল থেকে বেরোল রানা। ভ্যালে ডেকে দিল ক্যাব। ওটা চেপে শহরের মাঝে চলে এল ও। বার

কয়েক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে নানান দিকে গেল, তারপর নেমে পড়ল মস্ত এক অফিস দালানের সামনে। প্রকাণ্ড বাড়ির ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে এল পেছনের এক গলিতে। ওখান থেকে আরেকটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা গেল স্ট্র্যাডান-এ। ওটাই ডুবরোভ্‌নিকের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়ক।

কিছুক্ষণ ওখানে হাঁটাহাঁটি করে নিশ্চিত হলো, পেছনে কেউ নেই। ছোট এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে পেছনের টেবিলে বসে সেল ফোন বের করে কল দিল। শুনল টিঁট-টিঁট আওয়াজ। ওকে দেয়া সেল ফোনের স্ক্র্যাম্বল্ড সিগনাল পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট স্যাটালাইটে, ফলে কৃত্রিম চাঁদ সরাসরি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিল কল।

এক সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে মিষ্টি এক নারী কণ্ঠ শুনল রানা: 'এলেনা রবার্টসন।'

মেয়েটা কাজ করে এনআরআই অর্থাৎ ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। ওই সংগঠন আমেরিকান সরকারের অদ্ভুত এক মিশ্র এজেন্সি। নানান দেশের ইউনিভার্সিটি এবং কর্পোরেশনের কাটিং এজ রিসার্চ নিয়ে কাজ করে ওটার বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট। ছোট ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি অনেকটা সিআইএ-র মতই। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গোপন তথ্য সংগ্রহ করে।

দু'দেশের যৌথ একটি মিশনে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল রানা ও এলেনার, দেরিও হয়নি ঘনিষ্ঠতা বাড়তে। প্রথম দু'দিনের ভেতর রানার সঙ্গে আন্তরিক একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছিল মেয়েটা। অবশ্য, তার আগে ভাল করেই কমপিউটার ঘেঁটে জেনে নিয়েছিল রানার অতীত। সত্যি যখন স্বপ্নের নায়কের খুব কাছে গেল মেয়েটা, সহজেই মেনে নিতে পেরেছে, কখনও সংসারে বাঁধতে পারবে না রানাকে। আসলে ওদের দু'জনের সম্পর্ক একই সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমিকা ও বন্ধু-বান্ধবীর মাঝের কিছু। আমেরিকায় এলে কখনও কয়েক দিন রানা কাটায়

এলেনার বাড়িতে। এতেই খুশি মেয়েটা, কাছে তো পেয়েছে প্রিয় মানুষটাকে!

সুযোগ পেলে একে অপরকে সাহায্য করে ওরা। যেমন, এবার নিজের কাজে সাহায্য চেয়েছে এলেনা রানার কাছে।

'কাজ শেষ,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'বলেছিলে আরও তিন দিন লাগবে, এখনই বেরিয়ে আসতে চাও?' বলল এলেনা।

'এখানে আর কোনও কাজ নেই।'

ডুক ব্রামস্ট্রির ওয়্যারহাউসের কথা আর ভাবছে না রানা, মনে ঘুরছে আহসান মোবারকের চিন্তা। জানতে হবে কী ধরনের বিপদে পড়েছেন মানুষটা। বাঙালি বিজ্ঞানী। মস্তবড় গোলমালে না পড়লে ভুলেও যোগাযোগ করতেন না। তাঁর সঙ্গে প্যারিসে দেখা করবে, ঠিক করেছে রানা। তবে আগে আলাপ সেরে নেবে ওর বস্ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে।

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?' জানতে চাইল এলেনা।

'না। তবে জড়িয়ে গেছি অন্য কাজে।' পকেট থেকে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বের করল রানা। ওটার দিকে চেয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে বড় ধরনের ঝামেলা।'

পাঁচ

অপরূপা প্যারিস।

আকাশের বুক ভেদ করে সোজা পুরো এক হাজার ফুট

ওপরে উঠেছে ফ্রান্সের লৌহমানবী, চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতই গঠন, তেমনি তার মনোরম গড়ন। প্রকাণ্ড আইফেল টাওয়ারের সামনে পৌঁছে ওপরে চোখ তুললেন জেনেটিক বিজ্ঞানী ডক্টর আহসান মোবারক। অবযার্ভেশন ডেক-এ থাকার কথা এক ইরানিয়ান লোকের, সঙ্গে করে এনেছে সে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে খোদাই করা অমূল্য এক ট্যাবলেট। শুধু যে প্রাচীন তা-ই নয়, ওটা বলে দেবে এমন সব তথ্য, যার তুলনা নেই। ওটা যেমন আসবে ভাল কাজে, তেমনি একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ হবে মানব-সভ্যতার।

চারপাশে হাজার মানুষের ভিড়েও নিজেকে বড় একা লাগল ডক্টর মোবারকের। সাহায্য চেয়ে খবর দিয়েছিলেন, কিন্তু কই, এল না মাসুদ রানা। এরই ভেতর অনেক দেরি করে ফেলেছেন। শেষে উপায় না দেখে বেরিয়ে এসেছেন গোপন আস্তানা ছেড়ে। যে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছেন, যখন তখন খুন হয়ে যেতে পারেন এখন।

অত ওপরে চেয়ে এখন মাথা ঘুরছে মোবারকের, চোখ নিচু করে দেখলেন চারপাশে শত শত টুরিস্ট। সবার সঙ্গে মিশে চললেন এলিভেটর লক্ষ্য করে। ভুলেও তাড়াহুড়ো করছেন না। চাইছেন না বাড়তি মনোযোগ দিক কেউ।

চট্ করে কেউ বুঝবে না, তিনি চিন্তিত। বয়স কম-বেশি ষাট, মাঝারি আকারের মানুষ। কালো চুল খাটো। পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে, যাদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখবে না কেউ, তিনিও তেমনই একজন।

জেনেটিক বিজ্ঞানী হিসেবে একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল নাম। বিখ্যাত জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। পরে কিছু দিন ছাত্র পড়ান ওখানেই, ছিলেন নোবেল ক্যাণ্ডিডেট। পরে ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে যোগ দেন নামকরা এক জেনেটিক

প্রতিষ্ঠানে। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে, তাই সেখানেও ভাল লাগেনি। এরপর কাজ করেছেন বহু দেশের নানান প্রতিষ্ঠানের হয়ে।

আর এ কারণেই বিপজ্জনক লোক বলে চিহ্নিত করেছে তাঁকে ইন্টারপোল, প্রথম সুযোগে বন্দি করা হবে। খারাপ কিছু করেছেন তা নয়, কিন্তু যখন-তখন মারাত্মক কিছু করবেন, সেজন্যে হাই-প্রায়োরিটি লিস্টে তোলা হয়েছে তাঁর নাম।

পৃথিবীর সেরা সব ল্যাবোরেটরিতে কাজ করেছেন। বাদ পড়েনি ইউএস সরকারি গবেষণাগার। জাদু দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মত করে ভাঙতে পারেনি কেউ জেনেটিক কোড। খুব ভাল করেই জানেন, কীভাবে তৈরি হতে পারে বায়োলজিকাল ওয়েপন।

কয়েক বছর আগে নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা খবর: জেনেটিক বিজ্ঞানী আহসান মোবারকের অনেক টাকা দরকার। কেন চাই, সে রহস্য ভেদ করা যায়নি। তবে ভয় পেতে শুরু করেছিল সিআইএ ও অন্যান্য পশ্চিমা সিকিউরিটি সার্ভিস।

এখনও কোনও অন্যায় করিনি, মনে মনে বললেন মোবারক।

এটা অর্ধ সত্য। বাকিটা মিথ্যা।

যখন-তখন ভাল বা খারাপ যে-কোনও কিছু করবেন তিনি।

হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়লেন মোবারক। সামনের মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ভেবে ঠিক করেছেন, আবু রশিদের সঙ্গে আলাপ করবেন ফ্রান্সের পাবলিক স্পেসে। আশা করছেন, আগে যাদের হয়ে কাজ করতেন, তারা এখানে এসে ধরতে পারবে না তাঁকে। খুব চাপ তৈরি করেছিল তারা। পালিয়ে না এসে উপায় ছিল না। আরেকটু হলে কেড়ে নিত তাঁর গবেষণালব্ধ সবকিছু। সেক্ষেত্রে সর্বনাশ হতো পৃথিবীর।

ভয় লাগতেই একবার শিউরে উঠলেন তিনি। কপাল ভাল, ঠিক সময়ে সরে যেতে পেরেছিলেন ওদের কাছ থেকে। এবার বাকি কাজ শেষ করবেন আড়ালে বসে। যদি দেখেন গবেষণার কারণে তৈরি হয়েছে ভয়ঙ্কর কোনও প্রতিক্রিয়া, দেরি না করে নষ্ট করে দেবেন তাঁর রিসার্চের সব ফলাফল।

কিন্তু আপাতত ওই রিসার্চ না করে উপায়ও নেই তাঁর।

'এক্সকিউয মি,' একদল জাপানিজ টুরিস্টের মাঝ দিয়ে গেলেন মোবারক। 'মার্সি, মার্সি!' আরও কয়েক পা গিয়ে উঠে পড়লেন ভিড় ভরা এলিভেটরে। ঊরুর পাশে শক্ত হাতে ধরেছেন কমপিউটার ব্যাগ। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে এলিভেটরে উঠল আরও কয়েকজন যাত্রী।

ভিড়ের প্লাযায় চোখ গেল মোবারকের। এইমাত্র ঘুরে ওকে দেখল এক যণ্ডার্ম। একবার কার উদ্দেশে সামান্য মাথা দোলাল লোকটা, চোখে কীসের যেন দ্বিধা।

ধক করে উঠল মোবারকের হৃৎপিণ্ড। এলিভেটরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে যণ্ডার্ম। তাড়া নেই তার। আসলে এদিকে যে আসবে, তা-ও ঠিকভাবে বোঝা গেল না।

এইমাত্র বুজে গেল এলিভেটরের দরজা। মৃদু আওয়াজ তুলে উঠতে লাগল লোহার মস্ত বাক্স।

বড় করে দম নিলেন মোবারক। মনে মনে আশা করলেন, বিপদ হবে না। একবার অবযার্ভেশন ডেক-এ উঠে ভাববেন পরের কথা। বড় ভারী লাগছে কমপিউটার কেস, ভেতরে রেখেছেন তাঁর অর্জন করা প্রায় সব টাকা। তবুও হয়তো হবে না তাতে, গবেষণা শেষ করতে চাইলে লাগবে কমপক্ষে আরও বিশ হাজার ইউরো।

তাঁর দেয়া টাকা পেয়েও যদি সন্তুষ্ট না হয় ইরানিয়ান লোকটা, সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা নেবেন। সেজন্যে

মানসিকভাবেও তৈরি। কোটের পকেটে আছে সিরামিকের সেল ফোনের মত দেখতে পিস্তল। পুরে নিতে পারবেন হাতের মুঠোয়। ম্যাগাযিনে চারটে বুলেট।

কাউকে কখনও গুলি করেননি মোবারক, কিন্তু দরকার পড়লে আজ তা-ই করবেন। খালি হাতে ফিরবেন না প্রাণ থাকতে।

এলিভেটর থেমে যেতেই ষাঁড়ের মত গুঁতোগুঁতি করে বদ্ধ জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল সবাই। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছেন মোবারক, ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। ডেক-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে একজনের ওপর চোখ পড়ল তাঁর।

লোকটার এক চোখে কালো পট্টি। পায়ের সামনে নামিয়ে রেখেছে কাপড়ের একটা ব্যাগ। মনে হলো ভেতরে ভারী কিছু।

প্রফেসর আবু রশিদের সামনে থেমে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বললেন মোবারক, 'ভাল আছেন?'

মাথা দোলালেন ভদ্রলোক। কঠোর পরিশ্রমে রোদে পোড়া মুখ। গাল চিরে কানা চোখ পর্যন্ত গেছে গভীর ক্ষতচিহ্ন। নিচু স্বরে বললেন আবু রশিদ, 'ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।'

'কিন্তু বাস করেন এই দেশে,' বললেন মোবারক।

'আপনার কাছ থেকে টাকা বুঝে পেলে এ দেশে আর থাকব না,' বললেন ইরানিয়ান। 'মানুষের চামড়া সাদা না কালো, তা নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করছে এরা।'

ইরানে দ্বিতীয়বার যাওয়ার পর আবু রশিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ডক্টর মোবারকের। ভদ্রলোক ছিলেন আর্কিওলজিস্ট এবং একটি ব্যক্তিগত জাদুঘরের কিউরেটর। সবুজ বিপ্লবের পক্ষে কাজ করেছেন বলে তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে খুন করেছিল সরকারি দলের লোক। রশিদ নিজে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসেন ফ্রান্সে। কেউ ভাবতেও পারেনি, তাঁর কাছে রয়ে গেছে অতি

প্রাচীন ও দুর্লভ এক সম্পদ। এখন ভাবছেন, ওই ট্যাবলেট বিক্রি হলে যে টাকা পাবেন, তা নিয়ে যোগ দেবেন প্রতিরোধ যুদ্ধে।

'এবার খোদা চাইলে ঠিকই ফিরব দেশে,' বললেন পদচ্যুত প্রফেসর ও কিউরেটর।

বিষণ্ন হাসলেন মোবারক। আগেও আবু রশিদের সঙ্গে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করেছেন। তাঁর সবসময় মনে হয়েছে, সফল হবে না সবুজ বিপ্লব। মাথা নাড়লেন তিনি। 'বন্ধু, আসল কথা, স্রষ্টা বলে কেউ নেই। আমাদেরকে দেখভাল করছে না কেউ। নইলে মানুষে মানুষে এত হানাহানি থাকত না।'

জবাবে তিক্ত হাসলেন আবু রশিদ। তাঁর হাসি মোবারকের হাসির মতই ম্লান। নিচু স্বরে বললেন, 'পশ্চিমারা আপনার মাথা খেয়ে নিয়েছে, ভাই!'

'অনেক বিষ ঢেলেছে মনে, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে ওই ধারণা আমার নিজের।' চুপ হয়ে গেলেন মোবারক। মনে পড়েছে, কিছু দিন আগে পশ্চিমা একটা দলের লোক কীভাবে অত্যাচার করেছে তাঁর ওপর।

'আপনি যা বললেন, তার ভেতর সন্দেহের সুর, ভাই,' বললেন আবু রশিদ। 'যাক সেসব, বলবেন, কেন আপনার দরকার ওই ট্যাবলেট? কী করবেন ওটার ভেতরের সত্য জেনে?'

জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন মোবারক, 'আপনার জিনিসটা হাতে পাওয়ার জন্যে আরও অপেক্ষা করতে হবে?'

'আমি নিজে পুরো পঁয়ত্রিশ বছর ওগুলো হাতে পেতে চেয়েছি,' বললেন রশিদ। 'জানি না আপনার কতটা দরকার, কিন্তু আমার ভুল না হয়ে থাকলে ওই ট্যাবলেট বা তাম্রলিপি তৈরি করেছিল সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষিত মানব। আপনি কি বুঝতে পারছেন এর মানে? এই খবর ছড়িয়ে পড়লে হামলে পড়বে কোটি কোটি ডলারের মালিক সব বড়লোক।'

কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল মোবারকের। ঠিকই বলেছেন আবু রশিদ। কিন্তু সেজন্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। আগেও পেয়েছেন নকল জিনিস। জানতে চাইলেন, ‘আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে যে এসব আসল?’

‘বোঝার উপায় নেই,’ বললেন রশিদ, ‘কিন্তু যেসব ট্যাবলেট পড়ে ওই কবরের খোঁজ পেয়েছি, ওখানে লেখা ছিল এক বাগানের কথা। ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে মানুষটা। আরও লিখেছে...’

‘এখানে খোলা জায়গায় কিছু বলবেন না,’ সতর্ক করলেন মোবারক।

বিরক্ত হলেন রশিদ। ‘কিন্তু আপনার জানা থাকা দরকার। যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়। মাটির ট্যাবলেটে লেখা আছে পানি, তলোয়ার, আগুন আর মৃত্যুর কথা।’

‘এ ছাড়া নিশ্চয়ই থাকবে জীবনের কথা,’ জোর দিয়ে বললেন মোবারক। তিনি জানেন না, যা চাইছেন তা পাবেন কি না।

‘হ্যাঁ, জীবনের কথা,’ সায় দিলেন রশিদ।

‘আর মুড়িয়ে রাখা তামার জিনিসটা?’

‘আগেই বলেছি, ওটা তোলা হবে বৈরুতের এক নিলামে,’ হতাশ সুরে বললেন রশিদ।

একই সঙ্গে ভয় ও হতাশা বোধ করলেন ডক্টর মোবারক। ভেবেছিলেন মুড়িয়ে রাখা তাম্রলিপি হাতে পাবেন আবু রশিদ। কিন্তু তা হয়নি। ওটা নিয়ে ভেবে এখন লাভ হবে না। মাটির ট্যাবলেট পেলেও চলবে তাঁর।

‘কখনও ভেবেছেন, অন্তর থেকে একটা জিনিস চাইছেন, কিন্তু সবসময় ওটা রয়ে গেছে আপনার নাগালের বাইরে?’ বললেন রশিদ।

‘হুঁ, কখনও কখনও তা-ই হয়,’ স্বীকার করলেন মোবারক।

'ওই তাম্রলিপি আমার জীবনে ঠিক তেমনই এক জিনিস। যতবার ওটার খুব কাছে গেছি, হারিয়ে গেছে বহু দূরে।' মাথা দোলালেন আবু রশিদ। 'আপনি যে টাকা দেবেন, হয়তো তার একটা অংশ ব্যয় করেই একদিন কিনে নেব ওই তাম্রলিপি। একবার ওটা পেলে আবার যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে। দু'জন মিলে জেনে নেব কী আছে ওটার ভেতর।'

তার মানে টাকা পেলে বৈরুতে যাবেন আবু রশিদ। নিলামে অংশ নেবেন। সেক্ষেত্রে তাম্রলিপি পেলে হয়তো একমত হবেন রশিদ ও তিনি। জানবেন, সত্যিই পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত এক বাগান ছিল কি না। অবশ্য, আগে দরকার মাটির ট্যাবলেট।

'জিনিসটা দেখতে দিন,' বললেন মোবারক।

মেঝে থেকে ব্যাগ তুলে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন আবু রশিদ।

থলির মত কাপড়ের ব্যাগের চেন খুলে ভেতরে চোখ রাখলেন মোবারক, আটকে ফেলেছেন শ্বাস। বুঝে গেলেন, সত্যিই হয়তো মাটির ট্যাবলেট জানাবে জীবন-মরণের জটিল রহস্য।

জিনিসটা বাদামি পাথরের মত, সেখানে খোদাই করা কী যেন। আরেকবার শ্বাস নিলেন মোবারক। এটা পাওয়ার জন্যে প্রায় পাগল হতে বাকি ছিল তাঁর।

রশিদের চোখ অনুসরণ করে টাওয়ারের একপাশে চোখ গেল তাঁর। ইরানিয়ানের মুখে ফুটে উঠেছে সত্যিকারের আতঙ্ক।

'আপনি সতর্ক ছিলেন না,' প্রায় ফিসফিস করলেন রশিদ। ঘুরে দেখতে যাচ্ছিলেন মোবারক, কিন্তু নিচু স্বরে বললেন প্রফেসর, 'ভুলেও ঘুরবেন না।'

সোজা হয়ে মেঝেতে কমপিউটার কেস রাখলেন মোবারক। আড়চোখে দেখেছেন, ছড়িয়ে পড়ে ভিড়ের মাঝ দিয়ে আসছে

চারজন যণ্ডার্ম। রিফ্লেকটিভ ভেস্টের জন্যে পরিষ্কার বোঝা গেল তারা কারা। কোমরের হোলস্টারের পাশে হাত। যেন বুঝে গেছে ঝামেলা হবে।

'পুলিশ!' ফিসফিস করলেন রশিদ।

চারজনের একজনকে চিনে ফেললেন মোবারক। বুকে বিঁধল ভয়ের তীক্ষ্ণ তীর। চাপা স্বরে বললেন, 'পুলিশ না ওরা! আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে!'

'কিন্তু এত লোকের ভেতর...'

'কেউ কিছু করতে পারবে না,' বললেন মোবারক।

পা দিয়ে রশিদের দিকে ঠেললেন কমপিউটার ব্যাগ। শক্ত করে ধরলেন মাটির ট্যাবলেটের ব্যাগ। ভাবছেন, একবার ভিড়ের ভেতর দিয়ে এলিভেটর পর্যন্ত যেতে পারলেই...

এক পা যেতেই কাঁধে ভারী হাত রাখল কে যেন। হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে নেয়া হলো তাঁকে। খুব সতর্ক বলে চট্ করে ব্যাগ মেঝেতে রাখলেন তিনি, এক হাত মাথার ওপর তুলেছেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে। অন্য হাত ঢুকল কোটের পকেটে। পেয়ে গেলেন ছোট্ট অস্ত্র, বের করার সময় নেই, তাক করেই টিপে দিলেন ট্রিগার।

গুলির জোরালো 'বুম!' শব্দে কাঁপল অবযার্ভেশন ডেক। এক লাফে সরে গেল আশপাশের দর্শক। পেট খামচে ধরে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল পুলিশের ভেস্ট পরা লোকটা। হাতের ফাঁক গলে ঝর্নার মত পড়ছে লাল রক্ত।

ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার জুড়ল নারী দর্শকরা। ঘুরে দৌড় দিল সবাই এলিভেটর ও সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

গুলির কমলা আগুনে একটু পুড়ে গেছে মোবারকের হাত ও কোমর। বোকার মত চেহারা করে দেখলেন আহত লোকটাকে। যেন বুঝছেন না কী করেছেন। তাঁর চারপাশে নানান দিকে ছুটছে

ভীত দর্শক। নিজেও তাদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু কয়েক দিক থেকে এল গুলি।

বাধ্য হয়ে ডাইভ দিয়ে একপাশে পড়লেন মোবারক। পকেট থেকে বের করেছেন পিস্তল। আইফেল টাওয়ারের লোহার কারুকাজের আশ্রয় পেয়ে পাল্টা গুলি পাঠালেন শত্রুদের লক্ষ্য করে। আপাতত তিনি নিরাপদ। কিন্তু হালকা হয়ে উঠছে ছুটন্ত ভিড়। একটু পর পরিষ্কার তাঁকে দেখবে শত্রুপক্ষ।

পাশ থেকে বললেন আবু রশিদ, 'লড়াই করে জিতবেন না! যা চায় দিয়ে দিন! তাম্রলিপি ছাড়া ওই মাটির ট্যাবলেটের কোনও মূল্য নেই!'

'ভুল,' বললেন মোবারক, 'ট্যাবলেটই আসল জিনিস!'

অন্য মত পোষণ করেন বলেই খপ করে কাপড়ের ব্যাগ আঁকড়ে ধরে ঘুরে এলিভেটর লক্ষ্য করে ছুটতে চাইলেন রশিদ। কিন্তু পা বাড়িয়ে দিয়েছেন মোবারক, ল্যাং খেয়ে মেঝেতে আছাড় খেলেন রশিদ। হাত থেকে ডেকে পড়ে ভাঙল ট্যাবলেটের একটা কোনা।

আমেরিকান সুরে প্ল্যাটফর্মের একপাশ থেকে চিৎকার করল একজন, 'আহসান মোবারক! আপনি সরে গেছেন বিশ্বাস থেকে! তাই প্রভু বলেছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে!'

ওই গলা চিনলেন মোবারক।

থিয়োডর এন. মার্ডক!

ভয়ঙ্কর খুনি!

হাসতে হাসতে মানুষের রক্তে স্নান করে!

মাটির ট্যাবলেট তুলে নিয়েই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন মোবারক, খুঁজছেন আরও ভাল কোনও আশ্রয়। যথেষ্ট দ্রুত সরতে পারেননি। ঊরুতে বিঁধল বুলেট। মেঝে থেকে পা সরে যেতেই পিছলে পড়লেন মোবারক। ব্যথায় মনে হলো পাগল

হয়ে যাবেন। কয়েক গড়ান দেয়ার পর শুরু করলেন ক্রল। তখনই দ্বিতীয় বুলেট গাঁথল তাঁর কাঁধে।

কোনও দিকে না চেয়ে সামনে বাড়লেন মোবারক। লোহার কারুকাজ করা একটু ভাল আড়াল পেয়ে থামলেন ওখানে। শক্ত হাতে ধরেছেন ট্যাবলেট। আইফেল টাওয়ারের ইস্পাতের সব পাতের মাঝ দিয়ে বাইরে গেল চোখ। আবার দেখলেন চারপাশ।

তিনদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা। কোনওভাবেই এলিভেটর বা সিঁড়ির দিকে যেতে পারবেন না।

না, পালাবার উপায় নেই!

ছোট্ট পিস্তলে বড়জোর আছে আর দুটো বুলেট।

লড়াই করেও কোনও লাভ নেই।

অসহায় চোখে আবারও চারপাশ দেখলেন মোবারক।

পাশ থেকে বললেন রশিদ, 'দিয়ে দিন! নইলে বাঁচতে দেবে না!'

'আপনাকে বা আমাকে ছাড়বে না ওরা,' জবাবে বললেন মোবারক। বহু নিচের রাস্তায় পুলিশের গাড়ির সাইরেন। বুঝে গেলেন, দেরি করবে না খুনির দল, এবার প্রথম সুযোগে খুন করবে ওদের দু'জনকে।

প্ল্যাটফর্মের কোনা দেখলেন মোবারক। ওখান থেকেই শুরু খোলা আকাশ। ভাল করেই জানেন, এখন আর কোনওভাবেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না। যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তার জন্যে কিছুই করতে পারলেন না। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একদল লোক কেড়ে নেবে ট্যাবলেট। মানব-সভ্যতাকে শেষ করে দিতে ব্যবহার করবে ওটার ভেতরের তথ্য।

তা হতে দিতে পারেন না তিনি।

মসৃণ, খোদাই করা মাটির ট্যাবলেটে হাত বোলালেন

মোবারক, একবার দেখলেন ওটার মাঝের সিম্বল। ওটা বৃত্তাকার, তার চারপাশে চারটে পেরেকের মত দাগ। ওই চার চিহ্নের মাঝে একটা বর্গক্ষেত্র, তার ভেতর ছোট একটা আয়তক্ষেত্র।

আবু রশিদ বলেছিলেন, ওটাই প্রাচীন আমলের বিশেষ এক উদ্যানের চিহ্ন। ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু রশিদ বা তাঁর কোনও কাজে এল না ওটা। যেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, এখানেই শেষ হচ্ছে তাঁর কষ্টকর জীবন। সত্যিই যদি দেখভাল করার কেউ থাকেন, তাতেই বা কী, সারাজীবন ধরে যা করেছেন, সেজন্যে প্রচণ্ড নির্যাতনের কোনও নরকে পাঠানো হবে তাঁকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে চললেন মোবারক।

একটু দূর থেকে এল খুনি মার্ডকের নির্দেশ: 'হাল ছেড়ে দিন, মোবারক!'

'যাতে আমাকে ব্যবহার করে ধ্বংস করতে পারো পৃথিবীটা?'

'নইলে আপনার সঙ্গেই শেষ হবে আপনার সৃষ্টি,' ধমকের সুরে বলল মার্ডক। 'আপনি কি তা-ই চান?'

পিছলে আরও কয়েক ইঞ্চি এগোলেন মোবারক। 'নিজের চোখে এই পৃথিবীকে নরক হতে দেখার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।'

'খুব জরুরি না হলে খারাপ কোনও কাজ করি না আমরা,' বলল মার্ডক। 'আপনি নিজেও আগে বলেছেন, আসলে কী করা উচিত।'

মুখ থেকে যেসব কথা বেরিয়ে গেছে, সেজন্যে এখন লজ্জিত হলেন মোবারক। উচিত ছিল না চরম কোনও মন্তব্য করা। তাঁর

পেশা আসলে এমনই! জেনেটিসিস্টরা সবসময়েই জন্ম-রহস্য নিয়ে কাজ করছে স্রষ্টার মতই। কিন্তু এখন...

দুঃখে ভারী হয়ে গেল তাঁর বুক। কী করে বসেছেন তিনি!

গত কয়েক দশকের আপ্রাণ চেষ্টার দৃশ্য ভেসে এল চোখে। এক পলকে বুঝলেন কোন্‌টা আসলে সত্য। হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে শেষ করে দিতে হবে এত কষ্টের সব গবেষণা।

তিলতিল করে প্ল্যাটফর্মের আরও কাছে গেলেন মোবারক। ফিসফিস করে বললেন, 'আমি দুঃখিত, মিনতি! চেষ্টা করেছিলাম রে! পারলাম না!'

ঘাড় ফিরিয়ে শেষ দুটো গুলি অন্ধের মত ছুঁড়লেন, পরক্ষণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই লাফিয়ে উঠে দৌড়াতে চাইলেন। ঝাঁপ দেবেন উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে শূন্যে।

কিন্তু এক পা যেতে না যেতেই পেছন থেকে এল গুলির গর্জন। প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন মোবারক, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। ঠক করে বাড়ি খেল দুই হাঁটু। এক হাতে ধরে ফেললেন প্ল্যাটফর্মের রেলিং। অন্য হাত থেকে মেঝেতে পড়ল ট্যাবলেট। ওটার বুকের জীবন-চিহ্ন চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

গায়ে কোনও শক্তি পেলেন না, ধপ করে বসে পড়লেন মোবারক। হাত বাড়িয়ে দিলেন ট্যাবলেটের দিকে। স্পর্শ করলেন মাটির মসৃণ জিনিসটা। তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিলেন প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরের শূন্যে।

বার কয়েক পাক খেল ট্যাবলেট, যেন চিরকালের জন্যে ঝুলছে বাতাসে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝলেন মোবারক, ছোট হয়ে আসছে মাটির ট্যাবলেট। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর পড়ল অনেক নিচের কংক্রিটের রাস্তায়। হাজার টুকরো হলো ওটা।

মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়লেন মোবারক। কালো কী যেন

ঝেঁপে আসছে দু'চোখে। ভাবলেন, এবার মগজে ঢুকবে বুলেট। কিন্তু কর্কশ হাতে হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো তাঁকে।

'আমাদের সঙ্গে নেব,' শুনলেন মার্ডকের কণ্ঠ। 'দু'জনকেই।'

'ট্যাবলেটের কী হবে?' দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে ভয়।

পরিষ্কার বুঝলেন মোবারক, ভয়ঙ্কর খেপে যাবে ওদের প্রভু!

অপেক্ষাকৃত কম ভয় পেয়েছে থিয়োডর মার্ডক। 'আগে দরকার ওই তাম্রলিপি। পরে ওটা দেখে খুঁজে বের করব ওই জিনিস।'

সচেতন করতে গিয়ে মাথার চুল ধরে বার কয়েক মোবারককে ঝাঁকি দিল মার্ডক। 'খুন করার আগে তোর মুখ থেকে বের করব সব! বিশ্বাস কর্, বারবার প্রার্থনা করবি, যাতে মরে যেতে পারিস!'

ঘন এক ধূসর কুয়াশার ভেতর শুনলেন সব মোবারক। আবছা দেখলেন, মার্ডকের নিষ্ঠুর হলদে চোখ। জন্মের ঘৃণা করে লোকটা তাঁকে। ঠিক কথাই বলেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে খুন করবে সে।

মরতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে খুব আফসোস হলো মোবারকের।

কে বলেছে পৃথিবীতে নরক নেই?

সত্যিকারের নরক দেখাবে তাঁকে থিয়োডর এন. মার্ডক!

ছয়

ডুবরোভ্‌নিক শহর থেকে বত্রিশ মাইল দূরে নির্জন, ছোট এক

এয়ারপোর্টের র‍্যাম্পে অলস ইঞ্জিন নিয়ে অপেক্ষা করছে সাইটেশন এক্স বিযনেস জেট বিমান। ওটার ভেতর চুপ করে বসে আছে এলেনা রবার্টসন। দরজা খোলা। একটু আগে লাগানো হয়েছে বিমানের সিঁড়ি। স্ট্যাণ্ডস্টিল-এ যে যার কাজ সারছে কর্তৃপক্ষের লোক।

এনআরআই-এর চিফের অনুমতি নিয়ে এই দেশে এসেছে এলেনা। দেরি না করে সরিয়ে নেবে মাসুদ রানাকে।

এই বিমানের ওপর কারও নজর থাকলে, তার জানা হয়ে গেছে, এটার মালিক মাল্টার রহস্যময় এক কর্পোরেশন। আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ওই সংগঠন। আমেরিকার সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই। যদিও কবর খুঁড়লে জানা যাবে, এলেনা রবার্টসন আসলে এনআরআই এজেন্ট। এ কারণেই বিমান থেকে বেরোয়নি সে। র‍্যাম্পের ক্লোয্‌ড্‌ সার্কিট ক্যামেরা ফিড আসছে কেবিনের সামনের ফ্ল্যাট-স্ক্রিনের মনিটরে। ওদিকে চোখ রেখেছে ও।

বিশ মিনিট আগেই পৌছে যাওয়ার কথা ছিল রানার। কিন্তু কোনও কারণে দেরি হচ্ছে। ক্রমেই চিন্তিত হয়ে উঠছে এলেনা। মুখে কখনও স্বীকার করবে না, কিন্তু মাসুদ রানার জন্যে নিজের জান দিতেও আপত্তি নেই ওর। মানুষটার সঙ্গে যত মিশেছে, ততই বদলে গেছে সে। আগে এত দৃঢ় ছিল না ওর ব্যক্তিত্ব। রানাকে অনুকরণ করেই ছেঁটে ফেলেছে সে নিজের অনেক অভ্যাস। ফলে সংগঠনে উঠে এসেছে সম্মানজনক অবস্থানে। এনআরআই-এর সবাই জানে, যা করা উচিত, ঠিক তা-ই করবে এলেনা, থামবে না কোনও বাধা পড়লেও।

আবারও ভুরু কুঁচকে গেল এলেনার।

দেরি হচ্ছে কেন রানার?

মস্ত কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?

এমনিতেই খচ-খচ করছে ওর মন।

রানাকে জানাতে হবে দুঃসংবাদ।

মনিটরে দামি এক সাদা সেডানকে আসতে দেখল এলেনা।

বিমানের পাশে এসে থামল ওটা।

গাড়ি থেকে রানাকে নামতে দেখে চাপা শ্বাস ছাড়ল এলেনা। পাঁচ সেকেণ্ড পর সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠল তার মনের মানুষ দুর্দান্ত ওই বাঙালি যুবক। সরাসরি এলেনার নীল চোখে স্থির হলো ওর কুচকুচে কালো দুই মণি।

'দেরি দেখে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। জাগুয়ার গাড়িতে করে দিয়ে গেল কে?'

'বন্ধু।' এলেনার মুখোমুখি সিটে বসল রানা। 'রাস্তায় জ্যাম ছিল।'

বিমানের গা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো সিঁড়ি।

বাইরের দরজা বন্ধ করে ককপিটে ফিরল কো-পাইলট।

আর্মরেস্টের ইণ্টারকম বাটন টিপে বলল এলেনা, 'আমরা তৈরি।'

ওদিক থেকে এল পাইলটের কণ্ঠ: 'আমরা হ্যামবুর্গের জন্যে ফ্লাইট প্ল্যান করেছি। আমরা কি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব?'

'আকাশে ওঠার পর বলছি কোথায় যাব,' বলে রানার দিকে ফিরল এলেনা। 'ঠিক আছে?'

'বেশ।' মাথা ঝাঁকিয়ে জরুরি কথায় এল রানা, 'সায়েণ্টিস্ট মোবারকের ব্যাপারে কিছু জানলে তোমরা?'

কেবিনের বাইরে গর্জন করছে জেট ইঞ্জিন।

এলেনার চোখে চোখ রেখে রানা বুঝে গেল, যে-কোনও কারণেই হোক, আপাতত অন্য প্রসঙ্গে সরতে চাইছে মেয়েটা।

'হ্যাঁ, খবর নিয়েছি,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল এলেনা। 'ভদ্রলোকের ব্যাপারটা বেশ জটিল।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'জানতাম জটিলই হবে। তোমাদের কারও সাহায্য চাই, তা-ও নয়। তাঁর খোঁজ পেলে পরের কাজ করব।'

বড় করে দম নিল এলেনা। 'আমাদের জন্যে তোমাকে সময় দিতে হয়েছে, কাজেই তোমার হয়ে বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করা হয়ে উঠেছিল আমাদের কর্তব্য।'

চুপ হয়ে গেল এলেনা।

মস্তবড় বিপদে আছেন মোবারক, টের পেল রানা। পেশাগত দক্ষতার কারণে তাঁকে কাজে লাগাতে চাইবে অনেকেই। আর এ-ও স্বাভাবিক, তাদের বেশিরভাগই হবে মন্দ লোক। প্রথম থেকেই অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় জেনেটিক টেকনোলজি। হাজার হাজার নিউক্লিয়ার ওয়েপন লাগে না, সাধারণ সব জিনিস দিয়েই তৈরি করা যায় মারাত্মক সব বায়োলজিকাল ওয়েপন। আর সেগুলো ব্যবহার করলে স্রেফ নরক হয়ে উঠবে পৃথিবী।

গোপনে রাখা সম্ভব বায়োলজিকাল ওয়েপন বা জীবিত অস্ত্র। ওসব বদলাতে থাকে, মিউটেট করে, বড় হয় অথবা ছড়িয়ে পড়ে। শত্রু কখন ব্যবহার করবে, আগে থেকে বলতে পারবে না কেউ। কারও জানার উপায় নেই, নিজেদের অস্ত্রেই শেষে ঘায়েল হবে কি না। এমন কী আস্ত সাগর পেরিয়ে যেতেও সময় নেবে না ভয়ঙ্কর প্লেগ। যাওয়ার পথেই হয়তো পাল্টে নেবে নিজেকে। ফলে নিরাপত্তার বোধ বাতাসে মিলিয়ে যেতে বাধ্য। নিজেদের তৈরি ভ্যাকসিন হয়তো কোনও কাজেই এল না। ব্যাপারটা শুকনো ঘাস জমিতে বাড়ি বানিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মত।

যৌক্তিক মনের মানুষ বুঝবে, ব্যবহার করা উচিত নয় এত বিপজ্জনক অস্ত্র। কিন্তু ফ্যানাটিক, আত্মঘাতী জঙ্গি বা ডুম্স্ডে কাল্টের লোক ভাববে, খুবই দরকার এসব অস্ত্র। একবার হাতে

পেলেই দেরি করবে না ব্যবহার করতে। হয়তো সামান্য কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে রোগটা, তারপর কিছু দিনের ভেতর মরতে শুরু করবে শত শত মানুষ।

রানা এখনও জানে না, ঠিক তেমনই কিছু ঘটেছে নিউ ইয়র্কে ইউএন অফিসে। চিঠি দেয়া হয়েছিল ইউ.এস. অ্যাম্বাসেডর ডেবি ম্যাকেঞ্জিকে। সেদিনই অসুস্থ হয়ে গেছেন মহিলা। পশ্চিমা সিকিউরিটি সার্ভিস ধারণা করছে, ওই ভাইরাসের স্রষ্টা ডক্টর আহসান মোবারক।

'আসলে গত আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর দুটো কারণে খুব জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি,' মুখ খুলল এলেনা। রানার চোখে তাকাল। 'প্রথম কথা, তোমার কথামত ডক্টর মোবারকের বিষয়ে খোঁজ নিতে শুরু করি আমরা। প্যারিসে তাঁকে পাই, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। রানা, খুন হয়ে গেছেন তিনি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে?'

সিটের পাশে ডক্টর আহসান মোবারকের ফাইল রেখেছে এলেনা। এগিয়ে দিল না। মুখে বলল, 'আটাশ ঘণ্টা আগে আইফেল টাওয়ারের দ্বিতীয় অবযার্ভেশন ডেকে গুলি করা হয় তাঁকে। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, বিষয়টা টেরোরিস্ট হামলা। তখন ওখানে ছিল ইরান থেকে পালিয়ে আসা এক আর্কিওলজিস্ট। কিন্তু পরে অন্য তথ্য পাই। তখনই জানতে পারি, ওই ডেকে গোপনে মিটিং করতে চেয়েছিলেন মোবারক আর ওই ইরানিয়ান।'

'কোনও কারণে খুন করা হয়েছে ওই দু'জনকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল এলেনা। 'চাক্ষুষ সাক্ষী আর ভিডিয়ো থেকে জানা গেছে, তাদের দু'জনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। হামলাকারীদের পরনে ছিল প্যারিসের পুলিশের ইউনিফর্ম। কিন্তু পুলিশ থেকে জানিয়ে দিয়েছে, এদের কাউকে কাস্টোডিতে

নেয়নি তারা।'

'তা হলে?'

'গতকাল শহরতলীর পরিত্যক্ত এক বাড়ির ভেতর পাওয়া গেছে চারজন পুলিশের লাশ। একদিন আগে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। সঙ্গে ইউনিফর্ম ছিল না। এদের দায়িত্ব ছিল আইফেল টাওয়ার এলাকায় চোখ রাখা।'

'তার মানে, আইফেল টাওয়ার এলাকায় ঢুকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে ওরা।'

আবারও মাথা দোলাল এলেনা। 'তা-ই। পুলিশ সদস্যদের ইউনিফর্ম, আইডি এমন কী তাদের গাড়িও ব্যবহার করেছে।'

'আঁচ করা গেছে কাজটা কাদের?'

মাথা নাড়ল এলেনা। 'ওই হামলার দায় নেয়নি কেউ।'

'বিজ্ঞানী মোবারক কীভাবে খুন হন?' জানতে চাইল রানা।

'আজ সকালে পাওয়া গেছে লাশ। দুঃখিত। প্রচণ্ড অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দেহটা।' এলেনা টের পেল, রেগে গেছে রানা। 'এখনও সব তথ্য পাইনি। কিন্তু যে বর্ণনা শুনেছি, তা ভয়াবহ। শহরের বাইরে খালি এক জমিতে লাশটা পেয়েছে পুলিশ।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা। চুপ করে আছে।

ওর হাতে ফাইলটা ধরিয়ে দিল এলেনা।

পড়তে গিয়ে রানা জানল, ডক্টর মোবারকের সঙ্গের ইরানিয়ান ছিল গ্রিন রেভ্যুলেশনের সঙ্গে জড়িত। চোরাই অ্যান্টিকিউটি বিক্রি করত। তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আইফেল টাওয়ার সাইটে একটা কমপিউটার কেসে ছিল বিপুল অর্থ। ডেক থেকে ফেলে দেয়া হয় শুকনো মাটির কিছু। অনেক ওপর থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেছে জিনিসটা।

ফাইল দেখাল এলেনা। 'ওখানে পাবে মিস্টার মোবারকের

ব্যাকগ্রাউণ্ড ইনফর্মেশন।'

আবারও পড়তে লাগল রানা।

ওর মুখের দিকে চেয়ে এলেনা বুঝল, কেন যেন নিজের ওপর রাগ ও বিরক্তি বোধ করছে মানুষটা। 'আরও একটা খবর দিইনি,' বলল ও। 'ওটা আরও খারাপ।'

ফাইল থেকে মুখ তুলল রানা।

'যেদিন উধাও হলেন মিস্টার মোবারক, সেদিনই ইউএন-এ হুমকি দিয়ে এল চিঠি। ওটার ভেতর ছিল অদ্ভুত এক ভাইরাস। ইউএস অ্যাম্বাসেডর ডেবি ম্যাকেঞ্জি আক্রান্ত হন তাতে।'

'শুনেছি ইউএন অফিসে অ্যানথ্রাক্সের হামলা হবে,' বলল রানা। 'সেটাই বলছ?'

'সাধারণ মানুষকে শান্ত করতে তা প্রচার করা হয়েছে,' বলল এলেনা।

'আসল খবর আরও খারাপ?' জানতে চাইল রানা, 'সেটা কী?'

'ওই ভাইরাস আগে কখনও হামলা করেনি কোথাও,' বলল এলেনা। 'পুরো এক শ' পার্সেন্ট ইনফেকশিয়াস। ওটার কারণে যে-কোনও সময়ে শুরু হবে প্লেগ।'

'আর ওটার সোর্স আসলে সায়েন্টিস্ট আহসান মোবারক?'

'তা-ই ধারণা করা হচ্ছে। কেউ দাবি করেনি যে সে বা তারা পাঠিয়ে দিয়েছে ওই চিঠি। খামে ছিল হাতের ছাপ। ওগুলো মিস্টার মোবারকের।'

বড় করে দম ফেলল রানা। আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে মন। মরে গেলেন মোবারক, কিন্তু তার আগে কী করে গেছেন, বোঝা মুশকিল। তাঁর কারণে মস্ত বিপদে পড়তে পারে তাঁর মেয়ে মোনা। নিচু স্বরে বলল, 'মাফ করা যায় না এমন কিছু করেছিলেন মোবারক। এটা শুনেছি।'

‘তোমার দেশের কৃতী নাগরিক, তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যু মেনে নিতে পারছ না,’ নরম সুরে বলল এলেনা। ‘তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু কী জানো, যেটা পরে আমাদের কাজে আসবে?’

‘আমার চেয়ে তোমরাই বেশি জানো,’ ফাইল দেখাল রানা।

‘আমরা কিন্তু জানি না আফ্রিকায় কী হয়েছিল। তোলা হয়েছিল কিছু ছবি। এ ছাড়া, কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই। তুমি তাঁর সঙ্গেই ছিলে তখন।’

ফাইল বন্ধ করেও ফেরত দিল না রানা। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর সব গুছিয়ে নিয়ে বলতে লাগল: ‘আমার সঙ্গে ডক্টর আহসান মোবারক এবং তাঁর মেয়ের পরিচয় হয়েছিল আফ্রিকার রিপাবলিক অভ দ্য কঙ্গোয়। বিসিআই থেকে ওখানে পাঠানো হয় আমাকে। ওই দেশের সরকার থেকে দু’বিজ্ঞানীকে বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন বছরে দু’বার ফসল হবে এমন বীজ তৈরি করেন।’

এলেনার হাতে ফাইল দিয়ে দিল রানা।

‘কিন্তু কিছু দিনের ভেতর চাপ দিতে শুরু করল আর্মি। অন্য জিনিস চাই তাদের। রাজি হলেন না মোবারক। শুরু হলো হুমকি। সেসময় এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন তিনি। বিসিআই থেকে আমাকে পাঠানো হয়, আমার কাজ ছিল মিস্টার মোবারক ও মোনাকে সরিয়ে আনা।’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ট্যাক্সিং শুরু করেছে সাইটেশন এক্স বিযনেস জেট বিমান।

‘আর্মির জেনারেলদের সাধ্যমত সবই দেবেন বলার পর কিছু দিনের জন্যে শান্ত হলো তারা। তখন প্রথম সুযোগে ওই দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসি দুই বিজ্ঞানীকে।’

‘শুনেছি কোনও কাজ শুরু করলে থামতেন না মিস্টার

মোবারক,' বলল এলেনা।

মাথা দোলাল রানা। 'কাজে ডুবে যেতে ভালবাসতেন।'

'কাজ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে এসব মানুষ খেপে যান। হয়ে ওঠেন প্রতিশোধপরায়ণ। তাঁর ব্যাপারে তেমন কিছু হয়েছিল?'

মাথা নাড়ল রানা।

'কখনও বলেছেন যে কী বিষয়ে কাজ করছেন? বা কোনও ইঙ্গিত দিয়েছেন?'

সিটে হেলান দিয়ে মনের সাগরে ডুব দিল রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'সবসময় কথা তুলতেন স্রষ্টা ও জেনেটিকস বিষয়ে। বারবার বলতেন, সত্যি স্রষ্টা থাকলে এভাবে নরক হয়ে উঠত না পৃথিবী। আসলে নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদের মাঝে দ্বিধায় থাকতেন। কখনও বলতেন, অনেক খারাপ কাজ করেছেন বলে তাঁকে চরম শাস্তি দিচ্ছে স্রষ্টা। মরে গেলেও মাফ পাবেন না।'

'তোমার কি মনে হয়, সত্যি ভয়ঙ্কর কোনও ভাইরাস তৈরি করার মত মানুষ ছিলেন মিস্টার মোবারক? বা ধরলাম তৈরি করলেন, কিন্তু ব্যবহার করার জন্যে তুলে দিতেন খারাপ লোকের হাতে?'

সময় নিয়ে ভাবছে রানা। দু'মিনিট পর বলল, 'ইন্টারপোল মনে করে তিনি সাধারণ মানুষের শত্রু। উন্মাদ বিজ্ঞানী। কিন্তু যতটুকু দেখেছি তাঁকে, আমার মনে হয়নি যে উনি ম্যাস মার্ডার করার মত মানুষ। কঙ্গো থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চেয়েছিলাম। রাজি হননি। বলে দিয়েছিলেন, কখনও কাউকে গুলি করতে পারবেন না।'

'মানুষ তো সময়ে বদলে যায়,' বলল এলেনা।

'তুমি জানতে চেয়েছ তাঁর বিষয়ে আমার মনোভাব। তাই জানালাম।'

‘হুঁ।’ মাথা দোলাল এলেনা।

‘জরুরি কোনও কারণে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন,’ বলল রানা। ‘তাঁকে দিয়ে কোনও কাজ করিয়ে নিতে চাইছিল কেউ। আমার ধারণা, মিস্টার মোবারককে পেয়ে গেছে সেই লোক। বাধ্য করেছে ভাইরাস তৈরি করতে। ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে প্লেগের মত করে। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেবে রোগ। আর সেই লোকই প্রেরকের নামহীন চিঠির মাধ্যমে হামলা করেছে ইউএন অফিসের ওই মহিলার ওপর। মনে করি না মিস্টার মোবারক এত বোকা ছিলেন যে খামের ওপর নিজের হাতের ছাপ রাখবেন।’

গুড পয়েন্ট, ভাবল এলেনা। আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ইউএন লেটার এসেছে ইন্টারনাল সোর্স থেকে। অথচ সে-সময় মিস্টার মোবারক ছিলেন ওই অফিস থেকে কমপক্ষে তিন হাজার মাইল দূরে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই চিঠি দিল কে?

কপাল খারাপ, ইউএন সিকিউরিটি প্রথম থেকেই মনোযোগ দিয়েছে বাইরের বেড়ার দিকে। খুব কম ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে দালানের ভেতর। এটা করেছে, যাতে নির্ভয়ে নিজেদের ভেতর গোপনে আলাপ করতে পারেন কূটনীতিকরা। কখনও রেকর্ড করা হয় না সেসব।

চুপ করে বসে আছে রানা, সামান্য সামনে ঝুঁকে চোখ রাখল এলেনার নীল চোখে। ‘আমার জানা নেই কী করছিলেন মিস্টার মোবারক। কিন্তু অন্তর থেকে বলতে পারি, মানুষ হিসেবে ভাল ছিলেন তিনি। নইলে অনেক আগেই কঙ্গোর ওই নরপশুগুলোকে প্রয়োজনীয় বায়োলজিকাল ওয়েপন দিতেন। বা এভাবে বলতে পারি, যারা মেরে ফেলল তাঁকে, তাদেরকেও দিতে চাননি বায়োলজিকাল অস্ত্র।’

কথাটা মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখল এলেনা। খুব জোর

দিয়ে বলেছে রানা। এ-ও বুঝল, মৃত বিজ্ঞানীর হত্যাকারীদের ছাড়বে না বলেই মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছে খ্যাতিমান বাঙালি গুপ্তচর।

'তুমি ওদেরকে ছাড়বে না,' নিচু স্বরে বলল এলেনা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'এই বিমান হ্যামবুর্গে নেমে গেলেই খুঁজব দরকারী তথ্য। খুন করা হয়েছে এক বাঙালি বৈজ্ঞানিককে। কাজেই সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কোনও বাঙালির উচিত এর বিচার দাবি করা।'

'বুঝতে পারছি কেমন লাগছে তোমার,' বলল এলেনা, 'অবাক হইনি। কিন্তু এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক বড় কিছু।'

'তুমি চাও আমার সঙ্গে যোগ দিতে?'

'বিষয়টা এদিকে গড়াবে, আগেই ভেবেছি,' বলল এলেনা, 'তাই বসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছি। তিনি তা দিয়েছেন অন্য কারণেও। আগে ডেবি ম্যাকেঞ্জি ছিলেন সিআইএ ও এনআরআই এজেন্ট। নানান সাহায্য করেছেন আমাদেরকে। তাঁর কারণেই অন্য এজেন্সি থেকে জরুরি কাজ সরিয়ে দেয়া হয়েছে এনআরআই-এ, তাতে বেড়েছে আমাদের সংগঠনের সম্মান। আপাতত সিডিসির সঙ্গে মিশে ওই ভাইরাসের ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। উঁচু মহল থেকে বলা হয়েছে, আমরা যেন খুঁজে বের করি ভাইরাস হামলাকারীকে। আর, রানা, ওরাই খুন করেছে মিস্টার মোবারককে। এ-ও মনে করি না যে সঙ্গে গেলে ধীর করে দেব তোমাকে।'

কিছুই বলল না রানা।

'যা করার একা করতে চাও?' আপত্তির সুরে জানতে চাইল এলেনা।

'না, তা নয়,' বলল রানা।

'ভাবছ এনআরআই সাহায্য করতে পারবে না?'

'তা-ও নয়,' বলল রানা, 'আসলে কো-ইনসিডেন্স বিশ্বাস করি না। অথচ গত দু'দিনের ভেতর দুটো ঘটনা ঘটেছে।'

মাথা দোলাল এলেনা। নিজেও মনে করে না, কো-ইনসিডেন্স বলে কিছু আছে। সিআইএ থেকে সরে এসে এনআরআই-এর পাবলিক ডিভিশনে চাকরি করতেন ডেবি ম্যাকেঞ্জি। তাঁর মত অনেকেই ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন পৌঁছে গেছেন উঁচু পর্যায়ে। কেউ পেয়েছেন কর্পোরেট আমেরিকায় ভাল ক্যারিয়ার, গেছেন পলিটিক্সে বা অন্যান্য সরকারি এজেন্সিতে। তাঁদের কিছু হলো না, কিন্তু বেছে নেয়া হলো অ্যাম্বাসেডর ডেবি ম্যাকেঞ্জিকে। নতুন অপারেশন ডিভিশনের সঙ্গে কোনও সম্পর্কও ছিল না তাঁর। আসলে জানতেনও না এনআরআই এখন কী ধরনের কাজ করে।

তাঁকে টার্গেট করা অবশ্যই অদ্ভুত কো-ইনসিডেন্স।

'আমাকে পাশে রাখতে আপত্তি নেই তো?' জানতে চাইল এলেনা।

'না, নেই,' বলল রানা, 'আলাপ করেছি আমার চিফের সঙ্গে। তিনি বলেছেন, এই মিশনে তুমি এলে আপত্তি থাকা উচিত নয় আমার। সেক্ষেত্রে চারপাশে চোখ রাখতে পারব দু'জন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল এলেনা। 'এদিকে আমার বস্ বলেছেন, তুমি এসবে জড়িয়ে গেলে যেন চেষ্টা করি তোমার সঙ্গে থাকতে। নানান ধরনের সুবিধে পাব।'

চুপ করে থাকল রানা।

ইন্টারকম বাটন টিপল এলেনা।

ককপিট থেকে বলল পাইলট, 'আমরা টেকঅফের জন্যে তৈরি।'

‘গুড,’ বলল এলেনা, ‘আন্তর্জাতিক জলসীমায় গেলেই ফ্লাইট প্ল্যান জমা দেবেন কর্তৃপক্ষের কাছে।’

‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘প্যারিস?’ রানার দিকে তাকাল এলেনা।

মাথা দোলাল রানা।

‘সোজা প্যারিসে,’ পাইলটকে জানাল মেয়েটা।

সিটে হেলান দিল রানা। ‘আবারও কোনও বিপজ্জনক মিশনে জড়িয়ে গেলাম দু’জন।’

‘শিখে নেব নতুন আরও বহু কিছু,’ খুশি মনে হাসল এলেনা।

সাত

তার নাম থিয়োডর এন. মার্ডক। গায়ের রং কালচে, দৈহিক গড়ন বিশাল। চওড়া চোয়াল। ভারী ভুরুর নিচে ডাকাতের মত চোখ। মনে হয় যেন সত্যিকার দানব। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট, চওড়ায় তেমনই বিশাল। হাতের পাঞ্জা ভালুকের। প্রভুর পর দলের দ্বিতীয় লোক সে। তার দায়িত্বেই আছে একদল খুনি। তাদেরকে বলা হয় ব্লাড ফোর্স। প্রভুর জন্যে মানুষ খুন করতে দেরি করে না তারা। থিয়োডর এন. মার্ডকই প্রভুর হুকুমে পিটিয়ে খুন করেছে চার ফ্রেঞ্চ পুলিশকে।

অন্তর থেকে ভালবাসে প্রভুকে, তার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রভুর নির্দেশ পালন করা।

লে কুখনেইভ, ফ্রান্স।

নির্জন এক বুলেভার্ডে পরিত্যক্ত এক বাসস্টপেজের ছাউনিতে বসে আছে মার্ডক। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে পুরনো জিন্স পরা এক তরুণকে। তার পরনে অপেক্ষাকৃত বড় এক হুডি। হেঁটে আসতে আসতে আবর্জনা ভরা ট্র্যাশ ক্যানে লাথি দিল তরুণ। জং ধরা পুরনো সব গাড়ি পাশ কাটিয়ে গেল। শেষ রায়টের সময় এসব গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল একদল ক্ষিপ্ত তরুণ।

লে কুখনেইভ হলো প্যারিসের শহরতলী। পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম খারাপ বস্তি এলাকা। এখানে জুটেছে গরীব ফ্রেঞ্চ ও আলজিরিয়ানরা। কূপের ভেতরের ব্যাঙের মত গাদাগাদি করে বাস করছে সবাই মিলে। দুর্গন্ধের ভেতর কেটে যাচ্ছে জীবন। কারও কোনও আয়রোজগার নেই বললেই চলে, তাই কোনও আশাও নেই মনে। মরে যেতে পারলে বাঁচবে।

দু' হাজার পাঁচ সালে এই বস্তি এলাকায় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরেছিল দুই তরুণ। মিডিয়া প্রচার করেছিল, রায়ট আরম্ভ হয় জাতিগত লড়াইয়ের কারণে। কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছিল ভাল করেই জানে মার্ডক। এই বস্তিতে রয়েছে অনেক জাতের মানুষ, নানান রং তাদের চামড়ার, সবাই থাকে মিলেমিশে। সবার বুকে রাগ ও হতাশা। বড়লোকরা ভুলে গেছে তাদেরকে। সরকারও ঘৃণা করে, মানুষ বলেই গণ্য করা হয় না ওদের।

বস্তিবাসীরা বলে, নিয়মিত এসে তাদের ওপর নির্যাতন চালায় পুলিশ। ওদিকে পুলিশ বলে, যখন-তখন তাদের ওপর হামলা করে নেশাগ্রস্ত তরুণ ও যুবকরা। এই এলাকাকে ধরে নেয়া হয়েছে রেড যোন হিসেবে। দলেবলে সশস্ত্র হয়ে না এলে কেউ নিরাপদ নয় এখানে।

অবশ্য আপাতত কারও ওপর হামলা করবে না কেউ। দলে দলে এই এলাকায় ঘুরছে পুলিশ বাহিনী। রাস্তার দূরে মার্ডক দেখল, খুব ধীর গতি তুলে আসছে পুলিশের দুটো গাড়ি আর এক আর্মার্ড এসইউভি। এদিকেই পাওয়া গেছে চার পুলিশের লাশ। ভয়ঙ্কর খেপে গেছে পুলিশ বাহিনী। কেউ সামান্য তেড়িবেড়ি করলেই পিটিয়ে আধমরা করে গ্রেফতার করা হবে তাকে।

হেঁটে আসা তরুণকে পাশ কাটিয়ে গেল পুলিশের কনভয়। ওদিকে ভুলেও তাকাল না ছেলেটা। ভাল করেই জানে, চোখ তুলে দেখতে হয় না পুলিশের চোখে। মার্ডকের পাশে এসে থামল সে, বসে পড়ল দাগভরা বেঞ্চিতে।

'যা করতে বলেছি, করেছ,' বলল মার্ডক, 'আমি সেজন্যে খুশি। খুশি হয়েছেন প্রভুও।'

'লাশগুলো পেয়ে গেছে পুলিশ।'

'হ্যাঁ,' বলল মার্ডক। 'আমরা তা-ই চেয়েছি।'

কথাটা শুনে অসুস্থ বোধ করে শিউরে উঠল তরুণ জুবায়ের। 'লাশ পেয়ে যাক কেন চাইলেন?'

প্রশ্নের জবাব দিল না মার্ডক। 'ওদের জন্যে দুঃখ লাগছে?'

'ওরা যা করে, সেজন্যে ঘৃণা করি ওদেরকে,' বলল জুবায়ের।

'সেক্ষেত্রে বলতে পারো, উচিত শাস্তি পেয়ে গেছে ওরা।'

চেহারা দেখে মনে হলো সায় দেবে জুবায়ের। কিন্তু চোখে এখনও দ্বিধা। জানতে চাইল, 'এবার কি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারব?'

'সব ছেড়ে সরে যেতে পারবে? তুমি কি তৈরি?'

'আমার আছেই বা কী?'

'কিছুই নেই?' জানতে চাইল মার্ডক।

মাথা নাড়ল জুবায়ের। 'আমার বাবা নেই। ভাই নেই। আমি ফ্রেঞ্চ নাগরিক, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ফ্রেঞ্চরা বলে নোংরা কুকুরের বাচ্চা আরব। ভাল করেই জানি, আমি ওদের কেউ নই।'

'তুমি মুসলিম,' বলল মার্ডক।

'ছিলাম। এখন আর কারও কাছে প্রার্থনা করি না।'

'কেন করো না?'

দ্বিধা নিয়ে চুপ করে থাকল জুবায়ের।

'কেন প্রার্থনা করো না, জুবায়ের?'

মাটির দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বলল তরুণ, 'খোদা কখনও প্রার্থনার জবাব দেন না।'

'তুমি তা হলে ঠিক পথেই আছ,' ভরসার সুরে বলল মার্ডক।

চুপ করে কী যেন ভাবছে তরুণ। কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, 'অন্যদের কী হবে?'

হামলার সময় কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েছিল জুবায়ের। তারাও ওর মতই এই জীবনে চরম হতাশ। কিন্তু জুবায়েরের মত দক্ষ এবং সাহসী নয়। মার্ডক মাথা নাড়ল। 'অন্যরা তোমার মত মূল্যবান নয়। কাজের জন্যে পয়সা দিয়ে দেয়া হবে। ওদেরকে পেছনে ফেলে অনেক দূরে সরে যাবে তুমি। অথবা, চাইলে থেকেও যেতে পারো এখানে।'

ঠিকভাবেই তরুণের ওজন বুঝে নিয়েছে মার্ডক।

বন্ধুদের ফেলে যেতে খুবই খারাপ লাগবে জুবায়েরের। যে-দেশ মোটেও চায় না ওকে, সেটা ত্যাগ করতে আপত্তি থাকবে না ওর, বা যে স্রষ্টা ঘুরেও দেখে না বিপদের সময়, তাকে ভালবাসার কোনও কারণ নেই; কিন্তু জুবায়েরের পরিবার বলতে ছিল শুধু রাস্তার ওই হদ্দ নোংরা ছেলেগুলো। তাদের সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে সে। যা পেয়েছে ভাগ করে নিয়েছে। তাদের ত্যাগ

করা খুব কঠিন কাজ।

কয়েক বছর আগে ওই একই সমস্যায় পড়েছিল মার্ডক। কিন্তু জুবায়েরের বন্ধুদের মত নয়, ওর বন্ধুরা বুঝত না কোথা থেকে আসছে সরকারের এই স্বৈরশাসন। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইত, বড়লোক বা শক্তিশালীদের ঘৃণা করত— জানত না কীভাবে বদলে দিতে হবে নিজের জীবন।

মার্ডকের চোখ খুলে দিয়েছিলেন প্রভু। দেখিয়ে দিয়েছিলেন সত্য। হাজার মিথ্যা থেকে সরিয়ে নেন ওকে। আর এখন ঠিক তেমন করেই জীবন পাল্টে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে মার্ডক জুবায়েরকে।

'তা হলে ওদেরকে ফেলে যাব,' বলল জুবায়ের। তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। 'আমাকে ছাড়া ভালই থাকবে ওরা।'

'কথাটা ঠিক হলো না,' আপত্তির সুরে বলল মার্ডক। 'নিজের জীবন গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে তুমি। কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।'

মুখ তুলে মার্ডককে দেখল তরুণ।

'রুই ডে জাখদান্স্ সেইন্ট পলে একটা বাড়ি আছে। ওটা এক বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরি। ওখানে যাবে। যা পাবে, সব সরিয়ে নেবে। জিনিসগুলো আমাদের কাজে আসবে। কেউ বাধা দিলে, দেরি করবে না খুন করতে।'

তরুণের হাতে ভাঁজ করা একটা কার্ড দিল মার্ডক।

ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ঠিকানা। ওটা পড়ে নিয়ে পকেটে কার্ড রেখে দিল জুবায়ের।

তার দ্বিধা টের পেয়েছে মার্ডক। নিজেও চিন্তিত হয়ে উঠল সে, শেষ পর্যন্ত কাজটা করবে তো এই ছেলে!

উঠে মার্ডকের চোখে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জুবায়ের। আবর্জনা ভরা রাস্তার দূরে দেখল। দাঁড়িয়ে আছে

পাথরের মূর্তির মত।

'তোমার মনে প্রশ্ন জেগেছে,' আঁচ করল মার্ডক। 'জিজ্ঞেস করো।'

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল জুবায়ের, 'কী নাম দেবেন আপনি আমার?'

'তোমার নাম দেবেন প্রভু।'

'আপনিই তো বোধহয় প্রভু?' ভুল ধারণা করেছে জুবায়ের।

'না,' মাথা নাড়ল মার্ডক। 'আমাকে খুঁজে নিয়েছেন প্রভু। এক দিন ঠিকই দেখবে তাঁকে।'

মাথা দোলাল জুবায়ের। 'কী নাম দেবেন তিনি আমাকে?'

মৃদু হাসল মার্ডক। অতীত পেছনে ফেলে এগোবার জন্যে তৈরি জুবায়ের। জানতে চাইছে ওর নতুন নাম। বুঝতে চাইছে কীভাবে চলবে ওর জীবন।

'তিনি তোমার নাম দেবেন মামবা,' বলল মার্ডক, 'শত্রুর জন্যে খুব বিপজ্জনক সাপ তুমি, তোমার বিষ ভয়ঙ্কর।'

মার্ডকের চোখে তাকাল না জুবায়ের। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় করে দম নিল। বিষাক্ত সাপ সে! ভীষণ ভয় পাবে তাকে শত্রুরা!

'এবার যাও, গিয়ে শেষ করো নিজের কাজ,' নরম সুরে বলল মার্ডক।

আট

মাঝ আকাশে সোনার থালার মত ঝকঝক করছে সূর্য। দুপুরের একটু আগে প্যারিসের চার্লস্ দ্য গল এয়ারপোর্টে নামল রানা ও এলেনার সাইটেশন এক্স বিযনেস জেট বিমান। আধঘণ্টা পর এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এক পিউযো গাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যস্ত মোটরওয়ে ধরে প্যারিসের মূল অংশ লক্ষ্য করে চলল ওরা।

এরই ভেতর স্যাটালাইট ফোনে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের সঙ্গে কথা বলেছে এলেনা।

ভদ্রলোক জানিয়ে দিয়েছেন, ডক্টর মোবারকের বিষয়ে নতুন কিছুই জানতে পারেনি কেউ। একই কথা খাটে ইউএন অফিসে ভাইরাস হামলার ব্যাপারেও। কোথাও কোনও সূত্র নেই। চারপাশে কান পেতেও প্যারিসের পরিচিত টেরোরিস্ট সব দলের ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি।

ব্রায়ান আরও বলেছেন, বোধহয় একেবারেই নতুন কোনও দলের কাজ। খুবই সতর্ক ওটার নেতা, গোপন করছে সব। অথবা এতই ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত, অন্য সব টেরোরিস্ট দলের মত গলা ফাটাবার উপায় নেই তাদের। আসলে তারা কারা বুঝলেই পাল্টা হামলা হবে নানান দেশের সিক্রেট সার্ভিস থেকে।

এদিকে চার পুলিশ হত্যায় ভীষণ খেপে গিয়ে চারপাশে তল্লাসী করছে ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শত শত সন্দেহজনক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জোগাড় করা যায়নি নতুন কোনও

তথ্য। কেউ যেন কিছুই জানে না।

তবে নতুন কিছু তথ্য দিয়েছে সিআইএ। ইরানের আবু রশিদ গ্রিন রেভ্যুলেশনের সদস্য। তার ওপর চোখ রাখছিল সিআইএ। সুযোগ পেলে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করত। কাজটা যদিও খুবই বিপজ্জনক। সিআইএ ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ একথা জানা গেলে, ভোট পাওয়ার বদলে ভোট বেশি হারাবে বিপক্ষ দল, বা খুন হবে তাদের প্রার্থী। এসব ভেবেই আড়াল থেকে আবু রশিদের ওপর চোখ রেখেছিল সিআইএ। যে দিন তুলে নেয়া হলো আবু রশিদ আর বিজ্ঞানী আহসান মোবারককে, তার আগের রাতে রশিদের কাছে ফোন এসেছিল মধ্য প্যারিস থেকে। কমপিউটারের মাধ্যমে গলা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, ফোনটা করেছিলেন মোবারক।

'সেইন-এর তীরে এক বাড়ি থেকে ফোন করা হয়,' ফোনের জিপিএস ম্যাপে চোখ রেখেছে এলেনা। 'ওই বাড়ি সার্চ করলে হয়তো নতুন কিছু জানব।'

হাইওয়ের তীক্ষ্ণ এক মোড় পেরিয়ে গেল রানা।

গুগল ম্যাপ দেখছে এলেনা। 'ওদিকে কিছু বারোক বাড়ি। এ ছাড়া, নামকরা এক খাবারের দোকান। সূত্র বলতে এ-ই।'

রানা ধারণা করেছিল, পরিত্যক্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা কমার্শিয়াল এলাকায় ছোট কোনও আস্তানা খুঁজে নিয়েছেন মোবারক। বাস্তবে তা নয়, প্যারিসের বুকে অভিজাত এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেন। টাকার অভাব ছিল না।

'জান হাতে নিয়ে লুকিয়ে পড়া পাগল বিজ্ঞানীর স্টাইল এটা,' বলল এলেনা। 'শান্ত নদীর তীরে বিলাসবহুল বাড়ি, আর কী চাই?' মৃদু হাসল। 'ডক্টর মোবারক সম্পর্কে পড়ছিলাম। তোমার কী ধারণা, আসলে কতটা ব্রিলিয়াণ্ট ছিলেন তিনি?'

'দুর্দান্ত ছিল তাঁর মগজ,' বলল রানা। 'দেশের জন্যে বহু

কিছুই করেছেন। বিদেশে নিজে রয়ে গেলেও বড় কোনও জেনেটিক আবিষ্কার করলে প্রথমেই তার সব তথ্য পৌঁছে দিতেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে। এমন সব কাজ করেছেন, যার কারণে ওসব ইঞ্জিনিয়ার্ড ফসল বা মাছের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেছে, উপকৃত হয়েছে গোটা দেশ।'

'খুবই ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু বেমক্কা মরে গেলেন।'

আসলে ছিলেন একাকী, অদ্ভুত এক মানুষ, ভাবল রানা। বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কিছুই করার ছিল না ওর। পরে মনে হয়েছে, মস্ত বিপদে পড়তে পারে ডক্টরের মেয়ে মোনা। তাই তাকে নিরাপদ রাখার জন্যে দায়িত্ব বোধ করছে ও। প্রতিভাবান বাঙালি ছিলেন মোবারক, যার খুশি খুন করে ফেলবে তাঁকে, সেটা মেনে নেয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। বিসিআই চিফের সঙ্গে মোবারক প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলাপও করেছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান বলেন, 'তোমার উচিত চারপাশে খোঁজ নেয়া। হয়তো কোনও আদালতে বিচার হবে না, কিন্তু শাস্তি হওয়া উচিত খুনির। ওই লোক বা তার দল এরপর আরও কত মানুষকে খুন করবে বা কী ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ডেকে আনবে, কেউ বলতে পারে না। আগেই উচিত এদেরকে ঠেকিয়ে দেয়া।' আলাপের শেষ পর্যায়ে আরও বলেন, 'বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত নতুন কিছু পাওয়া গেলে সেটা হয়তো কাজে আসবে বাংলাদেশের।'

এলেনার নরম স্বরের কথা শুনল রানা।

'ডক্টর মোবারক প্রথম জেনেটিক বিজ্ঞানী, যিনি আবিষ্কার করেন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার হামলার সময় যেভাবে আক্রান্ত হয় হোস্টের মিলেনিয়া, তার চেয়ে অনেক দুর্বলভাবে ল্যাবে জেনেটিক স্প্লাইসিং করে মানুষ।'

'বিস্তারিত পড়িনি,' স্বীকার করল রানা।

‘তার মানে, আমাদের ডিএনএর অর্ধেক জেনোম এসেছে হাজার কোটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থেকে। ইনফেকশন আসলে প্রাচীন আমল থেকে জমেছে আমাদের দেহে। সোজা কথায়, আমরা যে মানব ডিএনএ নিয়ে গর্বিত, তার অর্ধেকের বেশি এসেছে সূক্ষ্ম ওসব প্রাণী থেকে।’

‘তা হলে আমরা ভাইরাসেরই অংশ,’ মৃদু হাসল রানা।

‘এক অর্থে তা-ই।’

‘ভাইরাল হওয়ার নতুন অর্থ পেলাম,’ বলল রানা।

হাসল এলেনা। ‘বোধহয় জানো, ডক্টর মোবারক হিউম্যান ডিএনএর স্ট্র্যাণ্ডের তিনটে জিন সিকিউয়েন্স টেকনিক আবিষ্কার করেন। তাই একলাফে অনেকটা এগিয়ে যায় আর সব জেনেটিক বিজ্ঞানীরা।’

এসব ভাল করেই জানে রানা।

‘অবাক লাগছে অন্য কারণে,’ বলল এলেনা। ‘দারুণ সম্মান ও অকল্পনীয় পরিমাণের টাকা ছেড়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসেন তিনি। এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে না কেউ।’

মিস্টার মোবারক খুনের রহস্য উন্মোচিত হলে এসবের ব্যাখ্যা পাব, ভাবল রানা। মনে পড়ল, তাঁর পাঠিয়ে দেয়া ফ্ল্যাশ ড্রাইভের তথ্য: ‘*আশা করি আপনি পড়ছেন এই লেখা। আপনার কি মনে পড়ে আমার অন্তরের সেই প্রশ্ন? সত্যিই কি আছে স্রষ্টা? এবার ওই জবাবের খুব কাছে পৌঁছে গেছি। আর সেজন্যে যখন-তখন খুন হব। ওই মৃত্যু স্রষ্টা দেবে না, মানুষই দেবে। আশা করতে গিয়ে করে বসেছি মস্ত এক অন্যায়। কিন্তু ওরা বুঝে গেছে সব। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। একবার ধরতে পারলে মেরে ফেলবে আমাকে। এরই ভেতর পেয়ে গেছে প্লেগ ছড়িয়ে দেয়ার উপযুক্ত বাহন। এবার চাই সত্যিকারের ভাইরাসটা। ওরা আমাকে মেরে ফেলার আগেই যেভাবে হোক*

সাহায্য করুন, রানা। ওরা আসার আগেই সরিয়ে নিন আমাকে। জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ করার খুব কাছে আছি। কিন্তু পুরো সফল হওয়ার আগেই ওরা খুন করতে চাইবে।

যদি পারেন, চলে আসুন প্যারিসে। আপনি ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না। এমন কাউকে চাই, যে ওদের হাত থেকে রক্ষা করবে আমাকে। ওরা আছে চারপাশে, আবার আড়াল করে রেখেছে নিজেদেরকে। বুলডগের মত ধাওয়া করছে। এখানে রয়ে গেলেও মরব, আবার পালাতে গেলেও বাঁচব না। ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারছি না। ধরে ফেলবে। কোনওভাবেই আপনি আমার কাছে কৃতজ্ঞ নন, বরং আমিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তবুও অনুরোধ করছি আপনার কাছে, বলুন, আর কার কাছেই বা সাহায্য চাইব? আপনি ছাড়া কেউ নেই যে সাহায্য করবে আমাকে...'

লিখিত বক্তব্য থেকে কিছুই স্পষ্ট নয়। চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ই-মেইল ঠিকানা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই খুন হয়ে গেছেন বিজ্ঞানী।

মানুষটা মরার সময় ভেবেছেন, কেউ নেই যে সাহায্য করবে— এটা বারবার বিব্রত করছে রানাকে। বড় একা ছিলেন ডক্টর মোবারক। আশা করেছিলেন পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ও। কিন্তু অপেক্ষা করে বুঝে গিয়েছিলেন, চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে শত্রু, অথচ কিছুই করেনি রানা।

মেসেজে এমন কোনও তথ্য নেই যা থেকে বুঝবে, কাদের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছেন মোবারক। কী ধরনের গবেষণা করছিলেন, তা-ও লেখেননি।

অবশ্য, এটা স্বাভাবিক। রানা পৌঁছুতে পারলে মুখ খুলতেন। যেহেতু সাহায্য পাননি, গোপন রেখেছেন সব তথ্য।

'সামনে ডান দিকের রাস্তা,' ম্যাপ দেখে বলল এলেনা।

নির্দেশ মত রানা ঢুকল আঁকাবাঁকা এক সড়কে। ওটা দেখে ওর মনে হলো, এমনই প্যাঁচালো ছিল বিজ্ঞানীর জীবন। প্রতিটা পদে বেছে নেন ভুল পথ। চলে গেছেন আরও কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির ভেতর। দোষ থাকুক বা না থাকুক, শেষ পর্যন্ত খুন হয়েছেন। আর কাজটা যারা করেছে, সম্ভব হলে তাদেরকে খুঁজে বের করবে রানা। বিচারের মুখে দাঁড় করাবে। এসব করতে গিয়ে হয়তো পড়বে মস্ত বিপদে, খুন হতে পারে নিজেই। কিন্তু জীবন তো সবসময় এমনই। প্রতিটি মোড় পেরোলেই তো আসবে নতুন সব গন্তব্য।

গম্ভীর হয়ে এলেনাকে দেখল রানা। বড় ধরনের বিপদে জড়িয়ে পড়ছে। উচিত হচ্ছে মেয়েটাকে সঙ্গে জড়িয়ে নেয়া?

এনআরআই চিফের দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রাস্তায় ঢুকে পড়ল রানা। মাঝারি চওড়া পথ এঁকেবেঁকে গেছে বহু দূরে।

দু'পাশে বারোক স্থাপত্যের সব বাড়ি, একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা কঠিন।

মোবারকের বাড়ির সামনে পৌঁছে রাস্তার ওদিকে গাড়ি রাখল রানা। এবার হয়তো জানবে বাড়িতে কী রেখেছিলেন বিজ্ঞানী। কিন্তু কেমন খচ-খচ করছে ওর মন।

নয়

রুই ডে জাখদাঙ্গ সেইন্ট পলের রাস্তা নির্জন। নির্দিষ্ট বাড়ির দিকে ক্যামেরা আকৃতির একটা ডিভাইস তাক করল এলেনা।

যন্ত্রটা কান পাতার মেশিন। বাড়িতে কথা বা শব্দ হলে সেটা পৌঁছে যাবে এলেনার কাছে। বিশেষ কাঁচ কমিয়ে দেয় তরঙ্গের গতি, বা ব্যবহার করা হয় জ্যামিং ডিভাইস, সেক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবে এই ডিভাইসের সিগনাল। অনেকটা এভাবেই রেইডার তরঙ্গ ঠেকানো হয় প্রচণ্ড শক্তির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি দিয়ে। কিন্তু শব্দের বিশেষ ছাপ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। এলেনার ডিভাইস পরিষ্কার ধরবে বাড়ির ভেতরের সব আওয়াজ।

বাড়িতে কেউ থাকলে রিডআউট সমতল রেখা দেখাবে না।

কিন্তু কোনও তরঙ্গ বা জ্যামিং ডিভাইস কাজ করছে না। টিভি বন্ধ। আপাতত থমথম করছে চারপাশ।

স্ক্যানার চালু করল এলেনা। ব্যবহার করছে ইনফ্রারেড মোড। এক দেয়াল থেকে শুরু করে চারপাশ সার্চ করল। কোথাও কোনও হিট সোর্স নেই।

'ভেতরে কেউ নেই,' রানাকে জানাল এলেনা।

'গুড,' বলল রানা।

রাস্তার চারদিক স্ক্যান করল এলেনা।

আশপাশে কেউ নেই একটা কুকুর ছাড়া।

দুপুর দুটো, আকাশ থেকে আগুন ঢালছে সূর্য।

এদিকের সবাই গেছে যে যার অফিস, কলেজ, স্কুল বা অন্য কাজে।

গাড়ির দরজা খুলল রানা।

'কোথায় যাও?' জানতে চাইল এলেনা।

'বাড়িটা ঘুরে দেখতে।'

'আমি একা যাব,' বলল এলেনা। 'তোমার কাছ থেকে শেখা বিদ্যা ফলাবার এই তো সুযোগ।'

'কিন্তু...'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না এলেনা, ‘জেনেটিকস সম্পর্কে কী জানো তুমি? তার চেয়ে বাইরে থেকে আমাকে পাহারা দাও।’

‘আমি কি পাহারাদার?’

‘ছিহ্, তা কেন, তুমি আমার হিরো। সবসময় পাহারা দিতে হয় নায়িকাদেরকে।’

‘অন্য নায়িকারা কই? শুধু তুমি হলেই হবে?’ মৃদু হাসল রানা, ‘বলো দেখি, কী জানো জেনেটিকস সম্পর্কে?’

‘এটা জানি আমরা আসলে ভাইরাসেরই ভাই-বোন!’

একটু গম্ভীর হলো রানা, ‘কমপিউটার হ্যাক, এনক্রিপশন, বাইপাসিং অ্যালার্ম, সব বুঝে...’

‘কে বলল তোমার কাছ থেকে কিছুই শিখিনি?’ মাথা নাড়ল এলেনা। ‘তুমি মাস্টার, এবার ছাত্রীর পরীক্ষা নাও। বসে দেখো, চোরের মত ঢুকে ঠিকঠাক আবারও বেরিয়ে আসতে পারি কি না।’

সামান্য দ্বিধা করল রানা। পকেট থেকে ছোট একটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বের করে ধরিয়ে দিল এলেনার হাতে। ‘এটা ব্যবহার কোরো। রেডিয়ো অন রেখো। খারাপ কিছু বুঝলে দেরি না করে যোগাযোগ করবে।’

ক্লাস টু’র লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা দোলাল এলেনা, নেমে পড়ল গাড়ি ছেড়ে। পেরিয়ে গেল রাস্তা, ঢুকে পড়ল সামনের বাগানে। চালু করে নিয়েছে ডান কানের হেডফোনের স্পিকার। সিঁড়ি বেয়ে উঠল বারান্দায়। ভাব দেখে মনে হলো বাড়ির মালকিন আসলে ও-ই। হাতে ছোট কী এক ডিভাইস। কয়েক সেকেণ্ডে পরীক্ষা হয়ে গেল, চারপাশে অ্যালার্ম নেই। ছয় সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজার তালা।

মনে মনে ওর প্রশংসা করল রানা।

অবশ্য, এসব আমেরিকান ডিভাইস না পেলে অন্তত পাঁচ মিনিট ব্যয় হতো এলেনার। চারপাশ বুঝে নিয়ে খালি হাতে বাড়িতে ঢুকে পড়তে রানারও প্রায় এরকম সময়ই লেগে যেত।

রানার কণ্ঠ শুনল এলেনা, 'বেশি দেরি কোরো না।'

শক্ত কাঠের মেঝেতে খট-খট আওয়াজ তুলল এলেনার হাই-হিল। সামনের ঘরটা বড় হলেও প্রায় ফাঁকা। এক কোণে পেটমোটা গদিওয়ালা চেয়ার। পাশের বুক শেলফে পুরু ধুলো।

কিচেন, ডেন আর বাথরুম ঘুরে দেখল এলেনা, ভাবল ওই লোকের বউ ছিল না। ছিহ্, সুন্দর বাড়িটার কী অবস্থা করেছে! হায়, নিঃসঙ্গ, বোকা পুরুষ!

এদিক ওদিক ঘুরে আরেকটা ঘরে ঢুকল এলেনা।

ওটা ব্যবহার করা হতো লিভিং রুম হিসেবে। ঘরের মাঝে ডেস্ক আর চেয়ার। মেঝেতে দামি কার্পেট। দেয়ালের পাশে উঁচু র‍্যাকে হাই-টেক সব ইকুইপমেন্ট। সেসবের ভেতর রয়েছে বেশ কয়েকটা শক্তিশালী কমপিউটার। আরেক দিকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিযারেটর ও ইনকিউবেটর। ফ্রিযের কাঁচের দরজায় বরফ না জমলেও অস্বচ্ছ। ডেস্ক থেকে বামে প্লেক্সিগ্লাসের ওঅর্কস্টেশন। বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটাতেন বিজ্ঞানী। ডেস্কে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মাইক্রোস্কোপ। ওঅর্কস্টেশনে কাজ করার জন্যে আর্মহোল-এ ঝুলছে রাবারের গ্লাভস।

আসলে এই লিভিং রুম গুছিয়ে নেয়া হয়েছে ল্যাব হিসেবে। ইনকিউবেটরের পাশে থামল এলেনা। প্রথম দুটো গরম, কিন্তু ভেতরে কিছুই নেই। দেখা গেল না গ্লাস স্লাইড বা স্যাম্পল ট্রে। আছে ভেজা, কাদাটে মাটি। তৃতীয় ইনকিউবেটরে মাটির ওপর দু'ইঞ্চি পানি। কিছুই জন্ম নেয়নি ওখানে।

একটু দূরেই রেফ্রিযারেটর। প্লেক্সিগ্লাসের ওদিক দেখা গেল না। হাত দিয়ে কাঁচ ডলে পরিষ্কার করল এলেনা।

ভেতরে কিছু নেই।

কয়েকটা ফ্রিয, খালি।

ছোট এক ইনকিউবেটরের ভেতর কী যেন নড়ছে। উঁকি দিল এলেনা। ওগুলো ধেড়ে ইঁদুর। কোনোটা মৃত, আবার কোনোটা খুবই বয়স্ক। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নড়ছে। কনটেইনমেন্ট এরিয়া ভাল করে সিল করা। চট্ করে খুলতে পারবে না কেউ।

'আসলে করত কী এখানে?' বিড়বিড় করল এলেনা। একবার ভাবল, ডক্টর মোবারক সব সরিয়ে ফেলার আগেই এখান থেকে ঘুরে গেছে কেউ। এটা হয়েছে হয়তো বিজ্ঞানীকে মেরে ফেলার পর। তার আগে নির্যাতন করে তাঁর কাছ থেকে এই বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে নিয়েছিল কেউ।

প্রায় ঘিরে রাখা ওঅর্কস্টেশনের কাছে থেমে এলেনা বুঝে গেল, সামনের মেডিকেল ডিভাইসটা খুবই দামি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। ওটা অন করে আই পিসে চোখ রাখল। ভেতরে দেখার মত কিছুই নেই। অবশ্য ডিভাইসের সঙ্গে ইলেকট্রনিক রিডআউট এবং ছোট কিপ্যাড। পাওয়ার সুইচ অন করার পর দেখল নতুন মেন্যুর ইমেজ।

কোনও জেনেটিক মেটারিয়ালের পরীক্ষা চলছিল। জানার উপায় নেই, ওসব আসলে কী। ঘুরে চারপাশ দেখল এলেনা। চোখ পড়ল কমপিউটারের ওপর, হয়তো কিছু জানবে ওটা থেকে।

কমপিউটারের সামনে বসল এলেনা। টোকা দিল এণ্টার কী-র ওপর।

মনিটরে ভেসে উঠল এনক্রিপশন স্ক্রিন।

সহজ অপারেটিং সফটওয়্যার নয়। হেভি-ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড সিস্টেম। এলেনার সাধ্য নেই এই কমপিউটারের পেট থেকে কিছু বের করবে।

রানার কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ ইউএসবি ড্রাইভ পকেট থেকে বের করে কমপিউটারের স্লটে ঢোকাল এলেনা। বিসিআই-এর এক তুখোড় বাঙালি গবেষক তৈরি করেছেন জিনিসটা। এমন প্রোগ্রাম, অটো লঞ্চ হলে ভেদ করবে বেশিরভাগ এনক্রিপশন ফায়ারওয়াল।

তিন সেকেণ্ড পর ড্রাইভে জ্বলে উঠল সবুজ লেড বাতি। কাজ করছে খুদে যন্ত্র। সম্ভব হলে হার্ড ডিস্কের সব তথ্য চুরি করে নিজ পেটে ভরবে ওটা। ডেস্কের নিচের টাওয়ার নিজের দিকে টানল এলেনা। জিনিসটা নড়ল না। সাধারণ বাক্সের এক গাদা পেঁচিয়ে যাওয়া তার ছুটিয়ে নেয়াই কঠিন, তার ওপর কী যেন আটকে রেখেছে সবকিছুকে।

ডেস্কের নিচে উঁকি দিল এলেনা। বাক্স ধরে রেখেছে সরু এক কেবল আর লাল এক তার। সরিয়ে আনা যাচ্ছে না কেবল। লাল তার খুবই সন্দেহজনক। ওটা গেছে কম্পিউটারের পেছনে কোনও ম্যাগনেটিক সুইচ-এ।

চোখ দিয়ে লাল তার অনুসরণ করল এলেনা। ডেস্কের এক ড্রয়ারে গিয়ে ঢুকেছে ওটা। ইঁটের মত কী যেন ড্রয়ারের মাঝে। দেখে মনে হলো ওটা সি-৪।

অ্যালার্মের কী দরকার, ভাবল এলেনা। কেউ ভুল করলেই তো পুরো বাড়ি উড়ে যাবে আকাশে!

সি-৪ থেকে বেরিয়ে কার্পেটের নিচ দিয়ে গিয়ে ঘরের আরেক পাশের ইনকিউবেটর ও রেফ্রিযারেটর ইউনিটের পেছনে গেছে আরেকটা তার। ওটারই ভাই গেছে এক রেফ্রিযারেটরের পাশের বুক শেলফে। ওখানে ছোট কয়েকটা ড্রয়ার। সাবধানে ঘাঁটতে গিয়ে একটার ভেতর পেয়ে গেল এলেনা এক বাইণ্ডার। ভেতরের প্রায় সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত বিপজ্জনক তার।

বাইণ্ডারের পাতা ওল্টাল। হাতে লেখা সব মন্তব্য। ডক্টর

মোবারকের হাতে লেখা হলে, ইউএন অফিসের চিঠি লিখেছে অন্য কেউ।

এই বাইণ্ডারে লেখা একের পর এক টেস্ট রেযাল্টের রেকর্ড।

কোনওভাবেই যাতে তারে টান না পড়ে, তাই সাবধানে পাতা সরাচ্ছে এলেনা।

একের পর এক পাতায় গাদা গাদা নম্বর, সবই পরীক্ষার রিপোর্ট। ব্যর্থতার লিস্টি যেন তৈরি করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী।

এ হতেই পারে, ভাবল এলেনা। বর্তমান জেনেটিক সায়েন্সের এক শ'টা পরীক্ষার ভেতর ব্যর্থ হয় নিরানব্বুইটা এক্সপেরিমেন্ট। মস্তসব ফার্মাসিউটিকাল ল্যাবের প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর গবেষণা করেও শেষে ব্যর্থ হন, দেখাতে পারেন না ভাল কোনও ফলাফল।

পড়েছে এলেনা, সেরা সব বায়োটেক ল্যাবের জেনেটিসিস্টরা সারাজীবনেও দরকারী কোনও ওষুধ আবিষ্কার করতে পারবেন কি না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর।

এর কারণ, মানুষকে নিরাপদ রাখতে তৈরি হয়েছে কঠোর সব প্রোটোকল। ধীরে ধীরে বদলে নিয়ে আজকের সব জটিল প্রাণ তৈরি করেছে প্রকৃতি পুরো পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে। বহুবার ভুল করেছে প্রকৃতি, সময় নিয়ে ঠিক করে নিয়েছে নিজের ভুল। ওই একই কাজ করছে আজকের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে।

ডক্টর মোবারকের বাড়ির বাইরে ভাড়া করা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে রানা। বিপদ দেখলেই সতর্ক করবে এলেনাকে।

কোনও বাড়ি থেকে নির্জন রাস্তায় বেরোয়নি কেউ।

সোনালি আলোর দুপুরে থমথম করছে চারপাশ।

এরই ভেতর এসেও চলে গেছে দু'একটা গাড়ি।

এইমাত্র গেল এক ডেলিভারি ভ্যান।

দূরে দু'একজন পথচারী। কেউ এল না এ বাড়ির দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো বাঙালি বিজ্ঞানীর বাড়ি সার্চ করতে গেছে এলেনা, তারপর আর যোগাযোগ করেনি।

বিরক্ত হয়ে রেডিয়োতে বলল রানা, 'দরকারী কিছু পেলে?'

কয়েক সেকেণ্ড পর এল জবাব: 'ভেতরে ল্যাব করেছিলেন। কমপিউটার, ইনকিউবেটর, মাইক্রোস্কোপ সহ বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার জন্যে রেখেছিলেন সি-৪।'

'সাবধান, এলেনা,' বলল রানা।

'প্রায় কিছুই ধরছি না,' বলল এলেনা। 'বাইরে কোনও বিপদ নেই তো?'

'এখনও না। তবে...' চুপ হয়ে গেল রানা। আবারও ফিরেছে ইসুযু ডেলিভারি ভ্যান। থামল বিজ্ঞানীর বাড়ির সামনে। 'এক মিনিট, এলেনা। ঝামেলা হতে পারে।'

'ঝামেলা আসবে কোত্থেকে?'

'সামনের দরজা দিয়ে,' জবাবে বলল রানা।

'ক'জন ওরা?'

ইসুযুর কারণে বাড়ির সদর দরজা দেখতে পেল না রানা। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে তিনজন লোক, পরনে মুভিং কোম্পানির ইউনিফর্ম। ভ্যানের পেছনে থামল একজন। বাড়ির দরজার দিকে চলেছে অন্য দু'জন।

'কমপক্ষে দু'জন যাচ্ছে,' বলল রানা। 'তৃতীয়জন অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'বাড়ির ভেতর ঢুকবে ওই দু'জন?'

এলেনার কণ্ঠে হতাশা টের পেল রানা। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে মেয়েটা। বাধ্য না হলে সরবে না।

‘চারপাশ ঘুরে দেখছে। চেষ্টা করো বাড়ির পেছন দিয়ে বেরোতে।’

‘আমার একটু সময় লাগবে,’ বলল এলেনা।

লোকগুলোকে বাড়ির দরজা থেকে সরিয়ে নেয়া যায় কি না, তা নিয়ে ভাবছে রানা। চোখের কোণে দেখল, পেছন থেকে আসছে কালো এক ছায়া। এক সেকেণ্ডও লাগল না ওর বুঝতে, ঝট করে সরে গেল সিট থেকে। কানের কাছে খুক-খুক আওয়াজ তুলে উইণ্ডশিল্ড চুর-চুর করল সাইলেন্সার লাগানো এক পিস্তল।

ঘুরে দেখার সময় নেই, ছেঁচড়ে পাশের সিটে সরল রানা। তৃতীয় গুলি বিঁধল খালি সিটের ফোমের বুকে। প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে রাস্তার পাশে ফুটপাথে ধুপ করে পড়ল ও। আগেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করেছে পিস্তল। ঘাড় ফিরিয়েই গুলি পাঠাল আততায়ীকে লক্ষ্য করে।

বাইরে গুলির বিকট শব্দ। রানার ওয়ালথার .৩৮ ক্যালিবার পিস্তলের হুঙ্কার চিনতে ভুল হয়নি এলেনার।

এবার সরে যেতে হবে। কিন্তু মন বলছে, বহু কিছুর জবাবের খুব কাছে পৌঁছে গেছে। ঝড়ের গতিতে নোটবুকের পাতা ওল্টাল এলেনা। এতে দেরি হবে বুঝে চট্ করে চলে গেল শেষ পাতায়। ওখানে লেখা বেশ কিছু সংখ্যা ও শব্দ। শেষ এণ্ট্রি গত মাসের।

লিস্টের ওপর আঙুল রেখে পড়ল এলেনা।

সিরিজ ৯৪৮— রেযাল্ট ভাল নয় বলেই মেরে ফেলতে হলো সাবজেক্টকে।

সিরিজ ৯৪৯— রেযাল্ট ভাল নয় বলেই মেরে ফেলতে হলো সাবজেক্টকে।

সিরিজ ৯৫০— রেযাল্ট নির্ধারণ করতে হবে। জীবনী-শক্তি প্রভাবিত। বাঁচতে পারেনি সাবজেক্ট।

গুলির আরেকটা আওয়াজ শুনল এলেনা। একবার দরজার দিকে চোখ গেল ওর। আবার মনোযোগ দিল নোটের ওপর।

সিরিজ ৯৫১— রেযাল্ট ভাল নয় বলেই মেরে ফেলতে হলো সাবজেক্টকে।

সিরিজ ৯৫২— রেযাল্ট অদ্ভুত। কমে গেছে সাবজেক্টের টেলোমার বা জীবনী-শক্তি। যত দিন বাঁচার কথা, তার চেয়ে ৫১% কমে গেছে আয়ু।

এটাই শেষ এণ্ট্রি।

কমে গেছে সাবজেক্টের টেলোমার বা জীবনী-শক্তি। যত দিন বাঁচার কথা, তার চেয়ে ৫১% কমে গেছে আয়ু।

আবারও লেখাগুলো পড়ল এলেনা।

ডিএনএ স্ট্র্যাণ্ডের মলিকিউল চেনের শেষ অংশ টেলোমার। সেলুলার রিপ্রোডাকশন, সেলুলার লাইফ স্প্যান বা মানব জীবন দীর্ঘায়ু হওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওটার।

সায়েন্টিস্ট মোবারক আসলে কী নিয়ে কাজ করছিল?

কুঁচকে গেল এলেনার ভুরু।

তখনই দরজায় জোরালো বিস্ফোরণ হলো।

হাতে সময় নেই, নোটবুক থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়েই বাড়ির পেছন দিক লক্ষ্য করে ছুট দিল এলেনা। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল, কমপিউটারে রয়ে গেছে রানার ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। দৌড়ে আবারও ফিরল ও।

তখনই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সামনের দরজা।

হ্যাঁচকা টানে কমপিউটার থেকে ইউএসবি ড্রাইভ খুলেই পেছন দরজার দিকে দৌড় দিল এলেনা।

ভাড়া করা গাড়ির পেছন চাকার কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা। উল্টো দিকে সামনের চাকার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে আততায়ী। দু'জনের মাঝে আড়াআড়িভাবে বড়জোর দশ ফুট দূরত্ব।

গাড়ির তলা দিয়ে উঁকি দিল রানা। বদমাসটার পা দেখলেই ফুটো করে দেবে। কিন্তু খুব সতর্ক সে। বিরক্ত হয়ে উঠে বসে গাড়ির মাঝ দিয়ে গুলি পাঠাল রানা। হাজার টুকরো হলো জানালা। কিন্তু এসব পাত্তা না দিয়ে ঘাপটি মেরে থাকল লোকটা।

তিনটে সমস্যার কথা মনে এল রানার। প্রথম, দলে এরা ভারী। যে-কোনও সময়ে হামলা করবে দু'দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, বাড়ির ভেতর আটকা পড়েছে এলেনা। পেছনের বাগানে বেরিয়ে গেলে বিপদ কমবে ওর। তৃতীয়ত, এই লোকটা ওকে খুন করতে চাইছে, কিন্তু তার গায়ে টোকাও দিতে পারবে না ও নিজে। গাড়ির ইঞ্জিন আড়াল করে রেখেছে তাকে। আরও বিপদ আছে। অকটেনে ভরা অর্ধেক টাঙ্কি। ওটা মাত্র চোদ্দ ইঞ্চি দূরে। টাঙ্কিতে গুলি ঢুকলে বিস্ফোরণের সঙ্গে আকাশে ছিটিয়ে পড়বে ওর দেহের টুকরোগুলো।

ইসুযু ভ্যানের দিকে তাকাল রানা। কেউ নেই ওখানে। বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে অন্য দু'জন।

একটা বুলেট মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে লেগেছে পেছনের দেয়ালে। এবার সরে যেতে হবে। হাতে-পায়ে ভর করে পেছাতে লাগল রানা। গাড়ির পেছনে এসে সামনে তাক করল পিস্তল। এক এক করে কয়েকটা গুলি পাঠাল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

ছোট একটা বিস্ফোরণ হলো। সিনেমার দৃশ্যের মত ফেটে পড়ল না ইসুযু ভ্যান। ভেঙে দিয়েছে রানা ওটার পেছনের জানালা আর ট্রাঙ্ক। লকলক করা লাল আগুন চাটছে গাড়িটাকে।

ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে গেছে আততায়ী। গাড়ির তলা দিয়ে তার পা দেখল রানা। ঝেড়ে দৌড় দিল লোকটা।

গভীর মনোযোগে গাড়ির তলা দিয়ে গুলি পাঠাল রানা। তৃতীয় গুলি চুরমার করল আততায়ীর ডান গোড়ালি। হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছেঁচে গেল তার নাক-মুখ। ভিতু শেয়ালের মত গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়েছে হুক্কা-হুয়া।

কিচেনের ফ্রস্টেড গ্লাসের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে এলেনা। ওদিকে সাদা আলো। এবার দরজা খুলে তীরের মত বেরিয়ে যাবে বাগানে। তা হলেই ও মুক্ত।

কিন্তু পেছনে বুট পরা ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ!

নিজেদের ভেতর চিৎকার করে কথা বলছে লোকদুটো।

দরজায় কোনও লাল তার আছে কি না চট্ করে দেখল এলেনা। না, নেই। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল পেছনের বাগানে।

ক্ষিপ্র হরিণীর মত বাগানের মাঝে পৌঁছে গেছে, এমন সময় পেছন থেকে ট্যাক্ল্ করা হলো ওকে। পিঠে ভারী ওজন নিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল এলেনা। গা মুচড়ে সরে যেতে চাইল, কিন্তু তখনই ওর গলার পাশে ঠেকিয়ে দেয়া হলো ক্ষুরধার ছোরার ফলা। বরফের মূর্তির মত জমে গেল এলেনা।

হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো বেরেটা নাইন এমএম।

'ওঠ্, শালী!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। নিজে নামল এলেনার পিঠ থেকে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও দু'জন।

তাদের একজন নেতা, সে বলল, 'ওকে বোটে নিয়ে তোল।'

তার নির্দেশ মত এলেনাকে ছেঁচড়ে নিয়ে চলল দু'জন মিলে।

তৃতীয়জন আবার ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর।

পাকা রাস্তায় সাপের মত কিলবিল করছে লোকটা ব্যথায়, এক দৌড়ে তার পাশে পৌঁছল রানা। ভেবেছিল এক ছুটে পৌঁছবে বাড়ির কাছে। কিন্তু এই লোকের এক সঙ্গী গিয়ে ঢুকেছে ওখানে। এদিকে এতক্ষণে বেরিয়ে যাওয়ার কথা এলেনার।

ঘুরে বাড়ি আর চারপাশ ভাল করে দেখল রানা। পুরনো দুই বাড়ির মাঝ দিয়ে সরু এক গলি। ওখানে পৌঁছে গেল রানা। দু'পাশ থেকে বাধা দিল ঝোপের পাতা। পাত্তা না দিয়ে দুই বাড়ির পেছনে হাজির হলো ও। বিজ্ঞানীর বাড়ির পেছন বাগানে দু'লোক, মাঝে বন্দি এলেনা। এক পা সামনে বেড়ে ডানের লোকটার মেরুদণ্ডের দিকে পিস্তলের নল তাক করল রানা।

পরক্ষণে ছিটকে পড়ে গেল নিজেই। কানে তালা লেগে গেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে। আগুনের লেলিহান হলকার মত তপ্ত বাতাস পুড়িয়ে দিতে চাইল ওর মুখ। শরীরের এক পাশে শ্র্যাপনেলের বেগে লেগেছে ভাঙা কাঠের কুচি, কাঁচ ও পোড়া প্লাস্টার।

মাটিতে পড়েই গড়াতে শুরু করেছে রানা। তিন সেকেণ্ড পর বুঝল, পোশাকে আগুন ধরেনি। হাত ও হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল। ঝিমঝিম করছে মাথা। কানের ভেতর ঝিঁঝির ডাক। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, কী হয়েছে।

চারপাশে ভলকে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া। কাঁধের ওপর দিয়ে বিজ্ঞানীর বাড়ি দেখল। বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা। উড়ে গেছে তিন দেয়াল। ধসে পড়ছে ছাত। ওই বাড়ি এখন বহু দিন আগে মরা শামুকের খোলার মতই ফোপরা। ভেতর থেকে উঠে আকাশ চাটছে আগুনের কমলা শিখা। সেই বাতাসের ধাক্কা খেয়ে সরছে কুচকুচে কালো ধোঁয়া। রানার চোখের সামনে ধসে গেল চতুর্থ দেয়াল। এবার হুড়মুড় করে

পড়ে সব ঢেকে দিল ছাত।

পেছনের বাগানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এলেনা ও দুই লোক। ভাল অবস্থায় আছে এলেনা। পেছনে ছিল লোকদুটো, বর্মের মত রক্ষা করেছে ওকে।

উঠে এক দৌড়ে এলেনার কাছে পৌঁছল রানা। একই সময়ে গায়ের ওপর থেকে এক লোককে সরিয়ে উঠে বসল এলেনা। ওই লোক আর কখনও বিপদ তৈরি করবে না। মোটা এক স্টিলের পাইপের মারাত্মক আঘাতে ফুটো হয়েছে পিঠ-বুক।

হতভম্বের মত বার কয়েক মাটিতে পাক খেল অন্য লোকটা। তার হাত থেকে পুরনো একটা রিভলভার কেড়ে নিল রানা। বাধা দেয়ার সাধ্য নেই এই লোকের, ফ্যালফ্যাল করে দেখল রানাকে।

'অথচ তুমি বলো আমিই সবসময় জিনিসপত্র ভাঙচুর করি,' এলেনাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা।

জবাব না দিয়ে একটু দূরে পড়ে থাকা বেরেটা কুড়িয়ে নিয়ে হোলস্টারে রাখল এলেনা।

'ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল রানা।

চারপাশ দেখল এলেনা। এখনও পুরো সচেতন নয়। 'মনে তো হচ্ছে ভুল বই পড়তে গেছে!'

আকাশ থেকে এখনও ঝরছে পোড়া কাগজ ও ছাইয়ের বৃষ্টি। ওই বাড়িতে যে জ্ঞান সংরক্ষিত ছিল, সবই শেষ।

মাথার তালু টিপতে টিপতে মৃত লোকটাকে দেখছে এলেনা। 'আমিও ওর মত হয়ে যেতে পারতাম।' ঘুরে দেখল নদীর দিকে। 'ওরা আমাকে একটা বোটে তুলতে চেয়েছিল।'

ওর হাত ধরে নদী লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগল রানা। পেছনের বেড়ার মাঝে ছোট্ট দরজা, ওটা পেরিয়ে সামান্য যেতেই একটা রাস্তা। পাশেই পাথরের উঁচু দেয়াল। মাঝ দিয়ে উঠেছে সেইন

তীরে যাওয়ার সিঁড়ি।

ধাপ পেরিয়ে ওঠার সময় মোটরবোটের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ পেল ওরা। চট্ করে পরস্পরকে দেখল রানা ও এলেনা, পরক্ষণে দৌড়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

দশ

সিমেন্টের চাতালে উঠে এল ওরা। সামনেই ঝোপঝাপে ভরা জমি ঢালু হয়ে মিশে গেছে নদীর তীরে। কাছের মোটরবোট থেকে এল এক ঝাঁক গুলি। চট্ করে এক ঝোপের আড়াল নিল এলেনা। গুলির গতিপথ থেকে সরে সিঁড়ির পিলারের আড়াল নিয়ে রানা দেখল, শান্ত নদীর বুকে সাদা ঢেউ তুলে ঘুরে গেল মোটরবোট, ক্রমেই তুলছে গতি।

হয়তো দেখছি ডক্টর মোবারকের খুনিকে, ভাবল রানা। চারদিকে তাকাল। নিচে গেছে সিঁড়ি, শেষ পিলারে বেঁধে রেখেছে কেউ পুরনো এক ডিঙি। ওটায় চেপে পিছু নিতে পারবে না।

পিছনের রাস্তা দেখল রানা। কোনও গাড়ি না পেলে অনুসরণ করতে পারবে না ওই বোট।

প্যারিসের বুক চিরে গেছে সেইন, দু'তীরে বেশিরভাগ অংশে সিমেন্টের দেয়াল। হাজার বছর ধরে নগরীর মাঝ দিয়ে গিয়ে দু'পাশের নোংরা বুকে নিয়ে করুণ হাল নদীর। কেউ চাইলে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে পারবে যে-কোনও বোটকে।

বাহন পেতে রাস্তায় নেমে এল রানা।

দ্রুতগামী কোনও গাড়ি... বা...

মাঝারি গতি তুলে আসছে এক মোটরসাইকেল। আরোহীর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল রানা।

ভীষণ ভয় পেয়েছে তরুণ। স্কিড করে থেমে গেল রানার দশ ফুট দূরে।

'তোমার মোটরসাইকেলটা আমার দরকার,' নরম সুরে বলল রানা।

ফ্যাকাসে মুখে রাস্তায় কাত করে মোটরবাইক শুইয়ে দিল তরুণ। পিছিয়ে গিয়ে মাথার ওপর হাত তুলেছে। এখনও চলছে ভারী ইঞ্জিন।

শোল্ডার হোলস্টারে .৩৮ ওয়ালথার রেখে সামনে বেড়ে মোটরসাইকেল সিধে করে নিল রানা, ওটার পিঠে চেপে ছুটল তীরের গতি তুলে। গোঁ-গোঁ আওয়াজ ছাড়ছে লাল ডুকাটি।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আবারও রাস্তায় নামল এলেনা, কল করতে চাইল ফ্রেঞ্চ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু ব্যস্ত ফ্রেঞ্চ ৯১১ লাইন। বুঝল, গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের আওয়াজে অন্তত এক ডজন লোক এখন কল করছে পুলিশে। হয়তো আরও কয়েক মিনিট লাগবে লাইন খালি হতে।

রানাকে খুঁজল এলেনার চোখ। বেশ দূরে এক লোক। মাথায় হেলমেট নেই। বাজপাখির মত উড়ছে মোটরসাইকেলটা।

'যাহ্!' বিড়বিড় করল এলেনা। আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি। মোবাইল ফোন রেখে দিল ও। একটু দূরেই একটা সেডান। জানালা দিয়ে গলা বের করেছে এক লোক। অবাক চোখে দেখছে ধ্বংস-স্তূপের মত বিধ্বস্ত, জ্বলন্ত বাড়িটা।

পরে বিপদে পড়বে বুঝেও সিদ্ধান্ত নিল এলেনা। পরের কথা

পরে। ঠিক রানার মতই পিস্তল বের করে তাক করল লোকটার মাথায়। আরেক হাতে ইশারা করল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ো, বাপু!

ভীষণ ভয়ে বিকট চেহারা করে গাড়ি থেকে নামল মোটা লোকটা। বামহাতে খামচে ধরল জঙ্গলের মত দাড়ি। বুঝে গেছে, এবার মরে যেতে হবে ওকে।

'অ্যাই! সর্ এখান থেকে!' কড়া ধমক দিল এলেনা। 'নইলে কিন্তু গুলি করলাম!'

বিশাল পেট নিয়ে প্রথমে হালকা দৌড় শুরু করলেও বিশ ফুট যেতে না যেতেই হাঁফিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ল ভালুকের মত লোকটা।

দেখার সময় নেই এলেনার, সেডানের ড্রাইভিং সিটে বসেই আটকে নিয়েছে দরজা। পাশের সিটে মোবাইল ফোন আর পিস্তল রেখে রাস্তায় চাকার রাবারের পোড়া দাগ রেখে রওনা হয়ে গেছে। ডানে সেইন নদী। অনেক দূরে রানার মোটরসাইকেল। পেছন থেকে আসছে পুলিশের কর্কশ সাইরেন।

রাস্তার জ্যামের মাঝ দিয়ে ঝোড়ো গতি তুলে এঁকেবেঁকে চলেছে লাল ডুকাটি। এরপর কী করবে এখনও ঠিক করেনি রানা। সেইনের তীর ঘেঁষে গেছে রাস্তা, মাঝে মাঝে বাড়ির বদলে ফাঁকা জমির ওদিকে চোখে পড়ছে নদীটা।

রানার সামনেই ধীর গতি এক ট্রাক। ওটাকে এড়াতে গিয়ে বামে সরল ও, ঢুকে পড়ল পাশাপাশি চলা দুই গাড়ির মাঝের সরু অংশে। ইচ্ছে করলে ড্রাইভারদের কাঁধ স্পর্শ করতে পারবে।

দুই গাড়ি পেছনে ফেলে তুমুল বেগে ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। মোটরবোট খুঁজতে গিয়ে চোখ বোলাল নদীর বুকে।

ওই জলযান প্রায় আধ মাইল দূরে। চ্যানেলের মাঝ দিয়ে প্রচণ্ড গতি তুলেছে। পেছনে দীর্ঘ সাদা ফেনায়িত ঢেউ।

সামনে কী ধরনের সমস্যা, ভাল করেই বুঝছে রানা। ওই বোট অনুসরণ করতে পারবে, কিন্তু কখনোই জেট স্কি হয়ে উঠবে না ডুকাটি। সোজা কথায়, বোটে উঠতে পারবে না ও।

পুলিশে ফোন করে লাভ হবে না। ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নেবে ওর কণ্ঠ। কোনও মতে কথা বললেও পুলিশ ধরে নেবে, ও এক বদ্ধ উন্মাদ লোক। এইমাত্র উড়িয়ে দিয়েছে একটা বাড়ি। অস্ত্রের মুখে হাইজ্যাক করেছে এক তরুণের মোটরসাইকেল। এখন মারাত্মক গতি তুলে পিছু নিয়েছে এক মোটরবোটের। ওই বোট ঠেকাবে না পুলিশ, আগে ধরবে ওকে। ওর পরিচয় পাওয়ার পর কখন বেরোতে দেবে পুলিশ স্টেশন থেকে, তারও ঠিক নেই। তার মানে, হাসতে হাসতে উধাও হবে বোটের লোকটা।

কিন্তু সামনে সুযোগ দেখল রানা। আন্দাজ এক মাইল দূরে নদীর ডানে জড় হয়েছে এক সারিতে বেশ কয়েকটি বার্জ। বাধ্য হয়ে বাম তীর ঘেঁষে যাবে মোটরবোট, আর তখনই সুযোগ পাবে ও।

থ্রটল মুচড়ে ধরতেই ওকে নিয়ে ক্ষিপ্র চিতার মত লাফ দিল লাল ডুকাটি।

জ্যামের মাঝ দিয়ে যতটা পারে দ্রুত চলেছে এলেনা। একই সঙ্গে করতে চাইছে একগাদা কাজ। প্রথম কথা, যোগাযোগ করতে হবে রানার সঙ্গে। দ্বিতীয় কাজ, কাউকে চাপা না দিয়ে চলতে হবে। তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেভাবেই হোক ফ্রেঞ্চ পুলিশের গাড়ির আগে থাকতে হবে।

রিয়ার ভিউ মিররে তাদের গাড়ির নীল বাতি দেখছে

এলেনা। কানের তালা ঝনঝন করছে সাইরেনের আওয়াজে। পা দিয়ে অ্যাক্সেলারেটর চেপে রেখেছে ও। চোখ সামনে।

দূরে দেখল রানাকে। ডুকাটির মত দ্রুত চলবে না সেডান। এঁকেবেঁকে যাওয়াও খুব কঠিন। পলকের মধ্যে আবারও উধাও হয়েছে লাল মোটরসাইকেল। ওদিকে চেয়ে ছিল বলে সে সুযোগে ওর গাড়ির পাশে পৌঁছে গেছে পুলিশের এক গাড়ি। পাশ থেকে সেডানে ধাক্কা দিল ওটা।

সরে গেল এলেনা, গাড়ি নিয়ন্ত্রণে এনে আবারও এগোল। পেছনে পড়ল পুলিশের গাড়ি। লাউড স্পিকারে শুনল, 'রাস্তার পাশে গাড়ি রাখুন! আইন ভাঙছেন আপনি!'

সামনে ডানে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। ব্রেক কষে সরে যেতে শুরু করে পুলিশের গাড়িকে চেপে এল এলেনা। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে গেল পিছনের ড্রাইভার। এ সুযোগে মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরল এলেনা। গতি তুলছে আবারও। ভাল করেই বুঝতে পারছে, এখন যৌক্তিক চিন্তা করে লাভ নেই।

তুফানের মত গতি তুলে আধ মাইল পেরিয়ে গিয়ে দেখল, সামনের রাস্তা বুজে দিয়েছে দুই স্কোয়াড কার।

দুই গাড়ির মাঝ দিয়ে পথ তৈরি করে বেরিয়ে যাব, ভাবল এলেনা। কিন্তু সতর্ক হয়ে গেল লোকগুলো। বাম ঘেঁষে বেরোতে পারবে না ও। কারণ ওদিকে দেয়াল। ডানে দিয়েও নয়। ওদিকে নদী। দুই পুলিশের গাড়ির পাশে থামল তৃতীয় স্কোয়াড কার। পথ রুদ্ধ দেখে ব্রেকের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল এলেনা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

একপাক ঘুরেই পুলিশের গাড়ির পাশে গুঁতো মারল ওর গাড়ির পেছন দিক। এলেনার মুখ-নাক ঠেসে ধরল এয়ার ব্যাগ। এক সেকেণ্ড পর ও বুঝল, একদম থেমে গেছে। এয়ার ব্যাগের একগাদা ধুলো ঢুকেছে ওর নাকে। জোরালো ক'টা হাঁচি দিল

এলেনা। পরক্ষণে দরজা খুলে হ্যাঁচকা টানে রাস্তায় ফেলে দেয়া হলো ওকে, বুকে চেপে বসেছে একটা মোটা হাঁটু।

সাঁই-সাঁই করে রকেটের মত বাতাস কেটে ছুটছে রানা। নদীতে গতি কমিয়ে চলছে মোটরবোট। মনে হলো পিছু নেয়া হয়েছে, তা জানে না ওটার ড্রাইভার। বাম তীরের কাছে সরে গেছে সে। রানা জানে, ওটাই ওর একমাত্র সুযোগ।

ঠিক জায়গায় পৌঁছতে হবে বলে গতি আরও বাড়াল রানা। ওখানে সামান্য একটা ফাঁক, তারপর আবার শুরু হয়েছে পাথুরে রেলিং। রাস্তা থেকে নেমে ঘাস মাড়িয়ে ছুটল ডুকাটি। আরেকবার ঠিক জায়গাটা দেখল রানা, তারপর শক্ত হাতে ধরল হ্যাণ্ডেল। আরও মুচড়ে ধরেছে থ্রটল।

পঞ্চাশ মাইল বেগে রেলিঙের মাঝের ফাঁকা অংশ পেরিয়ে আকাশ পথে বোট লক্ষ্য করে চলেছে রানা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর নামতে লাগল ভারী ডুকাটি। হাত-পা সরিয়ে ডানে ঝাঁপ দিল রানা, পেছনে শুনল কিছু ভেঙে যাওয়ার জোর আওয়াজ আর তারপরই বিশাল এক ঝপ্পাস্!

বোটের পেছনের পানিতে পড়ে ডুবে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠে দেখল, চার শ' পাউণ্ডের ডুকাটির ওজন হজম করতে না পেরে ফাটল ধরেছে ফাইবার গ্লাসের বোটের পেছন দিক। একটু পর টুপ করে তলিয়ে যাবে নৌযান।

সাঁতরে ওটার পাশে পৌঁছল রানা। বোটে দু'জন লোক। তাদের একজন আহত। সম্ভবত অচেতন। অন্যজন উঠে দাঁড়াল। রানাকে দেখেই পিস্তল তুলে গুলি করল।

ভারী পাথরের মত তলিয়ে গেল রানা। ওর চারপাশে সাদা রেখা তৈরি করে ছুটছে বুলেট। সরে যেতে লাগল ও। গুলি থেমে যাওয়ার পর খুব সাবধানে আবারও ভেসে উঠল। ডুবি-

ডুবি করছে বোট। পিস্তল হাতে লোকটা কোথাও নেই। হয় লুকিয়ে পড়েছে, নয়তো নিজেই নেমেছে নদীতে।

খুব সাবধানে বোটের পেছনে গেল রানা। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে ওয়ালথার। স্টার্নের কাছ থেকে উঁকি দিল বোটের ভেতরে।

কাত হলো বোট। ভেতরের সিট কুশন, লাইফ জ্যাকেট ও খালি কয়েকটা প্লাস্টিকের বোতল ভেসে গেল নদীর অলস স্রোতে। পিস্তলধারীকে কোথাও দেখা গেল না।

বোট নিমজ্জিত হওয়ার আগেই আহত লোকটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে তীরের দিকে চলল রানা। ভেবেছিল, তলিয়ে যাবে বোট, কিন্তু নাক তুলে রাখল কিলের এক অংশ।

আশপাশে নেই পিস্তলওয়ালা।

এগারো

নিজ অফিসে মস্তবড় ডেস্কের পেছনে বসে আছেন ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট বা এনআরআই-এর চিফ জেমস ব্রায়ান। দু'পাশে স্তূপ করেছে একগাদা ফাইল। তারই ভেতর কষ্টেসৃষ্টে জায়গা করে নিয়েছে অত্যাধুনিক অ্যাপেল ম্যাকিনটশ পিসি, ছোট এক প্রিন্টার ও স্ক্যানার। ভিডিয়ো কনফারেন্স করতে স্ট্যাণ্ডবাই মোডে আছে মনিটর। ভেন্যু: ভার্জিনিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স।

ডেস্কের ওদিকে উপস্থিত এনআরআই-এর অন্যতম

ব্রিলিয়ান্ট বিজ্ঞানী লাউ আন। জেনেটিসিস্ট হিসেবে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। ডক্টরেটও ওখান থেকেই। ল্যাবে ব্যস্ত না থাকলে প্রায় সবসময় ব্যয় করে কমপিউটার গেম্‌স্‌ খেলে। এ মুহূর্তে মনে মনে তারিফ করছে বসের। নতুন করে এনআরআই অফিস সাজিয়ে নিয়েছেন ব্রায়ান। এতই নিখুঁত নিরাপত্তার ব্যবস্থা, এখানে হামলা করার সাধ্য হবে না জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের।

'ইউএন ভাইরাসের ব্যাপারে নতুন কিছু জানলে?' বললেন ব্রায়ান।

গলা পরিষ্কার করে নোটবুকে চোখ নামাল লাউ আন।

গত তিন দিন আগে ভোরে যাঁরা ঢুকেছিলেন ইউএন অফিসে, তাঁদের সবাইকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। তারপর থেকে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছেন সেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। কপাল ভাল, দুনিয়ার নানান দেশের অফিশিয়াল বা কর্মচারীরা তখনও অফিসেই পা রাখেননি। আগে থেকেই তাঁদেরকে ফোনে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল: আপাতত ইউএন ভবনে আসা চলবে না। যে যাঁর মত ছুটি কাটাচ্ছেন তাঁরা।

'সরি, নতুন কোনও তথ্য নেই,' বলল লাউ আন।

'তার মানে ভাল খবর নেই?' ভুরু কুঁচকে ফেললেন ব্রায়ান।

'একেবারেই নেই তা বলব না,' বলল চিনা-আমেরিকান যুবক, 'ওই ভাইরাসের স্যাম্পল পরীক্ষা করেছে সিডিসি। তাদের ডেটাবেসে ওই ধরনের কিছুই নেই।'

'তার মানে নতুন ভাইরাস?'

মাথা দোলাল লাউ আন।

'আসলে কি এটা ভাল খবর?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রায়ান।

'ওটার প্যাথোজেন তীব্র ধরনের,' বলল আন।

চোখ সরু করে তার চোখে তাকিয়ে আছেন ব্রায়ান।

'ভাইরাসের ক্ষেত্রে তিনটে জিনিস দেখি আমরা,' বলল আন। 'কতটা দ্রুত সেলকে ইনফেক্ট করছে প্যাথোজেন, বা কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, বা কোন্ পথে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওটাকে আমরা বলি ভেকটর্স। আর তৃতীয় বিষয়, ইনফেক্টেড সেলের কী ধরনের ক্ষতি করছে।'

'বুঝলাম,' বললেন ব্রায়ান। 'তো এই লড়াইয়ে জিতে যাচ্ছি আমরা?'

'তা বলা যায়। কিন্তু খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস। হামলা করে সারাদেহের সেল-এ। পরীক্ষায় দেখেছি, রওনা হয় সব পথেই।'

'সহজ করে বলো।'

'সাধারণত নির্দিষ্ট সেল-এ হামলা করে নির্দিষ্ট সব ভাইরাস,' বলল আন, 'রেসপিরেটরি ভাইরাস হামলা করবে ফুসফুসকে। হার্পিয ভাইরাস হামলা করবে ত্বকের কোষগুলোকে। কিন্তু ইউএন ভাইরাস নানান দিকে আক্রমণ করে। ওই অণু শুধু যে দেহের এক ধরনের কোষের ওপর হামলা করবে তা নয়, যে কারও দেহের প্রায় সব কোষকে আক্রান্ত করবে। এটা খুব কম দেখা যায়।'

'ডেবি ম্যাকেঞ্জির ক্ষেত্রে এমন হয়েছে?' জানতে চাইলেন এনআরআই চিফ।

মাথা দোলাল লাউ আন। 'তাঁর দেহের নানান অঙ্গে আক্রমণ করেছে। ভাইরাস বাদ দেয়নি ব্রংকিয়াল সেল, মাসল সেল, লিভার, কিডনি আর লিমফ্যাটিক সেল। আসলে পুরো দেহেই পাওয়া গেছে ইনফেকশনের ট্রেস।'

বিরক্ত হয়ে বড় করে দম নিলেন ব্রায়ান। 'বাপু, তুমি তো মহিলার ইনশ্যুরেন্সের বেনিফিশিয়ারি নও, মহিলা মরে গিয়ে যে তোমাকে বড়লোক করে দেবেন, তা-ও নয়। তা হলে কোন্

আক্কেলে তোমার মনে হচ্ছে এসব ভাল সংবাদ?'

'না, ইয়ে, চিফ, আসলে আমরা অন্যভাবে ভাবছি। নানান দিক দিয়ে তাঁর দেহকে আক্রান্ত করেছে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন ব্রায়ান, 'কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে?'

মন খারাপ করে জবাব দিল লাউ আন, 'পরীক্ষায় দেখলাম, ওই জিনিস অ্যারোসলের মত ছিটিয়ে পড়ে। সর্দির ভাইরাসের মত। মশা, ছারপোকার কারণে ছড়িয়ে পড়বে। বা ম্যালেরিয়া, পশ্চিম-নাইল ভাইরাসের মত। পাখির মাধ্যমে বা HINI বা SARS...' বসের গম্ভীর চেহারা দেখে চুপ হয়ে গেল এজেন্ট।

'কীভাবে ওই মহিলার দেহে ঢুকল?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

'ওই এনভেলপে পাতলা প্লাস্টিকের আবরণ ছিল,' বলল লাউ, 'ভেতরে ছিল ফাঁকা জায়গা। এনভেলপ খুলতেই... তা ছাড়া, বিশেষ কাগজও ব্যবহার করেছে। ওটা পরিবর্তিত হয় অক্সিজেন, তাপ বা আঙুলের স্পর্শে। আর তাপ পেলেই লাল হয়ে ওঠে ওই কাগজ। ওখানেই জেল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল ভাইরাস। কাজটা করেছে অ্যারোসলের মাধ্যমে। চিঠি পড়তে পড়তে নাক দিয়ে ভাইরাস টেনে নিয়েছেন তিনি।'

'লাল রং হওয়ার ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান। 'চিঠিতে মেখে গিয়েছিল ডেবি ম্যাকেঞ্জির রক্ত?'

'সস্তা কৌশল,' বলল আন, 'ত্বকের গরমের কারণে অমন হয়েছে। কাগজে মাখা ছিল অদৃশ্য কালির মত ওই জিনিস।'

'নাটকীয়তার জন্যে,' বললেন ব্রায়ান। তাঁর মনে পড়ল, ওই ঘটনার দায় নেয়নি কোনও সংগঠন। বিষয়টা রহস্যময়।

'নানান কারণে সিডিসি থেকে ওই ভাইরাসকে জাদুর ভাইরাস বলা হচ্ছে,' বলল আন।

'নাম তো দেয়া হলো, এখন অপেক্ষা করছি ভাল খবরটা কী জানার জন্যে,' বিরস সুরে বললেন ব্রায়ান।

'ওটাই তো ইন্টারেস্টিং দিক,' হাসল আন। 'খুব সংক্রামক, কিন্তু সামান্য জ্বর আর ভয়ানক মাথাব্যথা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি করবে না। কয়েক দিনের ভেতর সুস্থ হয়ে যাবেন ডেবি ম্যাকেঞ্জি। অদ্ভুত ভাইরাস। সহজেই কোষের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে, যা খুশি করতে পারে, কিন্তু করবে না কিছুই। জাদু আর কাকে বলে!'

সিটে নড়ে বসলেন ব্রায়ান। ভাবছেন: সত্যি, অবাক কাণ্ড! 'এসব থেকে কী বুঝব, লাউ?'

'কোষ দখল করলে নিজ ডিএনএ ইনজেক্ট করে বেশিরভাগ ভাইরাস, তৈরি করে নিজের মত কোটি কোটি ভাইরাস। কাজটা হয়ে গেলেই ওরা কোষ ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে মৃত্যু হয় ওই কোষের। এভাবেই সারাদেহে মরতে থাকে কোষ। শরীরের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে রোগ। ইউএন ভাইরাসও কোষের ভেতর ঢুকে ওটাকে বাধ্য করেছে নিজের মতই ভাইরাস তৈরি করতে। কিন্তু কেন যেন ক্ষতি করে না কোষের। কোষ ঠিকই রয়ে যায়, পরে ভাইরাসের ডিএনএর সামান্য অবশিষ্ট অংশ ছাড়া কিছুই থাকে না। যেমন ছিল তেমনই ভাল থাকে কোষ।'

'অবশিষ্ট?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইলেন ব্রায়ান। 'কী ধরনের অবশিষ্ট? পরে আর কোনও ক্ষতি করবে না তো?'

'আমরা এখনও ওটা স্টাডি করছি,' বলল আন। 'মৃদু জ্বর বাধিয়ে দেয়া আর রাক্ষুসী মাথাব্যথা তৈরি করা ছাড়া এখন পর্যন্ত কিছুই করেনি।'

ভুরু কুঁচকে জাদুর ভাইরাসের কথা ভাবছেন ব্রায়ান। অবাক লাগছে তাঁর। কী কারণে ওই জিনিস তৈরি করেছিল ডক্টর মোবারক? দেহে ওই ভাইরাসের অবশিষ্ট ডিএনএ রেখে তার কী

লাভ? কোষের ভেতর তৈরি করেছে একটা জায়গা। কিন্তু কেন?

'আপাতত আমাদের কপাল ভাল, কিন্তু পরে ভাগ্য এত ভাল না-ও থাকতে পারে,' বললেন ব্রায়ান, 'আরও ভাল করে স্টাডি করো। সিডিসিকে বলো মূল ভাইরাস নিয়ে কাজ করুক। মানুষের স্পর্শে যেন না আসে ওটা। তুমি নিজে দেখবে ডিএনএর কোডিং। খুঁজে বের করবে এসবের মানেটা কী।'

উঠে দাঁড়াল আন। 'আর কোয়ারেন্টাইন করা মানুষগুলোর কী হবে, চিফ?'

মাথা নিচু করে নিজ নোট দেখছেন ব্রায়ান। চোখ না তুলেই বললেন, 'ওদের আবার কী?'

'অ্যাম্বাসেডর ডেবি ম্যাকেঞ্জি আর অন্যদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইছে সিডিসি।'

ঝট্ করে মুখ তুললেন ব্রায়ান। 'পাগল নাকি! কী নিয়ে বাড়ি ফিরবে তার ঠিক আছে? ওরা কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। কেউ বেরিয়ে যেতে চাইলে দরকার হলে গুলি করে থামাবে তুমি। কথা বুঝতে পেরেছ?'

'স্যর, আমাকে তো অফিস থেকে আগ্নেয়াস্ত্রই দেয়া হয়নি।'

'জোগাড় করে নাও একটা।'

অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেল লাউ আন।

'মন দিয়ে শোনো, বেশ কিছু কারণে আমরা এসবের ভেতর জড়িয়ে গেছি,' বললেন ব্রায়ান। 'সেসব তোমাকে বা সিডিসিকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। কিন্তু একটা কথা মাথায় গেঁথে নাও, আগে এনআরআই-এ কাজ করত ডেবি ম্যাকেঞ্জি। তখন আমাদের এজেন্ট ছিল। এটা সামান্য কাকতালীয় ঘটনা না-ও হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে, সরাসরি আমার কাছে এসেছে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার: রহস্যময় ওই ভাইরাস মস্ত কোনও সর্বনাশ করবে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাজেই

কোয়ারেন্টাইন থেকে কাউকে বেরোতে দেয়া যাবে না। কেউ না! কথাটা বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল লাউ আন। গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ। দেয়া হয়েছে জরুরি কাজ। এখন বুঝতে পারছে এসবের গুরুত্ব।

'দুঃখিত, আগেই বলা উচিত ছিল, কতটা চিন্তিত প্রেসিডেন্ট,' বললেন ব্রায়ান।

'বুঝেছি,' বলল লাউ আন।

'ঠিক আছে, দেরি না করে মাটি খুঁড়তে শুরু করো। হয়তো এর ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছুই।'

মাথা দুলিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল লাউ আন।

বড় করে দম নিলেন ব্রায়ান। আর তখনই বেজে উঠল তাঁর ইন্টারকম। বাটন টিপে দিতেই এল সেক্রেটারি মিসেস উডরোর কণ্ঠ: 'স্যর, এক মিনিট দিতে পারবেন?'

'এক মিনিট কেন, দশ মিনিট দিতে পারব,' বললেন ব্রায়ান।

এনআরআই-এর প্রায় কেউ জানে না, অত্যন্ত জরুরি এক মিশনে গেছে এলেনা রবার্টসন। সাহায্য নিয়েছে বিসিআইরত্ন মাসুদ রানার। এ খবর জানেন শুধু ব্রায়ান ও তাঁর সেক্রেটারি মিসেস উডরো। দু'দেশের দুই এজেন্টের বিষয়ে খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব ছিল বিধবা মহিলার ওপর। খুক-খুক করে কেশে নিয়ে বলল মিসেস উডরো, 'এলেনা রবার্টসন আর মাসুদ রানার ব্যাপারে আলাপ করতে চাই, স্যর।'

'কী হয়েছে ওদের?' চিন্তিত হয়ে গেলেন ব্রায়ান।

'ওদের জন্যে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে আপনাকে, স্যর।'

'মিসেস উডরো, আমি এমনিতেই ব্যস্ত।'

'ফ্রেঞ্চ পুলিশের ব্যাণ্ডে কিছু কথা শুনেছি আমরা, স্যর,' বলল মিসেস উডরো। 'এলেনা আর মাসুদ রানা মিলে নাকি

প্যারিসের বুকে উড়িয়ে দিয়েছে এক বাড়ি। গোলাগুলিও করেছে। ওদের কাছ থেকে পুলিশ জেনেছে, এলেনা আমেরিকান নাগরিক। আর মাসুদ রানা বাংলাদেশি। আপাতত ওদের দু'জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।'

নাক-মুখ কুঁচকে বিড়বিড় করে বললেন জেমস ব্রায়ান, 'মাই গড! এসব কী করছে ওরা!'

বারো

পরিত্যক্ত এক বাড়ির পেছনের এক ঘরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে জুবায়ের। নির্দেশ মত কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আনতে পারেনি বিজ্ঞানীর স্যাম্পল বা ডকুমেণ্ট। কোনও মতে পালিয়ে এসেছে জান হাতে নিয়ে।

পচা আবর্জনার ভেতর অন্ধকারে শিউরে উঠল জুবায়ের। সেইন নদী থেকে ওঠার কিছুক্ষণ পর শুকিয়ে গেছে ভেজা পোশাক, কিন্তু মনের শক দূর হতে সময় লাগবে।

সবই তো হারিয়ে বসেছে। বন্ধুরাও মরে গেল। এবার ঠিকই ওকে খুঁজে বের করবে পুলিশ। জীবনের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সব আশাই শেষ। সংগঠনের প্রভু শাস্তি দেবে ওকে। সম্ভবত খুন করে ফেলা হবে।

প্যান্টের পকেট থেকে লাইটার বের করে আগুন জ্বালল।

বাতি দেখে কিঁচকিঁচ শব্দ তুলে নোংরা দেয়ালের গর্তে লুকিয়ে পড়ল কয়েকটা ইঁদুর।

আগুনের কমলা আলোয় চারপাশ দেখল জুবায়ের। মেঝেতে চাপ চাপ ময়লা ও প্রস্রাবের কটু গন্ধ। ভারী লাগছে বামহাতে রাখা পিস্তল। প্রথম যখন ওই অস্ত্র দিল মার্ডক, তখন কত হালকা মনে হয়েছিল। তখনও কাউকে খুন করেনি। রক্ত লাগেনি হাতে। এখন জীবনটাও খুব ওজনদার লাগছে।

পিস্তলটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল জুবায়ের। ওর মনে আছে কোন্ নম্বরে ফোন করতে হবে। মোবাইল ফোন বের করে নম্বর টিপল। কয়েক সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে সাড়া দিল মার্ডক। তার প্রশ্নের জবাবে নিচু স্বরে বলল জুবায়ের, 'আমি ব্যর্থ।'

স্পিকারে খুব শান্ত স্বরে বলল মার্ডক, 'তুমি কোথায় আছ, জুবায়ের?'

'আবারও ফিরেছি লে কুখনেইভ-এ, পুলিশ খুঁজছে আমাকে।'

'হ্যাঁ, খুঁজবে,' বলল মার্ডক। ক' সেকেণ্ড কী যেন ভেবে নিল। 'কিন্তু ওদের আগেই তোমার কাছে পৌঁছব আমি।'

কথাটা শুনে বুক কেঁপে গেল জুবায়েরের। বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'আপনি কি আমাকে খুন করবেন?'

কর্কশ হাসল মার্ডক। অন্ধকার ঘরে প্রতিধ্বনিত হলো ওই আওয়াজ। ভীষণ ভয় লাগল জুবায়েরের। একবার মনটা চাইল রেখে দেবে ফোন। দৌড়ে পালিয়ে যাবে দূরে কোথাও। কিন্তু যাবে কোথায়? শীতল মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটা দেখে ভাবল, দেব নাকি সব শেষ করে? তা হলে আর অসহ্য নির্যাতন করে খুন করতে পারবে না মার্ডক।

'যতটা ভেবেছি, তার চেয়ে ভাল করেছ,' বলল মার্ডক। 'তোমার কাজে খুশি প্রভু। মামবা, আমরা তোমাকে ফেলে চলে যাচ্ছি না।'

ক্ষণিকের জন্যে আতঙ্ক কমল জুবায়েরের। চুপ করে আছে

অন্ধকারে। একটু আগে ভাবছিল, কীভাবে শেষ করবে নিজের জীবন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। হ্যাঁ, মাফ করে দিয়েছেন প্রভু। খুন করবে না মার্ডক। মামবা আর একা নয়। বিষাক্ত সাপকে সরিয়ে নেয়া হবে নিরাপদ কোথাও।

'যেখানে আছ, ওখানেই থাকো,' বলল মার্ডক, 'একটু পর তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব।'

তেরো

'ভয়ে বুক কাঁপছিল, এত ওপর থেকে নদীতে পড়ে মরেই গেছ বুঝি,' রানাকে বলল এলেনা।

'আমি যমের অরুচি,' হাসল রানা।

'কিন্তু গেলে কেন ওদের পেছনে?'

'তার আগে বলো, তুমি পিছু নিলে কেন?'

'ভাবলাম তোমার না খারাপ কিছু... তাই...' কাঁধ ঝাঁকাল এলেনা। 'আমাদের আসলে দূর থেকে বোট দেখলেই চলত। পুলিশকে জানিয়ে দিলে ওরাই সব করত।'

'ওরা ততক্ষণে পালিয়ে যেত,' বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা দোলাল এলেনা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। তার আগে গ্রেফতার করে একঘণ্টা রেখেছিল প্রস্রাবের দুর্গন্ধ ভরা অন্ধকার এক সেলে। তারপর হাজির হলেন পুলিশের এক বড়কর্তা। নতুন করে রানা ও এলেনার পরিচয়

জেনে ফিরে গেলেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছে, ওদের কথা মোটেও বিশ্বাস করেননি তিনি।

পেরিয়ে গেল বিশ মিনিট। আবারও ফিরলেন ভদ্রলোক। নতুন করে আবারও জ্বেলে দেয়া হলো সেলের বাতি। রানা ও এলেনা দেখল, সাদা মুলোর চওড়া দোকান খুলেছেন পুলিশের বড়কর্তা।

'সরি, মিস্টার রানা, সরি, মিস রবার্টসন,' দুঃখিত কণ্ঠে বললেন। 'একটু দেরি হলো আপনাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে।'

'নিশ্চিত ছিলাম যে আমি আসলে আমিই আছি,' বলল বিরক্ত রানা।

'কিন্তু আমরা তো আর জানতাম না,' হাসলেন ভদ্রলোক। 'যাক সেসব, প্রথমে যোগাযোগ করেছি ইন্টারপোলে। তারপর এনআরআই-এ। অবশ্য, মিস্টার রানা, আপনার ব্যাপারে আরও আগেই নিশ্চিত হয়েছি আমার বস্ মোসিউ আঁদ্রে মার্কসের কাছ থেকে। উনি আপনার অধীনে ইউএন-এর অ্যান্টি টেরোরিস্ট ইউনিটে কাজ করেছেন। বললেন, অন্তত তিনবার তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি নানান মিশনে। উনি দেশের বাইরে আছেন, নইলে এতক্ষণে নিজেই হাজির হতেন। ইন্টারপোল থেকেও নিয়েছি তথ্য। আর মিস রবার্টসনকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ এসেছে আমেরিকান এনআরআই থেকে। পুরনো কোনও বাজে রেকর্ড নেই তাঁর। তার ওপর আমাদের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে: পুলিশের গাড়ির ক্ষতি করা, এক লোকের ভাড়া-দেয়া বোট ডুবিয়ে দেয়া, একজনের গাড়ি ও এক তরুণের মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও নষ্ট হওয়া... সবকিছুর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবে এনআরআই। কাজেই আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও অভিযোগ তুলছি না।'

'আমরা তা হলে চলে যেতে পারি?' জানতে চাইল রানা।

'পারেন,' মাথা দোলালেন পুলিশ অফিসার। 'কিন্তু তার আগে একটা অনুরোধ করব।'

'কী ধরনের অনুরোধ?' জানতে চাইল রানা।

ফ্রেঞ্চ পুলিশ অফিসার পকেট থেকে ছোট এক নোটবই নিয়ে নির্দিষ্ট পাতা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'এই নোটবই আমার ছেলের। ওর বয়স আট। মা-র কাছ থেকে বাবার ঝুঁকিপূর্ণ সব কাজের কথা শুনে নোটবইয়ে সংক্ষেপে লিখে রাখে। আজই আমার কাছে এটা দিয়ে বলেছে, "বাবা, তোমার মত যাঁরা দুর্দান্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের অটোগ্রাফ এনে দেবে। আর যদি পারো, ছবিও।" কপাল কাকে বলে ছেলের! আজই পেয়ে গেলাম আপনাকে। খুব খুশি হব আমার ছেলের জন্যে অটোগ্রাফ দিলে। ওকে শোনাব, কীভাবে বহু ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ভয়ঙ্কর এক অপরাধীকে তুলে এনেছেন আপনি। আমার ছেলের ইচ্ছে, এক দিন ওর বাবার মত পুলিশ অফিসার হবে। প্লিয, মিস্টার রানা!'

নোটবই নিয়ে অটোগ্রাফ দিল রানা। ছোট্ট খাতাটা ফেরত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আহত লোকটা মুখ খুলল?'

'এখনও অজ্ঞান। তবে চেতনা ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করব।'

'সায়েন্টিস্ট আহসান মোবারক সম্পর্কে নতুন কিছু জানলেন আপনারা?' জানতে চাইল রানা।

'আসুন, আমার অফিসে বসে আলাপ করি,' বললেন মোসিউ শোঁপা।

তাঁর সঙ্গে সেল থেকে বেরোল ওরা। প্রশস্ত এক অফিসঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন ভদ্রলোক। সবাই বসার পর ডান দিকের ড্রয়ার থেকে বের করলেন এক ফোল্ডার, খুলে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'যা আছে, এখানেই।'

মাত্র তিন মিনিটে সব তথ্য পড়া হয়ে গেল রানার।

ওর পাশেই এলেনা, প্রথম ছবি দেখেই ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

নির্বিকার চোখে বিজ্ঞানী মোবারকের উলঙ্গ, রক্তাক্ত, মৃতদেহ দেখছে রানা। মানুষটার হাত-পা বাঁধা। প্রচণ্ড নির্যাতন করেছে। চাক চাক রক্ত ত্বকে। ব্লো-টর্চের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে বুক ও পেটের মাংস।

চুপ করে আছে রানা। ফোল্ডার ফেরত দিল।

'যে খুন করেছে, সে লাশ ফেলে যেতে পারত যে-কোনও জায়গায়, কিন্তু ইচ্ছে করেই এভাবে রেখে গেছে,' বললেন শোঁপা।

'একটা বার্তা দিয়েছে,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন পুলিশের বড়কর্তা।

'এই বার্তা কার জন্যে?' জানতে চাইল এলেনা।

'পুরো পৃথিবীর জন্যে,' বললেন শোঁপা, 'বুকে দেখেছেন পোড়া চিহ্ন? প্রায় দেখাই যায় না।' আরেকটা ছবি নিয়ে রানার সামনে রাখলেন তিনি। এবারের ছবি ক্লোয-আপ। যেন গরুর মত করে ব্র্যাণ্ড করা হয়েছে মানুষটাকে। 'জি, ই, এন, টু, ওয়ান ও সেভেন।'

'এরা এগুলো দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে, জানেন আপনারা?' ছবি দেখছে রানা।

'জেনেছি। এসব তুলে দেয়া হয়েছে জেনেসিসের চ্যাপ্টার টু, ভার্স সেভেনটিন থেকে।'

আবারও অক্ষর ও নম্বর দেখল রানা। ওর কোনও কারণ নেই জেনেসিসের ভার্স মুখস্থ করার। কিন্তু ক্যাথোলিক পরিবারের মেয়ে এলেনার মনে পড়তে দেরি হলো না। নিচু স্বরে বলল ও, '"And ye shall not eat from the tree of

knowledge of good and evil. For when you eat of it you shall certainly die."'

ভীষণ চমকে গেছে এলেনা। রানাও চিন্তিত।

কর্মজীবনে নানান প্রাণীর জীবন নিয়ে কাজ করেছেন জেনেটিসিস্ট আহসান মোবারক, ভালর জন্যে চেয়েছিলেন নানানভাবে জিন বদলে দিতে। কিন্তু বাইবেলে পরিষ্কার করে স্রষ্টা বলেছেন: পৃথিবীর সমস্ত জীব বা তাদের জীবনের বিষয়ে সবকিছু গোপন করেছেন স্বয়ং তিনি।

মোবারকের বুকে যে বার্তা পুড়িয়ে লেখা হয়েছে, সেটা কি শুধু সতর্ক করে দেয়ার জন্যে? জঙ্গি কোনও দল কাজটা করেছে? তারা চায় না জিন নিয়ে গবেষণা হোক?

'আমাদের ধারণা, এসব করেছে গোপন কোনও কাল্ট,' জোর দিয়ে বললেন শোঁপা। 'চার পুলিশকে খুন করার পর সায়েন্টিস্ট মোবারককে খুন করেছে এরাই। ...আপনারা যদি এদের বিরুদ্ধে কিছু করেন, আমরা খুবই খুশি হব। দয়া করে যোগাযোগ রাখবেন। আমরাও তা-ই করব। কিছু জানলে উভয়পক্ষই উপকৃত হবে।'

'বেশ,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা।

'এবার সোজা ভাল কোনও হোটেলে,' চেয়ার ছাড়ল এলেনা।

আপত্তি তুলল না রানা।

ওদের সম্মানে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছেন পুলিশ অফিসার শোঁপা। 'গুড লাক, মিস্টার রানা, মিস রবার্টসন।'

'আপনিও ভাল থাকুন।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। বিকেল হয়ে গেছে, রাস্তার জ্যামে খালি কোনও ট্যাক্সি নেই। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও এলেনা।

এইমাত্র একটু দূরে থামল একটা ট্যাক্সি। হাত তুলে ওটাকে ডাকল রানা। গাড়িটা পাশে থামতেই চেপে বসল ওরা দু'জন।

'ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল,' ড্রাইভারকে বলল এলেনা।

চোদ্দ

নিস-এর অত্যন্ত ব্যস্ত বাণিজ্য এলাকায় মুর ফার্মাসিউটিকালের আকাশছোঁয়া বিশাল ভবন। আটত্রিশ তলায় নিজ অফিসে পা রাখলেন আর্নল্ড মুর ফিফ্থ্। আমেরিকান তিনি, কিন্তু নিজেকে মনে করেন বিশ্ব নাগরিক। ঊনত্রিশ বছর বয়সে আশি বছরের বাবার কাছ থেকে বুঝে নিয়েছিলেন ব্যবসা। তারপর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে প্রায় ঘুমন্ত ড্রাগ্স্ ডিসট্রিবিউশন কোম্পানিকে পাল্টে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক সংগঠনে। চারটে দুর্দান্ত ওষুধের গুণে বড়, এবং নামকরা কয়েকটি ফার্মাসিউটিকালের একটি হয়ে উঠেছে মুর ফার্মাসিউটিকাল কর্পোরেশন। প্রতি বছর প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার আয় করছে এমপিসি। এক্সচেঞ্জ রেট অনুযায়ী এ বছর কমবেশি মুনাফার পরিমাণ হবে দু' শ' মিলিয়ন।

অস্বাভাবিক বিত্তবান বলেই আন্তর্জাতিক প্লেবয় হয়ে উঠেছেন আর্নল্ড। মায়ামি ও মোনাকোর জেটিতে সবসময় দুটো বিলাসবহুল ইয়ট থাকে তাঁর জন্যে। কয়েক বছর আগে কিনে নিয়েছেন পুরনো এক ছোট দুর্গ, ওটাকে বদলে নিয়েছেন তিরিশ হাজার স্কয়্যার ফুটের অপূর্ব সুন্দর এক বাড়িতে। ওখানেই ক'দিন পর পর পার্টি দেন তিনি। সেসব পার্টিতে যোগ দেন

সুপারমডেল, মুভি স্টার, ফরমুলা ওয়ান ড্রাইভার, ফুটবল ও টেনিস তারকারা। কিছু দিন হলো তাঁর মগজে ঘুণপোকার মত কিরকির শব্দ তুলছে একটা বিষয়: আসলে তাঁর কোনও রাজকীয় পদবী নেই! আর তাই ভাবছেন, কোনও দেশের রাজা বা রানির কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনে নেবেন ডিউক, প্রিন্স বা কাউন্ট উপাধি।

টাকার অভাব নেই, কিন্তু তাঁর জীবন থেকে দূর হয়নি বড় ধরনের একটা সমস্যা। তাঁর কোম্পানির শতকরা ৯৫% মুনাফা আসছে চারটে ব্লকব্লাস্টার ড্রাগের বিক্রি থেকে। কিন্তু আগামী বছর ওগুলোর ভেতর তিনটে আইন অনুযায়ী জেনেরিক হবে। তখন অন্য কোম্পানি একই জিনিস তৈরি করবে। তাঁকে নির্দিষ্ট পরিমাণের মুনাফা দিলেও তা আর কতই বা! তার দু'এক বছর পরে চতুর্থটাও হাত ছাড়া হবে। বুজে আসবে এমপিসি। অর্ধেক হয়ে যাবে মুনাফা। তখন বাধ্য হয়েই হাজার হাজার কর্মচারীর ঘাড়ে নামাতে হবে খাঁড়া। সব বিষয়ে কমিয়ে আনতে হবে ব্যয়। বিশেষ করে হোঁচট খাবে অত্যন্ত দামি সব রিসার্চ প্রোগ্রাম ও ডেভেলপমেণ্ট বাজেট। ফলে ভবিষ্যতে শূন্যের কোঠায় নামতে পারে মুনাফা। এক কথায় সর্বনাশ হবে মুর ফার্মাসিউটিকালের। এসব ভাবতে গেলে ঘাম ছুটে যায় মিস্টার মুরের টাকমাথায়।

নানানভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নতুন কোনও দামি ওষুধ আবিষ্কার করাতে পারেননি। এদিকে রিসার্চ ও ডেভেলপমেণ্ট বাজেট কমিয়ে দিলেই শুকিয়ে মরবে এত বড় কর্পোরেশন।

এসব এক ধরনের সমস্যা, অন্যান্য ঝামেলারও শেষ নেই। সুইচ টিপে বিশাল অফিসের বাতি জ্বেলে নিলেন মুর। নিজের সিটে বসার তিন সেকেণ্ড পর বুঝলেন, তাঁর দ্বিতীয় বড় সমস্যা হাজির হয়েছে সামনে।

'হ্যালো, মুর,' বলল নিষ্ঠুর একটা কণ্ঠ।

ছোট্ট কিচেনেট ও ওয়েট বার-এর পাশে আরামদায়ক এক কাউচে বসে আছে লোকটা। শেভ করা মাথা। অর্ধেক ঘাড় পেঁচিয়ে আছে গাঢ় রঙের আয়তাকার এক উলকি। দেখলে মনে হবে ওটা কোনও কলার।

মনটা দমে গেল মিস্টার মুরের। ওই কণ্ঠ, ওই উলকি আর লোকটার নোংরা দৃষ্টি তাঁর ভাল করেই চেনা।

'তুমি এখানে কী করছ?' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বললেন তিনি।

'নতুন খবর দিতে এলাম,' বলল লোকটা।

চট্ করে দরজা দেখলেন মুর। বুঝে গেলেন, তাঁর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে লোকটা।

'চেষ্টা করে লাভ নেই,' সতর্ক করার সুরে বলল ভারী কণ্ঠের লোকটা। হুমকি আছে বলার ভঙ্গিতে। 'যা বলব, সেটা তোমার জেনে নেয়া উচিত।'

রাগে গা জ্বলে গেল মিস্টার মুরের। এ দেশের সেরা সিকিউরিটি সার্ভিসকে কাজ দিয়েছেন, তারা বাইরের রাস্তা থেকে শুরু করে তাঁর অফিস পর্যন্ত নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য জাল পেতে রেখেছে। প্রতিটি করিডোর, লিফট, ঘরে ক্যামেরা ও স্ক্যানার। তাঁর অফিসের দরজায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে কি-কোডেড লক। তিনি ছাড়া কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না। এসবই করা হয়েছে ঝামেলা দূরে রাখতে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এসব মোটেও যথেষ্ট নয়।

কাউচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাথা শেভ করা লোকটা।

'তুমি ঢুকলে কী করে?' জানতে চাইলেন মুর।

কর্কশ হাসল উলকি মানব। 'তুমি কি ভেবেছ সস্তা এসব সিকিউরিটি গ্যাজেট আমাকে ঠেকিয়ে দেবে? জীবনের অর্ধেক সময় পার করেছি এসব সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করে। সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল তোমার সিকিউরিটি সিস্টেমের চেয়ে অনেক

আধুনিক। তুমি বস্তির ঘরে বেড়ার দরজায় শেকল দিয়ে খুশি, কেউ ঢুকতে পারবে না!'

সিটে নড়েচড়ে বসলেন মুর। কী ধরনের বিপদ, ভাল করেই বুঝতে পারছেন। ওই লোকের ব্যাকগ্রাউণ্ড এমনই, ভাবতে গেলে গলা শুকিয়ে যেতে চায়।

'একবার নিজের সিকিউরিটির ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম না, তাই মস্ত ক্ষতির মুখে পড়ি,' বলল উলকি মানব, 'সেজন্যে কম শাস্তি হয়নি। তাই বলছি, বড় কোনও ভুল করতে যেয়ো না। অন্যের নাগালের বাইরে নও তুমি। ...কেউ তা নয়।'

কথাটা ঠিক, বুঝলেন মুর। এই লোক একসময় ছিল অত্যন্ত সম্মানিত এবং ক্ষমতাশালী আমলা। আর সে কারণেই প্রথমবার তার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হয়েছিলেন। পরে একই কারণে জোট বেঁধে এক সঙ্গে কাজ করেন দু'জন। কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না। আসলে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তখন বুঝতে পারেননি এর অন্তরটা কালো পাষাণের মত। এর মত ভয়ঙ্কর মানুষ আর হয় না। পরে সম্মান ও ক্ষমতা হারিয়ে বসল সে। নিজের নাম দিল: কাউন্ট। কথাবার্তা তখনও থাকল উদ্ধত, বেয়াদবের মত। কসমেটিক অপারেশন করে পাল্টে ফেলল চেহারা। হয়ে গেল অশুভ, অন্ধকারের এক প্রাণী। তারপর একের পর এক খুন করেছে স্যাডিস্টের মত। কখন যে কার কী ক্ষতি করবে, আগে থেকে বলতে পারবে না কেউ।

আসলে অত ওপরের আমেরিকান সরকারি পদ থেকে পতনের ফলেই খেপে গিয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তাই বলে তার ভয়ঙ্কর কোনও পাগলামি দেখতে রাজি নন মুর।

'কী ধরনের খবর নিয়ে এসেছ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আমার আরও টাকা দরকার,' বলল কাউন্ট।

'এটা কোনও খবর নয়।'

‘আমার অ্যাকাউন্টে আরও দশ লাখ ডলার পাঠিয়ে দাও,’ বলল কাউন্ট। গলার সুরে মনে হলো তার চাকরি করেন মুর।

‘আরও এক মিলিয়ন? নতুন কী করেছ যে আরও টাকা দিতে হবে? যে স্যাম্পল চেয়েছি, সেটা পেয়েছ? তোমার হাতে এসেছে দরকারী প্রোটিন বা কোডিং?’

‘স্যাম্পল পেয়েছি, কিন্তু তুমি তো চাও স্যাম্পলের চেয়েও অনেক বেশি কিছু।’

ভুরু কুঁচকে ফেললেন মুর।

দু’আঙুলে ধরে ছোট একটা ভায়াল দেখাল কাউন্ট। জিনিসটা সিল করা, কিন্তু কোনও লেবেল নেই।

‘চুক্তি অনুযায়ী ডক্টর মোবারকের মিরিকল ড্রাগ এনে দেয়ার কাজ তোমার। ভায়ালের ভেতর কি সেই জিনিস?’

‘আংশিক ডেলিভারি,’ বলল কাউন্ট, ‘এ ভায়ালের ভেতর মোবারকের নতুন এক্সপেরিমেন্টের সামান্য অংশ। এটা পেলেই বুঝবে কী ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করছিল সে।’

‘কী করছিল তা বড় কথা নয়, ওই কাজ কি শেষ করেছিল সে? সেসব না বুঝে তোমাকে আর এক পয়সাও দেব না।’ কঠোর হয়ে গেল মুরের চোখ। রাগে কাঁপছেন বলেই ভয়কে জয় করে নিয়েছেন। ‘কথামত ওই ড্রাগ এনে দেবে। ওটার জন্যে আগেই তোমাকে দেয়া হয়েছে দশ লাখ ডলার। এরপর আর কোনও কথা হবে না।’

ঘাড় কাত করল কাউন্ট। গলায় ভাঁজ পড়তেই অদ্ভুত দেখাল উলকিটা। চাপা শোনাল তার কণ্ঠ: ‘টাকাগুলো দিয়ে দাও, মুর। আমি খুঁজে বের করব ওই ড্রাগ।’

রাগে থরথর করে কাঁপছেন মুর। ফালতু লোকটা বলছে, সে খুঁজে বের করবে ওই ড্রাগ! আসলে পারবে না কিছুই! খুন হয়ে গেছে ডক্টর মোবারক। উড়ে গেছে তার বাড়ি। কোথাও কোনও

এক্সপেরিমেন্টের কাগজপত্র নেই। এখন হাজির হয়ে মিথ্যার পর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এই লোক!

'তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখছি না,' বললেন মুর।

'তা-ই?' নরম সুরে বলল কাউন্ট। 'রাখবে না?'

'কী ভেবেছ তুমি নিজেকে?' তিক্ত কণ্ঠে বললেন মুর। 'খুন করবে আমাকে? সেক্ষেত্রে বেরোতে পারবে না। কোনও পথ নেই বেরিয়ে যাওয়ার।'

মুরের দিকে পা বাড়াল কাউন্ট।

বিপদ বুঝলে ডেস্কের ডানের লাল বাটনে চাপ দেবেন মুর। বললেন, 'এটা একবার স্পর্শ করলে চারপাশ থেকে বন্ধ হবে এই ঘর। চাইলেও স্টিলের পাত ভাঙতে পারবে না। আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে না গেলে আটকা পড়বে।'

যেন আনমনে হাঁটছে কাউন্ট। প্রকাণ্ড ডেস্কে ব্যবসায়ীর সামনে রাখল ভায়াল। 'এক সপ্তাহ আগে এটার ভেতরের ভাইরাস পাঠিয়ে দিয়েছি ইউএন অফিসে। এটাই মোবারকের প্রোটোটাইপ। ওরা বুঝছে না এটা আসলে কী। তোমার কাছ থেকে পাওয়া ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে তৈরি করেছি, এটা জানলে ওরা ছাড়বে না তোমাকে।'

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তুমি বাধ্য করলে তাদের হাতে প্রমাণ তুলে দেব।'

লাল বাটনের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন মুর।

'তুমি তো অফিসে আর বাসায় আরাম করো, এদিকে মানুষ খুন করা, বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার কাজে আমি ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে আলাপের প্রতিটা কথা রেকর্ড করেছি। চুক্তিমত কত টাকা দিয়েছ তার সব প্রমাণ রেখেছি। সব তুলে দেব ওদের হাতে। আমার কিছুই হবে না। এমনিতেই পলাতক অপরাধী। কিন্তু চিন্তা করো তোমার অবস্থা কী হবে!'

অসহায় চোখে কাউন্টের চোখ দেখলেন মুর। তবে জেদ করে বললেন, 'তোমার পেছনে এমন লোক লাগিয়ে দেব, কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

'চেষ্টা করবে,' মাথা দোলাল কাউন্ট। 'ঝুঁকি নিতেও আপত্তি থাকবে না তোমার। জেনে গেছি, তল্লায় তলায় কী ভাবছ। কিন্তু ভুলেও জানো না, তোমার মুখোশ খুলে গেলে কীসের ভেতর পড়বে।' মুরের দিকে ভায়াল ঠেলে দিল সে। 'আমার অ্যাকাউন্টে জমা দেবে দুই মিলিয়ন ডলার।'

'তুমি বলেছিলে এক মিলিয়ন।'

'ওটা আমার সমস্যা তৈরি করেছ বলে।'

'আর বাকি টাকা?'

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসল বেপরোয়া লোকটা। 'এমন একজনকে চিনি, যে তোমার হয়ে সিনথেসিস করবে। তাকে কাজে জড়িয়ে নেয়ার জন্যে দেবে আর এক মিলিয়ন।'

'কে সে?' এত বড় বিপদেও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মুর।

'যার কাছ থেকে জানতে পেরেছি মোবারকের কথা।'

'তার মেয়ে?'

মাথা দোলাল কাউন্ট।

সাপের মত ঘিনঘিনে এই লোকের প্রতি তীব্র ঘৃণা মুরের মনে, কিন্তু শেষ কয়েকটা কথা শুনে বুকে জেগেছে লোভ। অদ্ভুত কিছু আবিষ্কারের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ডক্টর মোবারক। এমপিসি ওই জিনিস হাতে পেলে, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করবে। চিরকালের জন্যে সেরা ড্রাগ বলে প্রমাণিত হবে। তাতে আসবে প্রতি মাসে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। আর ওটা তো মাত্র শুরু!

কিন্তু খুবই জটিল গবেষণা করছিল ডক্টর মোবারক। স্যাম্পল

পেলেও এমপিসির গবেষকদের মূল ফরমুলা বের করতে লাগবে কয়েক বছর। জানতে হবে সঠিক কোডিং। কিন্তু ডক্টর মোবারকের মেয়ে কয়েক বছর কাজ করেছে বাবার সঙ্গে। তার পক্ষে সহজ হবে আসল জিনিস খুঁজে বের করা। সোজা কথায়, কেউ চট্ করে সিরাম আবিষ্কার করতে পারলে, সে ওই মেয়ে!

নকল কাউন্টের ওপর ভরসা করাই ভাল। ক্রিমিনালের মত মন আছে তার। খুঁজে নিয়ে ওই মেয়েকে বাধ্য করবে সিরাম তৈরি করতে। লোকটার গুণের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুনিয়ার আর কেউ তার মত এভাবে গোপনে এসে ঢুকতে পারত না এ অফিসে। ডক্টর মোবারকের মেয়েকে কিডন্যাপ করতে কে ঠেকাবে তাকে?

'ওই মেয়েকে সরিয়ে আনতে পারবে?' জানতে চাইলেন মুর।

'ওকে সরাতে হবে না,' বলল কাউন্ট, 'নাকের কাছে যথেষ্ট টাকা ধরলেই সুড়সুড় করে আসবে তোমার ফার্মাসিউটিকালের হয়ে কাজ করতে।'

পনেরো

ঘন কালো মেঘে ঢাকা প্যারিসের চার্লস্ দ্য গল এয়ারপোর্টের আকাশ। টারমাকে পা রেখে হাঁটার গতি কমাল রানা। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছে এলেনা। একটু দূরেই এনআরআই-এর সাইটেশন। ওটাতে করেই আটচল্লিশ ঘণ্টা

আগে এ দেশে এসেছিল ওরা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে হোটেলে যাওয়ার সময় নিজেদের ভেতর আলাপ করেছে রানা ও এলেনা। পরে হোটেল কক্ষে বিশ্রামের সময় মোটামুটি সব গুছিয়ে নিয়েছে। তারপর এলেনা ফোন করেছে এনআরআই চিফকে। জানিয়ে দিয়েছে, রানার পেনড্রাইভ থেকে যেসব তথ্য ওরা পেয়েছে, তাতে মনে হয়েছে, যাওয়া উচিত বৈরুতে। খোঁজ নিয়ে দেখবে, কেন ওখানে যেতে চেয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক আবু রশিদ। এ ছাড়া উপায়ও নেই ওদের। সামনের সব পথ আপাতত বন্ধ।

বিমানের সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন এক বয়স্ক লোক। চুল সব ধূসর। পরনে সবুজ ওভারকোট।

এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান।

এরই ভেতর বিসিআই-এ যোগাযোগ করেছিলেন ভদ্রলোক, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাছ থেকে শুনেছে রানা। আপাতত ওদের হয়ে রানা কিছু করলে তাঁর আপত্তি নেই, বলেছেন। অবশ্য সিদ্ধান্ত রানার।

ওরা দু'জন সিঁড়ির কাছে পৌঁছতেই ব্রায়ান বললেন, 'আসুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।'

ওরা যে যার সিটে বসার পর ককপিট থেকে এল কো-পাইলট। সিঁড়ি সরে যেতেই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। আবার ফিরল ককপিটে। পাঁচ মিনিট পর আকাশে ডানা মেলল বিমান। ওটা চলেছে দক্ষিণ-পুবে বৈরুত লক্ষ্য করে।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখ খুললেন ব্রায়ান। খুব গম্ভীর শোনাল তাঁর কণ্ঠ: 'আমাদের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করছে ফ্রেঞ্চরা। যারা এসব হত্যা করছে, তাদের বিষয়ে অসংখ্য ডেটাবেস ঘাঁটা হচ্ছে। ইউএন লেটার, ডক্টর মোবারকের মৃত্যু, ধর্মের নামে

আগুন দিয়ে নির্যাতন শেষে মানুষ খুন করে ফেলা কাল্ট... এসব থেকে পাওয়া গেছে একটা প্রোফাইল।' একইরকম দুটো ডোশিয়ে রানা ও এলেনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

প্রথম পাতায় চোখ বোলাল রানা।

ইরাক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট। লিখেছে: হামলা করেছে কাল্ট অভ মেন নামের এক গোপন সংগঠন।

'খুব গোপন কাল্ট, গত দু'এক বছরের ভেতর বেশ কিছু খুন করেছে,' বললেন ব্রায়ান। 'তার আগে যেন ছিলই না।'

'কোন্ পক্ষের হয়ে কাজ করছে?' জানতে চাইল রানা।

'কারও পক্ষেই নেই এরা।' মাথা নাড়লেন ব্রায়ান। 'বৈরুতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পক্ষে যারা কথা বলে; সেসব মুসলিমকেও খুন করছে। বাদ পড়ছে না হামাস মিলিট্যান্টরাও। প্রথম হামলা করে বেলফাস্টের এক দালানে। প্রতিবার দায় স্বীকার করেছে।'

'বদ্ধ উন্মাদ মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল এলেনা।

'ইরাক আর ইজরায়েল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ধারণা: এরাই এসব হামলা করছে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই,' বললেন ব্রায়ান।

'মিথ্যা-মিথ্যি কেন কাঁধে নেবে দায়?' জানতে চাইল রানা।

'গোক্ষুরের ফণার মত,' বললেন ব্রায়ান, 'ওদেরকে যত বড় বলে মনে করছি, আসলে হয়তো তেমন বড় নয় ওই সংগঠন।'

'কেন ভাবছেন ডক্টর মোবারক খুনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে?' প্রশ্ন তুলল রানা।

'ছয় মাস আগে তাদের একজনের ছবি তুলেছিল আমাদের এক এজেন্ট। সেই লোক ছিল ডক্টর মোবারকের সঙ্গে।'

ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা।

'ইরাকি আর ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের ধারণা: ওই লোক ধার্মিকদের বিপক্ষে কাজ করছিল। এরা পৃথিবীর সব অন্যায়ের

দায় চাপিয়ে দিচ্ছে স্রষ্টার ওপর।'

'কোন্ ধর্মের গডের বিপক্ষে?'

'সব ধর্মের স্রষ্টার বিরোধিতা করছে। প্রচার করছে, সব ধর্মের স্রষ্টাই আসলে ক্ষতিকর মানুষের জন্যে। এসব ধর্ম তৈরি হওয়ায় চালু হয়েছে মানুষে মানুষে লড়াই। পরস্পরকে ছোট করছে মানুষ... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'তা হলে তাদের কথা হচ্ছেঃ স্রষ্টার নামে নানান ধর্মের মানুষ খুন করছে একে অপরকে,' বলল গম্ভীর রানা। 'অর্থাৎ পাওয়া গেল এমন এক দলকে, যারা কোনও স্রষ্টার নামে খুন না করে নিজেদের প্রয়োজনে যা খুশি করছে।'

'কিন্তু এসবের সঙ্গে ইউএন চিঠির কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল এলেনা। 'ইউএন সংগঠন তো কোনও ধার্মিক অবকাঠামো নয়।'

'এখনও জানি না কী কারণে কী হচ্ছে,' স্বীকার করলেন ব্রায়ান। 'কিন্তু একটা কথা পরিষ্কারঃ বিগড়ে গেছে এদের মাথা। খুব গোপন দল। অতীত জানতে গিয়ে থমকে গেছি আমরা। যেন আকাশ থেকে পড়েছে দু'এক বছর আগে। কোত্থেকে জোগাড় করছে লোক, কোথায় ট্রেনিং নিচ্ছে, টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে, এদের মূল উদ্দেশ্য কী— সবই অজানা। এদের অতীত বলতে কিছুই নেই।'

'অর্থাৎ, আসল উদ্দেশ্যও জানা যায়নি,' বলল এলেনা।

'ওরা প্রচার করছে ধর্ম অত্যন্ত খারাপ পদ্ধতি। ধর্ম আমাদেরকে রক্ষা করছে না, ধর্মের কারণেই ছোট হয় মানুষের মন। আমরা হয়ে উঠি হিংস্র। একটা প্রচারপত্রে ওই দল লিখেছেঃ "*মিথ্যার পর মিথ্যা শুনি, তার ফলে আরও ছড়িয়ে পড়ে মিথ্যার ঢেউ। ধর্মের নামে পৃথিবীর বুকে যে-যার মত সুবিধা আদায় করছে অনেকে। অন্যায় বাড়ছে মহামারীর মত।*

এই রোগ এতই বেশি, গ্রাস করছে চারপাশ। প্রতিবেশী বা নিজ ভাইকে না খাইয়ে রাখছি আমরা। দরকার পড়লেই খুন করছি। আসলে যা খুশি চলছে পৃথিবী জুড়ে। কোনওভাবেই লোভকে সামলে রাখছে না কেউ। স্রষ্টা থাকলে এমন হতো না। আমরা মানুষ বুঝতেই পারছি না, নিজ দোষে ডেকে আনছি পৃথিবী ও মানব জাতির নিশ্চিত ধ্বংস।'''

এসব আগেও শুনেছি, ভাবল রানা। কিন্তু কোথায়?

'এই উদ্ধৃতি কি টেনিসন বা অন্য কারও?'

'মিল্টনের করাপশন,' বললেন ব্রায়ান, 'প্যারাডাইস লস্ট।'

'ইভ আপেল খেয়েছে তা কবিতায় তুলে ধরেছিলেন,' বলল এলেনা।

'এ ছাড়াও অনেক উদ্ধৃতি আছে,' বললেন ব্রায়ান, 'ইউএন চিঠিতে লিখেছে: *হি হু ওভারকাম বাই ফোর্স, হ্যাথ ওভারকাম বাট হাফ হিয ফো।*'

'কিছু যেন বোঝাতে চাইছে,' সন্দেহ নিয়ে বলল এলেনা।

'স্বয়ং শয়তানের ভূমিকা নিয়েছে,' বললেন এনআরআই চিফ, 'স্রষ্টার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছে, কাজেই ধ্বংস করতে চাইছে পৃথিবীর বুকে মানব জাতিকে। কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ইউএন-এর চিঠিতে লিখেছে: আমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দেব পৃথিবী।'

আবারও কাগজে চোখ দিল রানা। পড়তে পড়তে ওর মনে হলো, প্রতিটা চরণ থেকে ঝরছে তিক্ততা ও ঘৃণা। সঠিকভাবেই বেছে নেয়া হয়েছে মিল্টনকে। উন্মাদ লোকটা যেন বোঝাতে চাইছে আরও অনেক কিছুই, অথচ ঝেড়ে লেখেনি।

'এরা আর কী চায়?' বলল এলেনা, 'স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়বে, না মানুষের বিরুদ্ধে?'

'এটা বুঝতে পারছি, প্রথম কাজ ধার্মিকদের ওপর হামলা,'

বললেন ব্রায়ান। 'বড় প্রতিটি ধর্মেই বলা হয়েছে, যত বেশি পারো সন্তান উৎপাদন করো। নইলে সংখ্যায় কমে যাবে। তখন লড়াই করে তোমাদেরকে হারিয়ে দেবে শত্রুদল। কিন্তু অন্যসব ডকুমেন্ট বা ইউএন চিঠি থেকে বুঝতে পারছি, ওদের নেতা চাইছে কমে যাক জনসংখ্যা। নইলে এমন এক পরিবেশ তৈরি হবে, বাঁচার উপায় থাকবে না কারও। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা নানান ওষুধ ও টেকনোলজি তৈরি করেছে বলেই অনেক কমে গেছে মৃত্যুহার। কিন্তু গতি কমেনি জন্মহারের।'

'তার মানে মহামারী দিয়ে মানব জাতিকে ছোট করে আনতে চাইছে ওরা?' জানতে চাইল এলেনা।

'উন্নত দেশে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে গরু, ছাগল, শুয়োর, খরগোশ, মুরগি এসব মেরে ফেলি আমরা,' বললেন ব্রায়ান। আর কিছুই বলছেন না।

'কিন্তু মানুষ তো জীবজন্তু নয়,' আপত্তির সুরে বলল এলেনা।

'ওই কাল্ট হয়তো তোমার সঙ্গে একমত নয়,' মাথা নাড়লেন ব্রায়ান।

চুপ করে আছে রানা। নিজ চোখে বহু কিছুই দেখেছে। পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষ আছে, যারা অন্য মানুষকে সামান্য তেলাপোকার সমান বলেও মনে করে না। অত্যাচারের চূড়ান্ত করে এরাই।

'ডক্টর মোবারক এমন এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন, যার মাধ্যমে কমিয়ে দেয়া যাবে মানুষের আয়ু,' বলল এলেনা। 'সাফল্যের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর ওই জিনিসই হয়তো হাতের নাগালে চাইছে ওই কাল্ট।'

'হতে পারে,' বললেন ব্রায়ান।

রানা বুঝে গেছে, ভীষণভাবে মগজ নষ্ট বিপজ্জনক একদল

লোক স্থির করেছে, যা খুশি করবে। সহজ হবে না তাদেরকে গ্রেফতার করা, মরতেও আপত্তি থাকবে না তাদের।

'যে কারণেই হোক, এদের সঙ্গে মিশতে থাকেন ডক্টর মোবারক,' বলল রানা। 'যদি বের করা যায় ঠিক কোন্ সময় থেকে, সেক্ষেত্রে হয়তো খুঁজে পাব তাদের গোপন আস্তানা। খুব খারাপ কিছু হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখাবার চেয়ে বিপদ আসার আগেই ঠেকিয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।'

চিন্তিত চোখে ওকে দেখলেন ব্রায়ান। 'কখন থেকে এদের সঙ্গে মেশেন ডক্টর মোবারক, সেটা বোধহয় আমরা জানি।' বাটন টিপে দিতেই এয়ারক্রাফটের বালকহেডের স্ক্রিনে দেখা দিল ছবি।

ঘুরে বসে মনিটরে চোখ রাখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড বুঝল না কী হচ্ছে। ছায়াছবিটা খুব ঝাপসা। যে হলরুমে ক্যামেরা, সেখানে পর্যাপ্ত আলো নেই। বড় অডিটোরিয়াম। ক্যামেরা যুম হতেই দেখা গেল স্টেজে বসে আছে কয়েকজন। তাদের ভেতর ডক্টর মোবারককে চিনতে পারল রানা। বয়স কম তাঁর। হালকা-পাতলা শরীর। পরনে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও কালো টাই।

মানব জাতির বিপুল খাবার জোগাড় করার সঙ্কট বিষয়ে কথা বলছে মডারেটর। বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতে বাধ্য হয়েই উৎপাদন করতে হবে জেনেটিকালি মডিফায়েড ফসল।

আগামী বিশ বছরে কৃত্রিম ফসল উৎপাদনে কতটা উন্নতি সম্ভব, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো ডক্টর মোবারকের কাছে।

'অনাবৃষ্টি ও খরা ঠেকিয়ে রাখা খুবই জরুরি,' জোর দিয়ে বললেন মোবারক। 'ফসল নষ্ট হলে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে পারব না আমরা। কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে হবে, সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখে প্রকৃতি। খরা ঠেকাতে গেলে সেজন্যে অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক

কম ফসল পাওয়া যেতে পারে। অন্যদিক থেকে দেখুন, জেনেটিকালি ফসল উৎপাদন করলে তাতেও রয়েছে বড় ধরনের ঝুঁকি। এসব ফসলের জন্যে বেশি পানি ও সার লাগবে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে চরমভাবে ব্যাহত হবে ফসলের উৎপাদন। হয়তো ফসল হলোই না।'

শ্রোতাদের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তা হলে কী করা উচিত, ডক্টর মোবারক? ভবিষ্যতে আমরা কী আশা করতে পারি?'

গলা পরিষ্কার করে মুখ খুললেন মোবারক, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরম অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছি আমরা। জবাব হিসেবে বলতে পারি, আমরা চাই এমন এক ফসল, যেটা খুব খারাপ পরিবেশেও প্রচুর পরিমাণে ফলবে। একর ভরা ফসলও হবে, আবার নষ্টও করবে না মাটি, টেনে নেবে না বেশি পানি। এসব নিয়েই কাজ করছি আমরা।' থেমে গেলেন তিনি, একটু বিরতি দিয়ে অনুৎসাহী সুরে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। আপনি তো আর হাতিকে নির্দেশ দিতে পারেন না, ওজন কমাতে পারবে না, কিন্তু এখন থেকে উড়তে হবে আকাশে।'

হেসে ফেলল দর্শক-শ্রোতারা।

'নানান দিকে সমস্যার শেষ নেই,' বললেন মোবারক। 'সাধ্য মত করছি আমরা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি জানতে চাইলে বলব: আমরা ফসল পাওয়ার সমস্যা দূর করতে গিয়ে ভুল জায়গা হাতড়ে বেড়াচ্ছি। অনেকেই বলেন, বাস্তবে খুব কম খাবার উৎপাদন করছে পৃথিবী। কিন্তু তাঁরা একটা কথা বলেন না, আমরা সবাই মিলে অনেক বেশি ভোগ করছি।'

চুপ হয়ে গেলেন মোবারক। রানার মনে পড়ল, জরুরি পয়েন্ট তুলে ধরার সময় সবসময় এভাবে বিরতি নিতেন

বিজ্ঞানী।

'কিছু দিন পর পৃথিবীতে আমরা থাকব সাত বিলিয়ন মানুষ। পরের বিশ বছরে মানুষের সংখ্যা হবে দশ বিলিয়ন। যতই ঠেকিয়ে রাখা যাক জনসংখ্যা, দু' হাজার পঁচাত্তর সালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে বারো থেকে পনেরো বিলিয়ন। কিন্তু এত মানুষের খাবার জোগাড়ের সাধ্য নেই পৃথিবীর। বিশেষ করে আমেরিকানদের মত আয়েস করে জীবন কাটাতে চাইলে তা হবে একেবারেই অসম্ভব।'

গুঞ্জন তুলল শ্রোতারা।

'মনে ভুল ধারণা রাখবেন না,' বললেন মোবারক, 'পৃথিবীর প্রতিটি কোণে মানুষ স্বপ্ন দেখে, সে-ও আমেরিকানদের মত ভোগ করবে রাজকীয় জীবন। ...আমরা হিসেব কষে দেখেছি, এভাবে বিলাস করতে চাইলে প্রত্যেকের লাগবে বর্তমান পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার ছয় গুণ বেশি খাবার, পানি ও ফিউয়েল। কিন্তু এসব দেয়ার সাধ্য আছে এই গ্রহের? আমেরিকানদের মত ফুর্তি করতে হলে চাই পঞ্চাশ বিলিয়ন মানুষ যে পরিমাণ খরচ করবে, সে পরিমাণ সম্পদ। যা পৃথিবীর নেই।'

আবারও গুঞ্জন তুলল শ্রোতারা।

'প্রাণী, কীট বা ব্যাকটেরিয়া সংখ্যায় বেশি হলে দেখা দেয় তাদের ভেতর বিপর্যয়... নিজেরাই ধ্বংস করে নিজেদের। আমাদেরও তা-ই হবে। খাবারের অভাবে ধ্বংস হব আমরা।'

প্যানেলিস্টদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'পৃথিবী আসলে আমাদের বাড়ি ও খাবারের গোডাউন,' ভদ্রলোকের উদ্দেশে বলে আবার শ্রোতাদের দিকে ফিরলেন মোবারক। 'আরও অনেক বেশি ফসল উৎপাদন করার ভেতর সমাধান লুকিয়ে নেই। আসল কথা, কমিয়ে নিতে হবে আমাদের

জনসংখ্যা। যত জলদি আমরা তা করব, ততই কম হবে ক্ষতি। কিন্তু বড়সব ধর্ম বলছে: যত বেশি পারো সন্তান উৎপাদন করো, দলে ভারী হও। একই কথা বলবে আরও অনেকে। কিন্তু সত্যি যখন দেরি হয়ে যাবে, তখন আর ফেরার উপায় থাকবে না। তখনই প্রলয়ের মত খারাপ কিছুর মাধ্যমে হঠাৎ করেই হ্রাস পাবে জনসংখ্যা। খুশি মত সন্তান নেয়ার অধিকার যেসব দেশে আছে, তাদের কথা বাদই যাক, "এক সন্তান" আইন পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারেনি কঠোর চায়না সরকারও।'

ক্যামেরা থেকে দূরে অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, 'আপনি আসলে কী করতে বলছেন?'

আবারও গলা পরিষ্কার করলেন মোবারক। 'গবেষণা করে যেমন ফসল উৎপাদন বাড়াতে হবে, ঠিক সেভাবেই কমিয়ে আনতে হবে জনসংখ্যা। যেমন, এমন কোনও ভাইরাস তৈরি করা যেতে পারে, যেটা ছড়িয়ে পড়বে একজন থেকে অন্যের ভেতর। ওটার ভেতর থাকবে জেনেটিক কোডিং। ফলে নির্দিষ্ট সব মানুষের জন্মদানের ক্ষমতা কমবে বা নষ্ট হবে। অথবা কমিয়ে দেবে মানুষের বাঁচার ক্ষমতা। সত্যি যদি বড়জোর পঞ্চাশ বা চল্লিশ বছর বাঁচে কেউ— আগে যেমন ছিল— হুড়মুড় করে বাড়তে পারবে না এত মানুষ।'

'কী বললেন?' চিৎকার করে উঠল এক লোক।

'আপনার কি মাথা খারাপ?' জানতে চাইল আরেকজন।

নতুন করে শুরু হয়ে গেছে জোরালো গুঞ্জন।

'দয়া করে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, এটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন,' শান্ত স্বরে বললেন মোবারক। 'ভবিষ্যতে জন্মদান ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া বা আয়ু কমিয়ে দেয়া ছাড়া কোনও উপায় আসলে নেই। হয় গাদাগাদা বাচ্চার জন্ম দেব না আমরা, নয়তো বেছে নেব স্বল্প আয়ু। দুটোর একটা না একটা করতেই হবে। কে কোন্‌টা

বেছে নেবে, তা ঠিক করবে মানুষ।'

ভুল জায়গায় অ্যাকাডেমিক তর্কের বিষয় নিয়ে কথা বলছেন মোবারক। শতখানেক গালি আর অনেকগুলো এক পাটি জুতো ছুটে এল তাঁর দিকে।

'মার শালাকে!' চিৎকার করে উঠল একজন।

'শালা নাযি! ফাঁসি দে!'

পোডিয়াম থেকে নেমে গেলেন না মোবারক।

'দয়া করে শান্ত হোন, প্লিয,' বারবার অনুরোধ করতে লাগল মডারেটর।

চিৎকার তাতে কমল না।

'আপনারা আমেরিকায় বাস করছেন, দেশটা ধনী, জায়গার অভাব নেই,' বললেন মোবারক। 'কিন্তু অন্য দেশের কথা ভাবুন। দেখেছেন তৃতীয় বিশ্বের বস্তিতে কীভাবে বাস করে মানুষ? তাদের বাচ্চাদের পোশাক নেই, লক্ষ লক্ষ হাত ভিক্ষা চাইছে, কায়ক্লেশে চলছে জীবন। ওটাই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। আপনাদের ফ্রিওয়েতে জ্যাম নেই, রেস্টুরেন্টে লাইন ধরে খেতে হচ্ছে না। কিন্তু আপনাদের দেশের বাইরে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছে। ওরা পিঁপড়ের মত একজন আরেকজনের ঘাড়ে পা রেখে বাঁচার চেষ্টা করছে।'

এক পাটি জুতো মোবারকের নাকের পাশ দিয়ে গেল। মাথা পিছিয়ে নিয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। নিস্পৃহ চোখে দেখলেন শ্রোতাদেরকে। হই-চই এতই বেড়ে গেল, মাইক্রোফোন থাকা সত্ত্বেও কষ্ট হলো তাঁর কণ্ঠ শুনতে।

'আপনাদেরকে বুঝতে হবে কোন্‌টা বাস্তব!' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'আমরা যদি নিজেরা ওই কাজ না করি, ওই কাজ নিজ হাতে তুলে নেবে প্রকৃতি। আর প্রকৃতি সবসময় সবকিছুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণেই রাখে।'

বেশ কয়েকজন এগোচ্ছে মঞ্চে উঠবে বলে। মোবারকের হাত থেকে মাইক্রোফোন প্রায় কেড়ে নিল মডারেটর। শান্ত করতে চাইল সবাইকে। তাতে একটু কাজও হলো। অনেকেই বেরিয়ে যেতে লাগল অডিটোরিয়াম ছেড়ে। কেউ কেউ আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ডক্টর মোবারকের দিকে। আরেকদল চিৎকার করে গালি দিচ্ছে। হলরুমে তৈরি হয়েছে বিশৃঙ্খলা। কে যেন আছড়ে ফেলল একটা টেবিল। তখনই ফুরিয়ে গেল ডিভিডি ফুটেজ।

চুপ করে আছে রানা।

ডক্টর মোবারকের বলা কথাগুলোই লিখেছে কান্টের চিঠিতে।

'খুব দুঃখজনক,' নিচু স্বরে রানাকে বলল এলেনা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। অন্য কথা ভাবছে। ছবিতে ডক্টর মোবারককে কম বয়সী মনে হয়েছে। মসৃণ মুখ। মাথা ভরা চুল। 'ওই দৃশ্য কত সালের?' জানতে চাইল ও।

'দু' হাজার দশ সাল,' বললেন ব্রায়ান। 'ক্রপ প্রোডাকশন বিষয়ক কনফারেন্স। এরপর থেকে নানান দেশের বেশ কিছু ল্যাবে কাজ করেছেন। আমাদের তথ্য অনুযায়ী, শেষ কাজ কঙ্গোয়। এরপর কোথাও আর বেশি দিন টিকতে পারেননি।'

সিলিঙের দিকে চেয়ে বড় করে দম নিল রানা। 'কথা শুনলে মনে হয় পাগল হয়ে গেছেন ডক্টর মোবারক।'

'এসব থেকে কী ভাবব?' বসের দিকে তাকাল এলেনা।

'বিজ্ঞানীর কমপিউটার থেকে সংগ্রহ করা তথ্য মিস্টার রানার মোবাইল ড্রাইভে আছে, ওসব অ্যানালাইয করছে লাউ আন আর সিডিসি,' বললেন ব্রায়ান। 'জরুরি কিছু পেলেই জানব।'

'কী ধরনের হুমকি হয়ে উঠতে পারে ওই দল?' জানতে

চাইল এলেনা।

'আগেও অনেক দল নানান হুমকি দিয়েছে,' বললেন ব্রায়ান। 'গায়ানায় নিজের নয় শ' সাগরেদকে সায়ানাইড দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে জিম জোন্স। কেউ যেন বাঁচতে না পারে, সেজন্যে সে এবং তার দলের কয়েকজন মিলে গুলি করে মেরেছে অনেককে। তাদের ভেতর ছিল এক ইউ.এস. কংগ্রেসম্যান। আইয়ুআম শিনরিকয়ো কাল্ট টৌকিয়োর সাবওয়েতে ছেড়ে দিয়েছে নার্ভ গ্যাস সারিন। খুন হয়েছিল বারোজন। আহত হয়েছিল অন্তত এক হাজার মানুষ। তার পর পরই জানা গেল আতঙ্কিত হওয়ার মত খবর। পুলিশ রেইড করেছিল কাল্টের গোপন আস্তানায়। আবিষ্কার করা হয়েছিল অ্যানথ্রাক্স আর ইবোলা ভাইরাসের বড় চালান। এ ছাড়া ছিল বিস্ফোরক, ক্যাপটাগনের মত হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ ও ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর সব কেমিকেল। ওই সাইটে যে পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ ছিল, তাতে সারিন গ্যাস ছেড়ে শেষ করে দিতে পারত চল্লিশ লাখ মানুষকে।'

'জানতাম না ওসবের ভেতর অ্যানথ্রাক্স আর ইবোলা আছে,' বলল এলেনা। 'ব্যবহার করেনি কেন?'

'ভেবেছিল এসব করার মত পরিবেশ তৈরি হয়নি,' বললেন ব্রায়ান। 'গুজব শুনেছিল, যে-কোনও সময়ে রেইড করবে পুলিশ, তাই চেষ্টা করে আত্মহত্যা করতে। একই কাজ করেছিল জিম জোন্স। চারপাশে খবর ছড়িয়ে পড়ে, লোকজনকে আটকে রেখেছে তারা। আসলে কী হচ্ছে জানতে গিয়েছিল কংগ্রেসম্যান রায়ান। দলের নেতা যখন বুঝল, যে-কোনও সময়ে ধরা পড়বে, চাইল সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে। এ ধরনের অন্যায় আসলে এভাবেই শেষ হয়।'

মাথা নাড়লেন ব্রায়ান। 'অনেকটা শোকো আসাহারার দলের

মত এদের কাল্ট। আসাহারা ছিল জাপানিজ কাল্টের নেতা। প্রলয় চেয়েছিল। বুদ্ধের ওপর লেখা কিছু কথা ছিল তার মুখে। বিশ্বাস করত ঠিক বলে গেছে নস্ট্রাডামাস।'

'আরেক উন্মাদ,' বলল এলেনা।

'সবাইকে যৌক্তিক হতে হবে, এমন কথা নেই,' বললেন ব্রায়ান। 'একদল মানুষকে প্রভাবিত করতে পারলেই হলো। এই ধরনের কাল্ট একই ধরনের আচরণ করে।'

'খুন করতে দ্বিধা থাকে না,' নড করল এলেনা। 'নির্যাতন শেষে খুন করে খুশি হয়। এদের তুলনায় বায়ো ওয়েপন ব্যবহার করে মানুষ খুন করা তো রীতিমত আর্ট।'

'হয়তো ডক্টর মোবারকের তৈরি বায়ো ওয়েপন এমনই কিছু,' বললেন ব্রায়ান। 'ওটা নিঃসন্তান করবে কোটি মানুষকে, বা কমিয়ে দেবে অনেকের আয়ু।'

মুখ খুলল রানা: 'যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে এসব সাইকোপ্যাথকে।'

রানার চোখে তাকিয়ে আছে এলেনা, মাথা দোলাল। 'বৈরুতে গিয়ে কী করা উচিত ভাবছ?'

'আবু রশিদ চোরাই শিল্পের ডিলার, আর বৈরুত এসব আর্টিফ্যাক্ট বিক্রির জন্যে বিখ্যাত,' বলল রানা। 'কেউ এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে ইউরোপে পালাতে চাইলেও ওটাই হবে গোপন পথ। ওখানে কয়েকজনকে চিনি, যারা আমাদেরকে ওই নিলামের ডাকে পৌঁছে দেবে।'

'তারপর কী করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রায়ান।

কঠোর হলো রানার কণ্ঠ: 'অবস্থা বুঝে পরে ব্যবস্থা নেব।'

'ডক্টর মোবারকের গবেষণার জন্যে টাকা জোগাড় করতেই বিক্রি হতো চোরাই আর্টিফ্যাক্ট?' জানতে চাইল এলেনা। 'নাকি টাকা জোগাড় করা হচ্ছে ওই কাল্টের জন্যে?'

'মনে হয় না এসব করা হয়েছে,' বললেন ব্রায়ান, 'এ ধরনের কোনও লিঙ্ক নেই। কিন্তু মিস্টার রানার মোবাইল হার্ডডিস্কের তথ্য অনুযায়ী, কখনও আর্টিফ্যাক্ট বিক্রেতা ছিলেন না ডক্টর মোবারক। বরং কী যেন কিনতে চেয়েছিলেন। ওটা কী, আমরা জানি না। তোমাদেরই একজনকে জানতে হবে, কেন আগ্রহী হন ডক্টর।'

'তার মানে এক সঙ্গে কাজ করব না আমরা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এলেনা।

'অপর সূত্র দুবাইয়ে, কাজেই দ্বিতীয়জন যাবে ওখানে,' বললেন ব্রায়ান, 'মার্ভেল নামের এক ড্রাগ কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্যে ওখানে সম্মেলন ডাকা হয়েছে। একসময় ওই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ডক্টর মোবারক।'

বৈরুতে কিছু পাওয়া বা জানা যাবে, তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, ভাবল রানা। এদিকে বিসিআই চিফ নির্দেশ দিয়েছেন, বৈরুতে না গিয়ে দুবাইয়ে যেতে। ওর উচিত, বিপদ হওয়ার আগেই মোনা মোবারককে সরিয়ে নেয়া।

'বিধ্বস্ত শহর বৈরুত, চারপাশে কালো বাজার, তবুও হাই-টেক বিলাসী, নির্লজ্জ শহর দুবাইয়ের চেয়ে ওই প্রাচীন নগরীতে যেতেই বেশি ভাল লাগবে আমার,' বলল এলেনা।

নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন ব্রায়ান, 'আপনি দুবাই যাবেন, মিস্টার রানা?'

জবাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, মনে মনে খুশি।

'আজ একটা কল এসেছিল আপনার ফোনে, ওটা ইণ্টারসেপ্ট করা হয়েছে,' বললেন ব্রায়ান, 'সরি, এ ছাড়া উপায় ছিল না। ফোন যে করেছে, তার নাম জন গ্রাহাম। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, সে আগে ছিল এম.আই.সিক্সের এজেণ্ট।'

'ডক্টর মোবারক সম্পর্কে খবর দিয়েছিল ওই বন্ধু,' বলল

রানা।

'যাকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন, তাকে পেয়েছে সে,' বললেন ব্রায়ান। কোলে তুলে নিলেন ল্যাপটপ।

স্ক্রিনে ফুটে উঠল লেখা। সেই সঙ্গে এল জন গ্রাহামের কণ্ঠ:

'শালা বুড়ো ভাম! মেয়েটাকে পেয়ে গেছি! আগেই বলেছি, তোমার উচিত ছিল ওই মেয়েকে বিয়ে করে ফেলা! সে কী রূপ রে, বাপ! এখন বিরাট ফার্মা কোম্পানি মার্ভেলের সবচেয়ে দামি বিজ্ঞানী! ওরে, শালা, আমার কথা শুনলে দিন-রাত টানতে পারতে সেরা শ্যাম্পেন! যখন-তখন বুলেট খেয়ে মরে যাওয়ারও ভয় থাকত না। কিনে নিতে পারতে সবচেয়ে দামি পোলো ঘোড়া। কিন্তু বলে কী লাভ তোমাকে? তুমি শালা বুড়ো ভাম! যাক গে, ওই মেয়ে আছে দুবাই শহরে। সব তথ্য পাঠিয়ে দিচ্ছি মেসেজ করে। বিপদে কাজে আসব মনে করলে যোগাযোগ কোরো।'

কথা ফুরিয়ে গেল। এক্স টিপে প্রোগ্রাম বন্ধ করলেন জেমস ব্রায়ান। খুব গম্ভীর। মনেই হলো না জন গ্রাহামের বক্তব্য শুনতে পেয়েছেন।

আতঙ্কিত ও বিস্মিত সুরে জানতে চাইল এলেনা, 'রানা, তুমি কি সত্যিই ওই মেয়েকে বিয়ে করবে?'

'গ্রাহাম ওভাবেই কথা বলে, ওর ধারণা ওটা রসিকতা,' বলল রানা।

'বেশ মজার লোক,' কষ্ট করে হাসল এলেনা।

'নিজ যোগ্যতায় জেনেটিসিস্ট হয়েছে মোনা,' বললেন ব্রায়ান। 'মার্ভেল ফার্মার নামকরা বিজ্ঞানী। দুবাই গেছে বক্তৃতা দিয়ে বড় বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করতে। মিস্টার রানা, ওর সঙ্গে দেখা হবে, দেখুন জানতে পারেন কি না আসলে কী জানে সে।'

ষোলো

প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ঘরে দাঁড়িয়ে আছে জুবায়ের। আলো আসছে ছাতের, শেড লাগানো সাদা বাতি থেকে। ওর পরনে সোয়েট প্যান্ট। দু'দিকের দেয়ালের আংটায় বন্দি হ্যাণ্ডকাফ পরা দু'হাত।

চারপাশে লোহার দেয়াল। বাইরে গুঞ্জন তুলছে কোনও মেশিনারি। মৃদু কাঁপছে মেঝে। কমে আসছে কম্পন, তারপর আবারও বাড়ছে। সাগরের স্রোতের মত।

জুবায়ের দেখছে ছায়ায় কারা যেন। একটু এগিয়ে আসছে তারা, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। সবার পরনে কালো পোশাক। মুখ ঢেকে রেখেছে হুড দিয়ে। এক এক করে ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে তারা। তার আগে ওর বাহু চিরে দিচ্ছে ধারালো ছোরা দিয়ে। প্রতিবার রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষত থেকে।

ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলছে জুবায়ের। অন্ধকার থেকে ছোরা বেরিয়ে এলে ঝিলিক দেখছে। ওর বাহু থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত, জমা হচ্ছে পায়ের কাছে রাখা ধাতব ট্রেতে।

জুবায়েরের সামনে ক্রুশ, বাঁকা চাঁদের আকৃতির সোনালি কর্ণকুণ্ডল ও ডেভিডের নক্ষত্র। অন্যান্য জিনিস চিনল না ও।

শেষবারের মত বাহু কেটে দেয়ার পর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল জুবায়ের।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল একদল লোক। কিন্তু অন্ধকারে

তাদেরকে ভাল করে দেখা গেল না।

কে যেন এসে থেমেছে পেছনে। কিন্তু আগেই মানা করে দেয়ায় ঘুরে তাকাল না ও।

'প্রথম থেকেই কি মিথ্যা বলা হয়েছে আমাদেরকে?' পেছনের লোকটা জানতে চাইল।

ধাতব ঘরে প্রতিধ্বনি তৈরি করেছে ওই কণ্ঠ। মার্ডকের গলা চিনল জুবায়ের।

'আমরা মিথ্যা শুনে বিশ্বাস করে শাস্তি পাচ্ছি, তাই পতিত হয়েছি,' জবাবে এক সঙ্গে বলল কালো পোশাক পরা লোকগুলো। 'আমরা অসম্পূর্ণ।'

জানতে চাইল কর্কশ কণ্ঠ: 'আমরা কি ত্যাগ করেছি সব মিথ্যা?'

'আমরা মিথ্যা ত্যাগ করেছি,' জবাবে বলল অন্যরা। 'বুকে রেখেছি শুধু সত্য।'

'আসল সত্য কী?'

ঝিমঝিম করছে জুবায়েরের মাথা। মন দিয়ে শুনতে চাইল কথাগুলো। ভাবল, আগে কী যেন বলেছে? হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে সব!

'বলা হয়েছে, আমরা সবাই মিলে সম্পূর্ণ হয়েছি!'

'আর কোথা থেকে আসে সত্য?' পেছন থেকে এল কণ্ঠ।

জুবায়েরের মনে হলো ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে। আসলে তা নয়। ভাবল, বাতাসের অভাবে আর রক্তশূন্যতায় দুর্বল লাগছে। খুব ঘুরছে মাথা।

'প্রভু সবসময় ঠিক কথা বলেন,' একই সঙ্গে বলল অন্যরা। 'রক্ত সবসময় সত্যি বলে।'

'আর প্রভুর সঙ্গে কথা বলেন কে?'

'পৃথিবীর আসল মালিক যিনি।'

পেছন থেকে চেপে ধরা হলো জুবায়েরের ঘাড়। যখন-তখন ওটা ভাঙবে মার্ডক। নরম হাড়ে শুরু হয়েছে তীব্র ব্যথা।

'তুমি কি মিথ্যা ত্যাগ করেছ?'

জুবায়েরের মনে আছে কী বলতে হবে। 'আমি মিথ্যা ত্যাগ করেছি! সত্যিই নেই স্রষ্টা! আছে শুধু মানুষ! পরে কোনও বিচার হবে না! আছে অনন্ত জীবন! আমাদের ক্ষেত্রে মৃত্যু নেই! কিন্তু যারা মিথ্যার ভেতর প'ড়ে আছে, তাদের মৃত্যু হবে!'

মেঝেতে রাখা ধাতব ট্রের দিকে তাকাল জুবায়ের। ওখানে অন্তত সিকি ইঞ্চি গভীর রক্ত। লাল তরলে ভাসছে কিছু ধর্মীয় অনুষঙ্গ।

আগুনের গন্ধ পেল জুবায়ের, লাল উত্তপ্ত কিছু এল অন্ধকারের মাঝে। ওটার ডগায় কয়েকটা অক্ষর ও সংখ্যা। ব্রাদারহুডের ব্র্যাণ্ডিং আয়ার্ন। কেউ ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে প্রথমেই দলে নেয়ার সময় ওটা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ব্রাদারহুডে যোগ দিতে চাইলে বুকে থাকতে হবে এসব সংখ্যা ও অক্ষর।

এবার মার্ডকের কণ্ঠের চেয়েও ভারী এক কণ্ঠ বলল: 'এই চিহ্নের জন্যে তুমি তৈরি?'

গনগনে লোহার দিকে তাকাল জুবায়ের। অন্ধকারে লাল আভা ছড়াচ্ছে ওটা। যে-কোনও সময়ে পুড়বে ত্বক ও মাংস।

আবারও জিজ্ঞেস করা হলো: 'এই চিহ্নের জন্যে তুমি তৈরি?'

স্রষ্টা আমার জন্যে কী করেছে? ভাবল জুবায়ের।

স্রষ্টা থাকলেও তো ওকে ফেলে দিয়েছে বস্তির ভেতর!

যখন-তখন এসে নির্যাতন করেছে পুলিশ ও ড্রাগ ডিলাররা।

বাঁচার জন্যে কী-ই বা পেয়েছে?

তা হলে ঈশ্বরকে ভেজে খাবে ও?

‘আমি এই চিহ্ন নেব,’ ব্যথার জন্যে তৈরি হলো জুবায়ের।

‘তা হলে তুমি সত্যিই হবে মামবা,’ বলল কাউন্টের ডানহাত।

জুবায়েরের বুকে চেপে ধরা হলো তপ্ত ব্র্যাণ্ডিং আয়ার্ন।

পুড়ে গেল ত্বক-মাংস, ব্যথায় আর্তনাদ ছাড়ল জুবায়ের। ছিটকে সরে যেতে চাইল। কিন্তু হাতদুটো আটকানো হ্যাণ্ডকাফে। বুক থেকে উঠছে পোড়া চামড়া-মাংসের বাজে গন্ধ। মাথা ঝুঁকে গেল ওর। হড়হড় করে বমি করল। ছুঁড়ে দেয়া হলো বালতি ভরা শীতল একরাশ পানি।

হাঁটুর ওপর ভর করে বসতে চাইল জুবায়ের। কিন্তু দু'হাত ওকে বসতে দিল না। কয়েক দফায় বমি করল। বুকের পোড়া ত্বক-মাংস খসে পড়ল মেঝেতে। ওদিকে চেয়ে দেখল জুবায়ের, বুকে গভীর পোড়া চিহ্ন। ওটার মাধ্যমেই বোঝা যাবে, ও আসলে ব্রাদারহুডের একজন।

শীতার্ত, রক্তাক্ত, হাঁটুর ওপর ভর করে টলমল করছে জুবায়ের। শুনল মার্ডকের কণ্ঠ। তাতে যোগ দিল অন্যরা।

‘মামবা,’ ফিসফিস করে বলল সবাই, ‘উঠে দাঁড়াও, মামবা। উঠে দাঁড়াও।’

দু'দিকের দেয়ালের আঙটায় দু'হাত, কষ্ট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জুবায়ের। বুঝতে পারছে, যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে।

বাড়তে লাগল বেশ কয়েকজনের কণ্ঠের মন্ত্র। একটু পর মনে হলো, থরথর করে কাঁপছে ধাতব ঘর। তবুও বুকের ভেতর হঠাৎ করেই সাহস ফিরে পেল জুবায়ের। হ্যাঁ, মারা গেছে জুবায়ের, সে এখন থেকে মামবা!

এমন এক দলের সদস্য, যাদের কখনও মৃত্যু নেই!

সতেরো

দুবাইয়ের চকচকে মোনোরেলে বসে পারস্য উপসাগরের দিকে চলেছে রানা। দূরে ঢলে পড়েছে সূর্য। সব ছায়া এখন দীর্ঘ। পশ্চিম আরবের আকাশে উজ্জ্বল সাদা রোদের বদলে মেঘে লাল-হলদে আভা।

দুবাইবাসীর আরও আধুনিক হওয়ার আগ্রহে কিছু দিন আগে চালু করা হয়েছে মোনোরেল, দেখার মতই সুন্দর। গোটা শহর ভেদ করেছে, কিন্তু বিশেষ এই লাইন গেছে উপকূলে।

বহু দূরে গন্তব্য দেখছে রানা।

ওই যে আকাশে নাক তুলেছে অদ্ভুত রূপসী বুর্জ আল আরব। উঠে গেছে পুরো এক হাজার বায়ান্ন ফুট ওপরে। ওটা বসে আছে মানুষের তৈরি এক দ্বীপে। কীলক আকৃতির হোটেল দেখলে মনে হবে, ওটা আসলে মস্ত এক ফুলে ওঠা পাল। পশ্চিমে খাড়া উঠে গেছে মাস্তুলের মত। পুবে মোটা পেটের মত নেমেছে মাটির দিকে, যেন স্পিন্যাকারের পাল। দালানের ওপরে মস্ত জাহাজের ব্রিজের মত অংশ প্রকাণ্ড পাখির দু'ডানার মত। এদিকের ছাতে হেলিপ্যাড ঝুলছে সাগর থেকে কমপক্ষে আট শ' ফুট ওপরে।

মুগ্ধকর যত আর্কিটেকচারাল ডিযাইন দেখেছে রানা, এই হোটেল তার অন্যতম। একটু আগে পেছনে রেখেছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দালান বুর্জ খালিফা, মস্ত কোনও পেরেক যেন।

ওটা আর বুর্জ আল আরব হোটেলের মধ্যে তুলনা করে একটাকে ভোট দিতে বললে, উঁচু পেরেকের মত ওই দালানের বদলে এই হোটেলকেই বেছে নেবে ও।

চুপ করে ওটার দিকে চেয়ে আছে রানা।

কিন্তু চুপ থাকার অভ্যেস নেই ওর পাশের লোকটার। 'প্লেন থেকে নামার পর স্রেফ নরকে পড়েছি।' সিল্কের টাই নাড়ল সে। 'এত গরম কেন? ভাবতে পারিনি এমন হবে!'

'আমরা আছি মরুভূমির ভেতর,' বলল রানা। 'আর এখন জুলাই মাস।'

'গুড,' রানাকে দেখল ব্যবসায়ী। 'সবসময় চারপাশে চোখ রাখো তুমি! সিকিউরিটি বিযনেসে এটা দরকার।' কর্কশ হাসল লোকটা।

এসব কথার ভেতর কৌতুকটা কী, বুঝল না রানা। একবার ভাবল, দেব নাকি মাতাল শালার পিঠ চাপড়ে! না, বোধহয় উচিত হবে না। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'ঠিকই বলেছেন, স্যর।'

আন্তর্জাতিক ড্রাগ বিযনেসে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ক্যালিফোর্নিয়ার মস্তবড় ব্যবসায়ী জন এফ. হার্বার্ট চলেছে মোনার মিটিঙে যোগ দিতে। এনআরআই চিফের সঙ্গে আলাপে ঠিক হয়েছে, এই লোকের সিকিউরিটি দেখার দায়িত্ব নেবে রানা। ওই কাজ যেন করতে পারে, সেজন্যে লোকটার সিকিউরিটি গার্ডকে ভালমন্দ খাইয়ে খারাপ করে দেয়া হয়েছে তার পেট। আপাতত সে হাসপাতালে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে রানা এজেন্সি থেকে রানাকে ভাড়া করেছে জন এফ. হার্বার্ট। তারপর থেকে আফসোস করছে রানা। আটচল্লিশ ঘণ্টা টিকবে কি না, ঠিক নেই। যখন-তখন নোংরা সব কৌতুক শুনে মনে হচ্ছে, এক ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে দেবে ব্যাটার।

ঘুরে মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশনের হোস্টের দিকে তাকাল হার্বার্ট। আরবকে পছন্দ হয়নি। পোশাকের নাম কাণ্ডুরা, আসলে দীর্ঘ আলখেল্লা। ওই একই জিনিস গায়ে চাপিয়ে শয়তান জাদুকরের মত ঘুরছে সবাই! আবার পট্টি বেঁধেছে মাথা পেঁচিয়ে।

'এদিকে রিয়াল এস্টেটের দাম কেমন?' জানতে চাইল হার্বার্ট। 'আমাদের সিলিকন ভ্যালির আশপাশে মোতার মত জায়গা চাইলে, লাগবে কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলার।'

করুণ হাসল আরব, অসহায় চোখে দেখল রানাকে।

জবাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ থাকল রানা। কিছুই করার নেই, লাথি মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিতে পারবে না আপদটাকে।

'আপনি চাইলে ভাল কোনও ব্রোকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি,' খুব বিনীত স্বরে বলল আবু আল নাসের।

'তা-ই করুন,' খুশি হলো হার্বার্ট। 'শুনেছি পাম গাছের মত দেখতে এক দ্বীপ তৈরি করেছেন আপনারা? ওখানে হয়তো জমি কিনে নেব।'

মাথা দোলাল আরব।

রানার দিকে ফিরল হার্বার্ট। 'জমি কিনব ভাবতে গিয়ে ভালই লাগছে।'

চুপ থাকল রানা। ভাবছে, ডক্টর মোবারক ও মোনার কথা। কঙ্গোতে গোপন কী এক গবেষণা করছিল বাপ-বেটি। ওটার জন্যেই এক সঙ্গে ছিল তারা। আবার ওটার কারণেই আলাদা হয়ে গেছে। ওর বাবার মতই ল্যাবে বেশিরভাগ সময় কাটাত মোনা। ওকে নিজ হাতে সব শিখিয়ে দিতেন মোবারক।

কঙ্গোর জেনারেলরা আরও চাপ তৈরি করলে বাধ্য হয়ে একা ল্যাবে কাজ করতে শুরু করেন তিনি। সেটা কি মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে? নাকি কিছু গোপন করতে চেয়েছিলেন মেয়ের

কাছ থেকে?

কঙ্গোয় কিছু জিজ্ঞেস করার পরিবেশ ছিল না। এখন কয়েক বছর পর ডক্টর মোবারকের ডিভিডি দেখার পর খচ-খচ করছে রানার মন। অনেক আগে থেকেই হয়তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন মোবারক।

বাবার ছায়া থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব ক্যারিয়ার গড়ে নিয়েছে মোনা। যে-কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে, সেটার পুরনো এক উদ্যোক্তা ওরই বাবা। পরিচিত অনেকেই ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, এটা খুব স্বাভাবিক।

ক্রোয়েশিয়ার হোটেলে ভেবেছিল রানা, কো-ইনসিডেন্স বিশ্বাস করে না। ডক্টর মোবারক, মোনা বা মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশন সবই যেন একই সুতোয় বাঁধা। কিন্তু পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

দশ মিনিট পর ওরা পা রাখল রূপসী হোটেল বুর্জ আল আরবের লবিতে। ওখানেই বিদায় নিল আরব হোস্ট। ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশনের স্টাফ সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে হোটেলের প্রকাণ্ড এক হলরুমে নেয়া হলো হার্বার্টকে। তার সঙ্গে থাকল রানা। গোপন তথ্য দেয়া হবে বলে ওখানে আইনী কাগজে সই দিতে হলো ব্যবসায়ীকে। সঙ্গে রেকর্ডিং ডিভাইস বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট নেই, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্ক্যান করা হলো ওদেরকে। হার্বার্টের সামনে ধরা হলো প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ। ওটার ভেতর ব্ল্যাক বেরি মোবাইল ফোন ও আই ফোন রাখল ব্যবসায়ী।

এরপর রানা ও হার্বার্টকে তোলা হলো একটা এলিভেটরে। ওটা সরাসরি উঠে এল হোটেলের টপ ফ্লোরের বলরুমে। দরজা খুলে যেতেই সামনে পড়ল হলুদ টাইলস বসানো হলরুম। মেঝে

থেকে শুরু করে সিলিং পর্যন্ত জানালা দিয়ে আসছে শীতল নীল আলো। জানালার ওদিকে বহু নিচে পারস্য উপসাগর। চারপাশে ফিসফিস করে আলাপ করছেন একদল মিলিয়নেয়ার। কারও কারও হাতে বেলুগা ক্যাভিয়ার, বা শ্যাম্পেনের গ্লাস।

বডিগার্ডের পাশে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল হার্বার্ট। রানা বলল, 'এরা যথেষ্ট সতর্ক, স্যর। এখন যাচ্ছি চারপাশ দেখে আসতে। আপনার সিকিউরিটির জন্যে কোনও হুমকি বা হোটেলের দুর্বলতা দেখলে দেরি না করে এসে জানাব।'

কর্কশ হাসল হার্বার্ট। 'গুড! তবে মনে করি না কোনও বিপদ হবে। সিকিউরিটি ঠিক রাখার জন্যে নাম আছে এদের। তোমাকে কেন এনেছি জানো? নিজের কাজের লোক থাকলে দাম বাড়ে মালিকের। ...যাও, কয়েকটা ড্রিঙ্ক নিয়ে কোথাও গিয়ে বসে পড়ো। সত্যি কোনও মেয়েকে বাগিয়ে ফেলতে পারলে তোমাকে বাড়তি বোনাস দেব।'

তিক্ত মন নিয়ে সরে এল রানা। পরীক্ষা করে দেখল কয়েকটা দরজা ও হলওয়ে। দালানের পুবের কাঁচের দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। নিচে দুবাইয়ের উপকূল। দূরে শহরের ঝিকমিক করা নানান রঙা বাতি। হোটেলের ওপরে ছাত থেকে বেরিয়ে এসেছে বৃত্তাকার হেলিপ্যাড, ওখানে জ্বলছে অনেকগুলো ফ্লাডলাইট।

রানার সামনে থামল এক ওয়েটার। তার ট্রে থেকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিল ও। দ্বিতীয় ওয়েটার এসে বাড়িয়ে ধরল আরেক ট্রে। ওটার ওপর চোখ বোলাল রানা। পাতলা ক্র্যাকার ও ফোই গ্রাস দেয়া ক্যাভিয়ার। মাথা নাড়ল ও, লাগবে না।

ওয়েটার আরেক দিকে যেতে হলরুমে চোখ বোলাল রানা। প্রকাণ্ড ঘরে জড় হয়েছে একদল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ও মেডিকেল প্রফেশনাল। মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশন যা-ই বিক্রি

করতে আগ্রহী হোক, তা কেনার জন্যে হাজির হয়েছে নামকরা সব ব্যবসায়ীরা।

অন্তত দশটা দেশের সেরা বড়লোক এই হলরুমে উপস্থিত। হার্বার্ট ও কয়েকজন আমেরিকান ব্যবসায়ী ছাড়াও রয়েছে মিডল ইস্টের ক'জন। তাদের পোশাক আলাদা। আরও রয়েছে চাইনিজ, জাপানিজ ও রাশান ব্যবসায়ীরা।

একবার নিজের পোশাক দেখে নিল রানা। ওয়েটারদেরকে বাদ দিলে এখানে সবচেয়ে গরীব মানুষ ও।

চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে পোডিয়ামের কাছে মোনাকে দেখল রানা। মেয়েটার পরনে সাদা ককটেইল ড্রেস। হালকা হয়ে আসা ধূসর চুলের এক মধ্যবয়স্ক লোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে নিচু স্বরে। বার কয়েক মাথা দোলাল। একজন এসে হ্যাণ্ডশেক করতেই তাকে উপহার দিল মিষ্টি হাসি।

মাত্র কয়েক বছরেই সত্যিকারের মহিলা হয়ে উঠেছে মোনা। আরও আকর্ষণীয় হয়েছে চেহারা। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। সবার মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু।

পাশের ভদ্রলোককে কিছু বলল। আরও কয়েকজন এগিয়ে যেতেই তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। কাজটা শেষ হতেই ওর চোখ পড়ল রানার চোখে। স্থির হয়ে গেল মেয়েটা, বড় করে একবার শ্বাস নিল। কেমন যেন অসহায় হয়ে উঠল চেহারা।

রানা বুঝল, ওকে এখানে আশা করেনি মোনা।

মোনার কাঁধে টোকা দিল ধূসর চুলের ভদ্রলোক। দু' সেকেণ্ডে নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। আবার শান্ত হলো চোখ। ভাল করেই জানে, এই মিটিঙের একমাত্র আকর্ষণ ও নিজে।

তখনই নিভু নিভু হলো হলরুমের সব বাতি। ধূসর চুলের ভদ্রলোকের পাশে নেমে পড়ল মোনা প্ল্যাটফর্ম থেকে। একদল

লোকের ভেতর তাদেরকে হারিয়ে ফেলল রানা। হলরুমের শেষ মাথায় চালু হলো প্রকাণ্ড দুই প্লাযমা স্ক্রিন মনিটর। সিলিং থেকে নেমে আসছে নিঃশব্দে। স্পিকারে শোনা গেল জলতরঙ্গের মত বাজনা।

শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান।

গত কয়েক বছরে জরুরি কিছু আবিষ্কার করেছে মোনা।

সেটাই বিক্রি করতে চাইছে মার্ভেল ড্রাগ্‌স্ কর্পোরেশন।

অন্যদের সঙ্গে মিশে প্লাযমা স্ক্রিন মনিটরের দিকে পা বাড়াল রানা।

আঠারো

বৈরুত এয়ারপোর্টে পৌঁছে ধূসর এক গাড়িতে চেপে আমেরিকান এম্বেসিতে হাজির হলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান ও এজেন্ট এলেনা রবার্টসন।

সিকিয়োর কমিউনিকেশন রুমে পৌঁছেই বসকে বলল এলেনা, 'আমার মনে হচ্ছে না এই মিশনের জন্যে রানা উপযুক্ত লোক।'

'জানতাম, এই কথাই বলবে,' বললেন ব্রায়ান, 'যুক্তি দিয়ে বোঝাও। ...তার আগে শুনে নাও, বাংলাদেশি ওই যুবক পৃথিবীর সেরা গুপ্তচরদের একজন। সিআইএ থেকে অনেকে চেয়েছে ওর মৃত্যু হোক। তার ভেতর ছিল সিআইএ ডেপুটি চিফও। আলাস্কায় ভয়ঙ্কর এক দানব তৈরি করতে গিয়ে

বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। নিজেই ফেঁসে যায়। দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আদালতের রায় অনুযায়ী পঞ্চাশ বছর জেল খাটতে হতো। জান হাতে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ধরা পড়লে সারাজীবনে বেরোতে পারবে না কারাগার থেকে। এর আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু মাসুদ রানার টিকিও স্পর্শ করতে পারেনি কেউ, বরং পড়েছে মস্ত সব বিপদে।'

'কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে এবার জড়িয়ে যেতে পারে বিপদে,' আপত্তির সুরে বলল এলেনা। বুকে অসুস্থ অনুভূতি। মন বলল, খুবই প্রিয় মানুষটার পিঠে ছোরা বসাচ্ছে। কিন্তু এ-ও ঠিক, ওর অন্তর বলছে, রানার ক্ষতি হওয়ার আগেই ওকে সরিয়ে দেয়া উচিত। 'বিজ্ঞানীর খুনের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে...'

এলেনার কথাটা উড়িয়ে দিলেন ব্রায়ান, 'ওর দেশের লোক ডক্টর মোবারক, প্রতিশোধ নিতে চাইলে দোষ দেব না।'

'প্রিয় যে কারও জন্যে ভয়ঙ্কর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

'যে-কোনও ভাল মানুষ তা-ই করবে। তুমিও তার ব্যতিক্রম নও।'

বসের চোখে চোখ রাখল এলেনা। 'বিসিআই থেকে বলা হয়েছে, এই মিশনে রানা কাজ করবে এক শর্তে। মিশন সফল হলে এরপর ওকে খুনের চেষ্টা করবে না আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা।'

'আপত্তি তোলেননি কোনও ইন্টেলিজেন্স চিফ,' বললেন ব্রায়ান। 'কথা হয়েছে প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও। প্রয়োজনে রানার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন তিনি। এই মিশনে ওকে সাহায্য করবে তুমি। নাকি এই মিশন থেকে সরে যেতে চাও?'

'না, তা নয়। কিন্তু পরিচিত এক মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে ওর। নিজের মনকে সামলে রাখতে পারবে রানা?'

'ঝুঁকিটা তো রানাকেই নিতে হবে, নাকি?'

চুপ থাকল এলেনা।

ব্রায়ান আবারও বললেন, 'রানা আর তোমার সম্পর্কে কোনও লুকাছাপা নেই। দু'জনের মাঝে কোনও মেয়ে এলে, সেক্ষেত্রে কী করবে, তা স্থির করবে তোমরাই।'

'আমি ভাবছি কীভাবে সফল হবে এই মিশন,' বলল এলেনা। 'বিপদের সময় ওই মেয়ের জন্যে দ্বিধায় পড়তে পারে রানা।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন ব্রায়ান, 'আশা করি তখন পাশে থাকবে তুমি, ওকে সাহায্য করবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে।'

অস্থির লাগছে এলেনার। রানা আর মোনার পুরনো প্রেম জেগে উঠলে, তখন কী হবে? টের পেল, নিজের ব্যক্তিগত কারণে ও চাইছে এই মিশন থেকে সরে যাক রানা।

চুপ করে থাকল। এ বিষয়ে আর কিছু বললেন না ব্রায়ানও।

একটু পর ভার্জিনিয়ার এনআরআই হেডকোয়ার্টার থেকে যোগাযোগ করল মেডিকেল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ডক্টর লাউ আন। স্ক্রিনে দেখা গেল যুবকের পরনে সাদা ল্যাব কোট, চোখে রিমলেস চশমা। অবাক হলো এলেনা। এখন যুবকের কোমরের হোলস্টারে পিস্তল।

গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইলেন ব্রায়ান, 'তুমি সশস্ত্র কেন, আন?'

'আপনি বলেছেন, কেউ কোয়ারেন্টাইন থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে যেন গুলি করি, তাই এই ব্যবস্থা,' বলল যুবক।

একবার এলেনাকে দেখলেন ব্রায়ান। আবার স্ক্রিনের দিকে ফিরলেন। 'বুঝলাম। তো এখন পর্যন্ত কাউকে গুলি করেছ?'

একটু বিমর্ষ সুরে বলল আন, 'না, স্যর, কেউ তো বেরিয়ে যেতে চাইল না।'

'ঠিক আছে, পিস্তলটা দিয়ে দিয়ো সিকিউরিটি গার্ডের হাতে। সত্যি গুলি করে দিলে ব্যাপারটা ভাল হবে না। কাজের কথায় এসো। ডেবি ম্যাকেঞ্জির ভাইরাস থেকে নতুন কোনও ডেটা পেলে?'

মাথা নাড়ল লাউ আন, 'প্রথম কথা, স্যর, ডেটা এখনও অসম্পূর্ণ।'

'এদিকে আপনাদের জন্যেই আটকে আছে আমাদের কাজ,' বলল এলেনা।

'তা ঠিক,' সায় দিল আন। 'এখন পর্যন্ত ক্লিনিকালি যা পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে: ওই ভাইরাস সম্পর্কে সব জানতে গেলে সময় লাগবে অন্তত কয়েক বছর। তবে আপনার আনা ডেটা থেকে বুঝতে পারছি, ইউএন ভাইরাসের সঙ্গে মিল আছে ডক্টর মোবারকের সিরিজ ৯৫২-র রেযাল্টের। অদ্ভুত, যে-কোনও প্রাণীর টেলোমার বা জীবনী-শক্তি কমে যায় ৫১%। ইউএন ভাইরাস একটু এদিক-ওদিক করলে জেনেটিকালি মডিফিকেশন সম্ভব। কাজে আসতে পারে জেনেটিক থেরাপির ক্ষেত্রে।'

'এ থেকে কী বুঝব?' বাঁকা সুরে বলল এলেনা।

মুচকি হাসল লাউ আন।

'একটু খুলে বলো তো, বাপু,' বললেন ব্রায়ান।

'হয়তো ইউএন-এর ভাইরাস সুস্থ করবে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত জেনেটিক কোডিং,' বলল আন, 'মানুষের শরীরে কমবেশি এক বিলিয়ন সেল থাকে। দুষ্ট ভাইরাস হামলা করলে একটা একটা করে এসব সেল ঠিক করা অসম্ভব হয়। কিন্তু একটা সেল-এ ঠিকভাবে সুস্থ ডিএনএ বসিয়ে দিলে, ওটাই তৈরি করবে নিজের মত ভাল কোটি কোটি সেল। রোগ সারতেও সময় লাগবে না। যুদ্ধে হেরে পালাবে মন্দ ভাইরাস। অবশ্য, সবসময় যে এক শ' ভাগ সুস্থতা আসবে, এমন না-ও হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা

খুবই বেশি, আগের চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে মানুষটা। অন্তত মরে যেতে হবে না তাকে।'

ব্রায়ান ও এলেনা বুঝতে পারছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লাউ আন। কিন্তু ডক্টর মোবারক টেলোমার কমিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ট্রায়াল ৯৫২-এর রেযাল্ট বিপজ্জনক। ইচ্ছে করলে কমিয়ে দেয়া যাবে মানুষের আয়ু।

'ট্রায়াল ৯৫২-এর রেযাল্টকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'হোস্টের বাইরেও টিকবে ইউএন ভাইরাসের ভেতর ট্রায়াল ৯৫২। থাকবে বাতাসে, জলে, পাখি, অন্য জন্তু, বা কীট-পতঙ্গের দেহে। অ্যারোসলের মত ছড়িয়ে দেয়া যাবে। মিসাইল অথবা আর্টিলারি শেলের মাধ্যমেও। হ্যাঁ, ওই ভাইরাস হতে পারে মারাত্মক এক বায়োলজিকাল অস্ত্র।'

'অর্থাৎ, ইউএন ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে ট্রায়াল ৯৫২-র ক্ষতিকর কোডিং?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

'হ্যাঁ, ফাঁকা জায়গা আছে ইউএন ভাইরাসের ভেতর। ওটা দিয়ে ছড়াতে পারবে ভয়ঙ্কর সব ডিএনএ।'

গলা শুকিয়ে গেল এলেনার। ডক্টর মোবারকের ল্যাবে দেখেছে জীর্ণশীর্ণ সব বুড়ো ইঁদুর। ইউএন ভাইরাসের মাধ্যমে মানব সমাজে ছড়িয়ে গেলে বাঙালি বিজ্ঞানীর তৈরি ট্রায়াল ৯৫২? হয়তো দেখা গেল, আগামী কয়েক বছরের ভেতর বুড়ো হয়ে মরতে লাগল কোটি কোটি মানুষ। এলেনা ভাবল, আমার যা বয়স, এক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছরের ভেতর বুড়ি হয়ে মরব!

'আর কিছু বলবে?' লাউ আনের উদ্দেশে বললেন ব্রায়ান।

মাথা নাড়ল আন। 'আপাতত আর কিছু নয়।'

'ঠিক আছে, অস্ত্র জমা দাও,' বললেন ব্রায়ান। 'প্রতি বারো

ঘণ্টা পর পর যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।'

স্ক্রিন থেকে বিদায় নিল লাউ আন।

এলেনার দিকে ফিরলেন ব্রায়ান। 'তো, নিজে কিছুই করে না ইউএন ভাইরাস। তা হলে, কেন ওটা পাঠাল ওই অফিসে?'

'ভয় দেখাতে,' বলল এলেনা, 'হয়তো ওই একই কারণে খুন হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানী। ওই কাল্টের নেতা এখনও হামলা করতে তৈরি নয়। কিন্তু আত্মা কাঁপিয়ে দিচ্ছে আমাদের।'

'অথচ কিছুই দাবি করছে না সে,' বললেন ব্রায়ান।

'ভাইরাসে রাখার মত উপযুক্ত জিনিস এখনও হাতে পায়নি,' মন্তব্য করল এলেনা।

মাথা দোলালেন ব্রায়ান। 'ডক্টর মোবারক তাদের হাতে তুলে দেন ফাঁকা একটা ভাইরাস।'

'আর সেজন্যেই তাঁকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিল তারা,' বলল এলেনা, 'পরে ধরা পড়লেও মুখ খোলেননি ডক্টর। তখন বাধ্য হয়ে এরা গেছে ওই ল্যাবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ব্রায়ানের মুখ। 'হয়তো পৃথিবীর মস্তবড় বিপদ বুঝে ঠিক সময়ে ওই কাল্টের কাছ থেকে সরে যান তিনি। তাই ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। এক পর্যায়ে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিতে বাধ্য হয়েছেন। আগেই বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন বোমা। জানতেন, গবেষণার কিছুই হাতে পাবে না ওই কাল্ট।'

বস চুপ হয়ে যেতেই বলল এলেনা, 'কিন্তু এমন একজনকে দরকার ওদের, যে কি না ডক্টর মোবারকের গবেষণা শেষ করবে।'

'ডক্টর মোবারকের মেয়ে।'

'ওই মেয়েকেই লাগবে, এমন নয়। আবার এ-ও ঠিক, ডক্টর মোবারকের সঙ্গে বছরের পর বছর কাজ করেছে তাঁর মেয়ে

মোনা।' এলেনার মনে পড়ল, রানা এখন দুবাইয়ে। বসের কাছে জিজ্ঞেস করল, 'আমি চোরাই আর্টের নিলামে যাচ্ছি কেন?'

'কারণ ওখানে বিশেষ কিছু বিক্রি হবে, যেটা চেয়েছিলেন মোবারক ও আবু রশিদ,' বললেন ব্রায়ান। 'মাসুদ রানা এসব ভেবেই পরিচিত এক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমাকে নিলামে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমরা এ কাজ করতে গেলে সমস্যায় পড়ত এনআরআই।'

'কিন্তু ভাইরাসের সঙ্গে ওই আর্টের কী সম্পর্ক?'

'তা খুঁজে বের করা তোমার কাজ,' বললেন ব্রায়ান। 'মাসুদ রানার বন্ধু নাসের আল মেহেদি তোমাকে নিয়ে যাবে ওই নিলামে।'

'আপনি কি জানেন ওটা কোথায় হবে?'

'শহরের মাঝে,' বললেন ব্রায়ান।

এলেনার মনে পড়ল, বৈরুত শহরের মাঝের অংশ বোমায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত। 'ওটা তো নো-ম্যান'স্-ল্যাণ্ড।'

'ওপরে ভাঙাচোরা সব বাড়ি,' মাথা দোলালেন ব্রায়ান। 'কিন্তু তুমি থাকবে শহরের নিচে পাতালে।'

উনিশ

বলরুমের দু'প্রান্তে সিলিং থেকে নেমে এসেছে প্রকাণ্ড দুই প্লাযমা স্ক্রিন। ওই দুই মনিটরে চোখ রাখতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল সবাই। রানা যেখানে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,

সেখান থেকে পরিষ্কার দেখবে একটা স্ক্রিন।

'ওয়েলকাম টু দ্য সিটি অভ দ্য ফিউচার!' বাজনার সঙ্গে মিশে কথা বলে উঠল এক গমগমে কণ্ঠ: 'আপনারা এবার দেখবেন কী হতে চলেছে আপনাদের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতে থাকবে না কোনও অসুখ, থাকবে না জরা; এমন এক ভবিষ্যৎ, যেখানে থাকবে না মৃত্যু।'

স্ক্রিন ভাল করে দেখতে সামনে ঝুঁকল রানা। মনিটরে এক লোক, এইমাত্র এক সুন্দরী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে নেমে এল দারুণ এক ইয়ট থেকে। ধূসর চুলের লোকটার বয়স ষাটের বেশি, কিন্তু তার সঙ্গিনীর বয়স বড়জোর পঁচিশ। ক্যামেরার দিকে হেঁটে এল দু'জন। তখনই বদলে গেল ইমেজ। লোকটার ধূসর চুল হয়ে উঠল কালো, মিলিয়ে গেল মুখের সব ভাঁজ। টানটান হয়ে উঠল শিথিল কাঁধ ও বুক। তাকে আর বয়স্ক মনে হলো না, যেন নতুন করে ফিরে পেয়েছে যৌবন।

গম্ভীর কণ্ঠ এবার বলল: 'মার্ভেল ড্রাগ্‌স্ কর্পোরেশনের সঙ্গে থাকলে ওই ভদ্রলোকের মতই এক শ' বছর বয়সে তাঁর মতই হবেন আপনারা। আজ আপনাদের বয়স হয়তো চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট, কিন্তু হয়ে উঠবেন পঁচিশ বছরের যুবক।'

ক্যামেরাকে পেরিয়ে গেল ইয়টের মালিক। তার আগেই দেখা গেছে, ওই লোকের বয়স বড়জোর পঁচিশ বছর। দেহে এসেছে সুস্বাস্থ্য ও যৌবন। সঙ্গিনী মেয়েটাকে মোটেও বেমানান লাগেনি তার পাশে।

'বৃদ্ধ হওয়া মানেই দেহের সেল মরে যাওয়া। কিন্তু সেলুলার লেভেলে কাজ হলে ফিরে পাওয়া সম্ভব যৌবন। সেটাই অনুভব করবেন আপনারা।'

স্ক্রিনে দেখা গেল সিজিআই অ্যানিমেশন। ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেল। সব ডিএনএর স্ট্র্যাণ্ড, ওখানে দ্বিগুণ হলো হেলিক্স স্প্লিট।

আবারও জোড়া হচ্ছে। পড়ছে চেনের খুদে সব লিঙ্ক। হারিয়ে যাচ্ছে মনিটর থেকে। ওগুলো টেলোমার। দেখতে জুতার ফিতার মত। কিন্তু টেলোমারগুলো হারিয়ে যাওয়ায় থাকল জীর্ণ ফিতা।

'অন্য কোনও ড্রাগ্স্ কর্পোরেশন এমন কিছু আবিষ্কার করেনি, যা পূরণ করে দেবে আপনাদের বয়সের এই ভয়াবহ ক্ষতি। কমাতে পারবে না তারা কারও বয়স বা ফিরিয়ে দিতে পারবে না যৌবন। আর এজন্যেই আমরা সফল। বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা। আপনারা যখন যোগ দেবেন আমাদের পাশে, কিছু দিনের ভেতর আবারও হয়ে উঠবেন শক্তিশালী যুবক। তখন আর তরুণদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না।'

হাততালিতে প্রশংসা ঝরল শ্রোতা-দর্শকদের।

স্ক্রিনে সেলুলার অ্যাক্টিভিটি, তার সঙ্গে নানান লেবেল ও সাবটাইটেল।

এলেনার কাছে শুনেছে রানা, এ বিষয়েই নোট করেছিলেন ডক্টর মোবারক। স্ক্রিনের নিচে গ্রাফিক দেখে চমকে গেল ও। ওখানে লেখা: সিরিজ ৯৫২। বাঙালি বিজ্ঞানীর এক্সপেরিমেন্টের যে লিস্ট পেয়েছিল এলেনা, তার ভেতর সবচেয়ে জরুরি সিরিজ ৯৫২।

মোনার প্রেযেন্টেশনে বলা হচ্ছে: চাইলে দীর্ঘকাল বাঁচতে পারবে মানুষ। বাবার ভাইরাস বিষয়ক ডেটা ব্যবহার করছে মেয়েটা। অথচ ওর বাবা কাজ করছিলেন আয়ু কমিয়ে দিতে।

বুকের ভেতর কেমন যেন রাগ টের পেল রানা।

অত্যন্ত দামি ওষুধ দিয়ে বড়লোকদের আয়ু বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে মোনা। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কী হবে?

ডক্টর মোবারকের এক্সপেরিমেন্টের একাংশ নিয়ে কাজ করছে মোনা বা ওর কর্পোরেশন। ওই একই এক্সপেরিমেন্ট কাজে লাগাতে চাইছে গোপন ওই কাল্ট। হতে পারে না, ওই

কাল্টকে দিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হবে ভাইরাস? তখন কোটি কোটি টাকা খরচ করবে অসুস্থ বড়লোকরা, হুমড়ি খেয়ে পড়বে মোনার সিরাম পাওয়ার জন্যে। তাতে হয়তো সারবে রোগ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাড়বে না আয়ু। তাতে কী? বাঁচা তো গেল!

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। অথবা, ভয়ঙ্কর এক খেলা শুরু করেছে মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশন।

নতুন করে শুরু হলো ভিডিয়ো প্রেযেণ্টেশন। কিছুক্ষণ ওটা দেখে জানালার কাছে সরে গেল রানা। ওখান থেকে চলে গেল হোটেলের সার্ভিস প্যাসেজে। বলরুম থেকে শুনল জলতরঙ্গের মত রিনিঝিনি আওয়াজ। তার মাঝে এল নানান স্পিকারে মিষ্টি কণ্ঠের মেয়েদের আলাপ। ভিড়ে মিশে গেছে সুন্দরী সব মডেল। তাদের কাজ ধনী লোক ও মহিলাদেরকে মুগ্ধ করা।

বলরুমের দিকে মনোযোগ দিল না রানা। হোটেলের পেছনের হল বা দরজা খুলে দেখছে। সামনেই পড়ল প্রেপ রুম, কিচেন ও ফায়ার এস্কেপ। বিপদ এলে, তা আসবে হোটেলের সিকিউরিটির সবচেয়ে দুর্বল অংশ দিয়ে। আবার এদিক দিয়েই সহজ হবে বিপদের সময় বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেক্ষেত্রে আগে থেকে দেখে নেয়া উচিত চারপাশ।

পরের করিডোরের প্রথম দরজা খুলে রানা দেখল, ওটা স্টেজিং রুম। চারপাশ ভরা অডিয়োভিযুয়াল ইকুইপমেণ্ট। দরজা ভিড়িয়ে করিডোরের মাঝে পেল সরু এক স্টেয়ারওয়েল। সিঁড়িটা অনেকটা ফায়ার এস্কেপের মত। যে-কেউ উঠে যেতে পারবে হেলিপোর্টে।

করিডোরের শেষমাথায় ডানের দরজা লক করা। বাম দিকে দেয়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে রানা দেখল, ওর দিকেই আসছে দু'জন। চিনে ফেলল, ধূসর চুলের লোক ও মোনাকে।

হাঁটার ফাঁকে পরস্পরের দিকে তাকাল তারা।

'ওটা পেয়েছি,' মোনার কণ্ঠ শুনল রানা।

'ভুল হয়নি তো কোনও?' জানতে চাইল বয়স্ক লোকটা।

'না।'

আদর করে মোনার গালে চুমু দিল বৃদ্ধ। স্টেয়ারওয়েলে থেমে দ্বিধা করল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল হেলিপোর্টের দিকে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে রানা।

'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' খুব স্বাভাবিক সুরে ওকে বলল মোনা। কয়েক পা বেড়ে রানার সামনে থামল, পুরো আত্মবিশ্বাসী।

'তোমাকে কে বলল আমি কিছু খুঁজছি?' জানতে চাইল রানা।

ওপরের সিঁড়ির দিকে তাকাল মোনা। এখনও শোনা যাচ্ছে ধাপ বেয়ে উঠছে বয়স্ক ওই লোক।

'তুমি সবসময় কিছু না কিছু খুঁজতে,' নিচু স্বরে বলল মোনা।

কেন যেন মেয়েটাকে আর সাহসী বলে মনে হলো না রানার। কাছ থেকে আরও সুন্দরী। কালো চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। জলপাই রঙের ত্বক। সাদা ককটেইল ড্রেসে যেন অপ্সরী।

'আমরা সবাই হয়তো কিছু না কিছু খুঁজি,' বলল রানা।

'একই সঙ্গে খুঁজতে পারি, তুমি চাইলে।'

'একা খোঁজার চেয়ে ভাল,' বলল রানা।

দক্ষ বিক্রেতার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছে মোনার, মনে হলো খুবই অসহায়। যেন জানে না কী করা উচিত।

'বাবা কি আমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন?' জানতে চাইল।

যে সুরে জিজ্ঞেস করেছে, সেটা খেয়াল করল রানা। যেন

কোনও প্রশ্ন নয়। দোষ করে ফেলেছে কোনও। ভাল করেই জানে বড় কোনও বিপদে আছে ওর বাবা। অথচ, নায়িকার মত সময় দিচ্ছে এই রিসেপশনে। রানা বুঝে গেল, মোনা জানে না ওর বাবা আর নেই।

'বাবার সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল।

'ছয় মাস আগে,' বলল মোনা, 'তখনই আবার ঝগড়া হলো। বারোতম বারের মত। তারপর থেকে আর কথা বলিনি আমরা।'

সেক্ষেত্রে ডক্টর মোবারকের নতুন সব ডেটার সঙ্গে ওর ডেটা মেলে কী করে, ভাবল রানা। কোনও প্রশ্ন তুলল না। মিথ্যে বলছে মোনা। নানান কারণেই তা করতে পারে। জানে না, আসলে কী জন্যে এসেছে ও। এখন মেয়েটাকে কোণঠাসা করলে মিথ্যে বলে সত্যকে চাপা দেবে।

'ঝগড়া হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ সরিয়ে নিল মোনা। যেন ভাবছে, কীভাবে শুরু করবে। 'নানান দেশের সিক্রেট সার্ভিস খুঁজছিল বাবাকে, পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আর তাই...'

মোনার সব কথাই শুনবে, কিন্তু আপাতত হাত তুলে বাধা দিল রানা। কোথায় যেন গোলমাল মনে হচ্ছে। চট্ করে দেখল সরু সিঁড়ির দিকে। ধূসর চুলের বয়স্ক লোক ছাতের দরজা খুললে মৃদু হাওয়া আসার কথা। কিন্তু বদ্ধ করিডোরের বাতাসে কোনও কম্পন টের পায়নি ও।

মোনার কনুই ধরে করিডোরের শেষমাথা লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা। বুঝতে পারছে, আবারও বড় কোনও সমস্যায় পড়ে গেছে মেয়েটা। জানতে হবে আসলে কী হচ্ছে এখানে।

'যাদের সঙ্গে মেশেন তোমার বাবা, তাদের সম্পর্কে কতটা জানো?'

‘তেমন কিছুই না। বাবা প্রায় সময় সব গোপন করতেন।’

‘বাবার সঙ্গে তোমার বাধল কী নিয়ে?’

‘জীবন বদলে গিয়েছিল,’ বলল মোনা, ‘ওই জীবনে বাঁচতে চাইনি। বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছে।’

‘একটু খুলে বলো।’

‘আমি এখন মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশনের ডিরেক্টর অভ বোর্ডের একজন,’ আত্মপক্ষের সুরে বলল মোনা, ‘বাবা এখন কর্পোরেশনের কেউ নন, বড়জোর প্রাক্তন মালিকদের একজন।’

‘তাই হিংসে লেগেছিল তাঁর?’

‘না,’ মাথা নাড়ল মোনা। ‘তিনি চিন্তিত ছিলেন।’

‘কেন?’

‘আমরা যা নিয়ে কাজ করছি, সেজন্যে,’ ক্রমেই রেগে উঠছে মেয়েটা। ‘এসব নিয়ে এত প্রশ্ন তুলছ কেন?’

‘কারণ খুব খারাপ কিছু হয়েছে,’ বলল রানা।

রাগ হারিয়ে গিয়ে মোনার চোখে দেখা দিল দুশ্চিন্তা। পিছিয়ে গেল এক পা। কাঁপতে লাগল হাত। ‘প্লিয, রানা! বাবা ঠিক আছেন তো? বলো, তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে, প্লিয!’ বিস্ফারিত চোখে দেখা দিয়েছে অশ্রু।

‘মোনা...’ শুরু করেও থেমে গেল রানা।

করিডোরে দেখা দিয়েছে দু’জন পুরুষ আর এক মহিলা, হাতে ড্রিঙ্ক।

জোর কণ্ঠে মোনার কাছে জিজ্ঞেস করল মহিলা, ‘হোটেলের রেস্টরুমটা কোথায়?’

নিজেকে সামলে স্টেয়ারওয়েলের পাশের দরজা দেখিয়ে দিল মোনা।

ওকে ধন্যবাদ না দিয়েই রেস্টরুমে ঢুকল তারা।

‘আমাকে বলো বাবা এখন কোথায়, রানা,’ বলল মোনা।

‘সরি,’ নিচু স্বরে বলল রানা, ‘পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।’

কথাটা শুনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে গেল মোনা, কিন্তু শক্ত হাতে কনুই ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখল রানা।

চোখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটা। চোখ থেকে স্রোতের মত নামছে অশ্রু। ফিসফিস করে বলল, ‘কেন? কী করে?’

‘যার হয়ে কাজ করছিলেন, খুন হন তার লোকের হাতেই,’ বলল রানা। ‘সাহায্য চেয়ে মেসেজ দিয়েছিলেন।’

‘তুমি সাহায্য করোনি?’ করুণ সুরে জিজ্ঞেস করল মোনা। যেন ভাবছে, আগের মত রানা সরিয়ে নেবে ওর বাবাকে। ‘কেন বাঁচালে না বাবাকে, রানা?’

‘খবর পেয়েছি দেরিতে।’

ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মোনা। পিছিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ওর বাহু ধরে রাখল রানা। ভাবল, নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলবে মোনা। আর তখনই হলওয়ে থেকে এল জোর আওয়াজ। স্টেয়ারওয়েলের ওপরের সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নামছে একটা দেহ!

ধূসর চুলের ওই বয়স্ক ভদ্রলোক!

ধুপ করে পড়ল ল্যাণ্ডিঙে। দু’হাতে চেপে ধরেছে গলা। ফাঁক হয়ে যাওয়া চওড়া ক্ষত থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত!

দৃশ্যটা দেখার আগেই খপ করে মোনাকে ধরে এক অ্যালকোভে ঠেলে দিল রানা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই দুই লোক ও মহিলা।

তাদের একজন ছুটে গেল ধূসর চুলের ভদ্রলোককে সাহায্য করতে। বুঝতে পারেনি কী ঘটে গেছে। সামনে পৌঁছেই গলা ছাড়ল: ‘আরে, এসব কী হচ্ছে...’

মাত্র বলেছে কথাটা, এমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকে এল

একরাশ গুলি।

দেরি হয়ে গেল বুঝতে, লাশ হয়ে গেল লোকটা ওখানেই।

এক হাতে মোনার মুখ চেপে ধরল রানা, পরের সেকেণ্ডে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের অডিয়োভিয়্যুয়াল ইকুইপমেন্ট ভরা স্টোররুমে। দরজা আটকে দিয়ে থামল এক টেবিলের ওপাশে। মেয়েটাকে নিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

'কী হচ্ছে এসব, রানা?' কাঁপা গলায় বলল মোনা।

'চুপ করে অপেক্ষা করো।'

'কিন্তু...'

রানার কঠোর চোখ দেখে বিপদের মাত্রা বুঝল মোনা।

বাইরে কোনও আওয়াজ নেই। কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর দপ করে নিভে গেল বুর্জ আল আরব হোটেলের একাশি তলার সব বাতি, আঁধার করিডোরে কর্কশ শব্দে চালু হলো সাব-মেশিনগান ও অটোমেটিক রাইফেল।

বিশ

বিধ্বস্ত বৈরুত শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় এলেনার মনে হলো, ও আছে এক পরাবাস্তব জগতে। অনেকেই জানে, প্রায় তিরিশ বছর ধরে লড়াই চলেছে এই দেশে। হামলা আর প্রতিহামলার কারণে শেষ ছিল না নাগরিকদের কষ্টের। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যা জানে না, তা হচ্ছে, একসময় এই বৈরুত ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর, এখানে ছিল নানান জাতের মানুষের

আধুনিক সংস্কৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ শহর ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টানদের। দু'ধর্মের মানুষের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ক্ষমতা ভাগাভাগি করে চলতে সমস্যা হয়নি। এভাবেই পেরিয়ে গেছে বিশ বছরেরও বেশি। আধুনিকভাবে গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক এলাকা, বাড়ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তার ওপর তো আছেই ঐতিহ্যবাহী পর্যটন শিল্প।

ওই অদ্ভুত আনন্দের বিশ বছর বৈরুত ছিল আরব দেশগুলোর সঙ্গে পশ্চিমা সব দেশের যোগসূত্র। মোনাকো বা দক্ষিণ ফ্রান্সের মতই বৈরুতের ক্যাসিনোতে হাজির হতো ইউরোপিয়ানরা। এই শহর ছিল ইউরোপে ঢোকার উপায়, আবার এটাই ছিল মিডল ইস্টে যাওয়ার সহজ পথ।

কিন্তু এরপর এল দুঃসময়। খ্রিস্টানদের চেয়ে দ্রুত বাড়তে লাগল মুসলিমদের জনসংখ্যা। মুসলিম নেতারা চাইলেন, তাঁদেরকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। সন্দেহের ভেতর পড়লেন খ্রিস্টান নেতারা। মাত্র কয়েক দিনের ভেতর এই শহর ও দেশের বুকে নেমে এল দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ। এমনই এক যুদ্ধ, যেটাতে জড়িয়ে গেল সিরিয়া, ইজরায়েল ও ইউনাইটেড স্টেট্স্।

বদ্ধ উন্মাদের মত লড়াইয়ের প্রথম দশকে ভাগ করে নেয়া হলো শহর। একদিকে খ্রিস্টানরা, অন্যদিকে মুসলিমরা। মাঝে ফাঁকা জায়গা। ওটা হলো অলিখিত নো-ম্যান'স্-ল্যাণ্ড।

দু'পক্ষ থেকেই চেষ্টা হলো, যাতে নতুন করে গড়ে তোলা যায় শহর। নিজেদের দলের আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়ল সাধারণ মানুষ। ফাঁকা জমির ওদিকের শত্রুদের দিকেও রাখা হলো নজর।

একসময় নিজেদের সব হতাশা, দুঃখ, হিংসা বা ঘৃণাকে কাটিয়ে আবারও একে অপরকে বুকে টেনে নিল লেবানিজরা।

বারবার এসেছে তীব্র সব ভূমিকম্প, আগ্রাসী হয়েছে ভিন দেশ, দখল করেছে বৈরুত, মাটিতে মিশে গেছে শহর ভয়ানক আগুনে, কিন্তু দমে যাওয়ার মানুষ নয় ওরা।

রুপালি এসইউভিতে (স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিক্‌ল্‌) চেপে শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিটি ব্লকে এলেনা দেখল একের পর এক ক্রেন। রাস্তায় কাজ করছে বুলডোযার ও নানান ইকুইপমেন্ট। জ্যাম লেগে যাচ্ছে ওগুলোর জন্যে। হর্ন বাজিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে ড্রাইভাররা। কিন্তু থেমে নেই উন্নয়নের ধারা, নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক শহর।

মুসলিমদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় নতুন সব হোটেল ও অফিস বিল্ডিং দেখল এলেনা। ওকে নিয়ে গাড়ি চলেছে সাগর তীর ঘেঁষে। পিজিয়ন্স রক পেরিয়ে পৌঁছে গেল সেইন্ট জর্জ ইয়ট ক্লাবে।

ব্যস্ত এলাকা, বন্দরের নানাদিকে নোঙর করেছে এক শ' ফুটের সব ইয়ট। আরও একটু বাইরের দিকে মৃদু ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে আশি ফুটের সব সেইলবোট ও ছোট সি-ক্রাফট।

গাড়ি পার্ক করে পিয়ারে উঠে চকচকে এক নীল মোটর ইয়টের সামনে হাজির হলো এলেনা। ইয়টের পাশে লেখা: *আলিবাবা*। ওটার ডেকে ওঠার আগেই গার্ডকে দেখাতে হলো ক্রেডেনশিয়াল। কাগজপত্র পরীক্ষা করে পথ ছেড়ে দিল লোকটা। এবার দ্বিতীয় এক লোক এসে এলেনাকে নিয়ে গেল ডেকের ছাউনি দেয়া এক জায়গায়। ছোট একটা টেবিলে খাবার নিয়ে ব্যস্ত নাসের আল মেহেদি।

পরনে তার বুক খোলা শার্ট। পেট-বুক ভরা কালো রোম। গলার কাছে ঝুলছে ভারী কয়েকটা সোনার চেন ও লকেট। এলো চুল উড়ছে মৃদু হাওয়ায়। মেহেদির দুই পাশে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দু'জন বডিগার্ড।

এলেনা টেবিলের কাছে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলল মেহেদি, 'আপনি এলেনা রবার্টসন।'

'আর আপনি কণ্ট্রাক্টর নাসের আল মেহেদি,' বলল এলেনা, 'মিস্টার রানার বন্ধু।'

'দুটোই হতে পেরে খুশি,' হাসল মেহেদি। হাতের ইশারায় পাশের চেয়ার দেখাল। 'প্লিয, বসুন।'

এলেনা বসার পর নিজের চেয়ারে বসল মেহেদি। তার ইশারায় এসে সুন্দর একটা গ্লাসে এলেনার জন্যে পানি ঢেলে দিল এক ওয়েটার।

একবার মিস্টার মেহেদি, আরেকবার বডিগার্ডদেরকে দেখে নিয়ে বলল এলেনা, 'আমরা এখানে গোপনীয় বিষয়ে আলাপ করতে পারি?'

রানার বন্ধু মাথার ইশারা করতেই দূরে গিয়ে থামল দুই বডিগার্ড। এখন আর কিছু শুনতে পাবে না।

'মিস্টার রানা কি আপনাকে বলেছেন কেন এসেছি?'

'আপনি নিলামে অংশ নেবেন... এমন কিছু জিনিস, যেগুলো বাজারে পাওয়া যায় না।'

'আপনি জানেন কোথায় হবে এই নিলাম?' জানতে চাইল এলেনা।

'জানি,' বলল মেহেদি। 'আপনি নিলামে অংশ নেবেন, না শুধু দেখার জন্যে?'

'দুটোই হতে পারে,' বলল এলেনা, 'আবু রশিদ ও মোবারক নামের দু'জন লোক বিশেষ কিছু চেয়েছিলেন। আমি সেসব পারলে কিনে নেব।'

'রানা বলেছে, টাকার ব্যবস্থা করে দেবে আমেরিকান সরকার, ঠিক?'

'হ্যাঁ। আপনি কি জানেন জিনিসগুলো কী?'

'এখনও না। অবশ্য শুনেছি, আবু রশিদ ওগুলো হারিয়ে ফেলেছিলেন অনেকদিন আগে। নতুন করে ফিরে পেতে চাইছেন।'

মাথা দোলাল এলেনা। 'আপাতত তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে খুন হয়ে গেছেন মিস্টার মোবারক। ওই নিলামে অংশ নিতে চেয়েছিলেন দু'জনই। ওখানে গেলে হয়তো জানব কী হয়েছে তাদের।'

'তো তাদের পেছনে লেগেছে অন্য কেউ?' আনমনে বলল মেহেদি।

'কেউ নয়, একদল লোক,' শুধরে দিল এলেনা।

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। ওরা একটা কাল্টের লোক, ধ্বংস করতে চায় সব ধর্মের স্রষ্টাকে।'

হেসে ফেলল মেহেদি। 'মানুষকে আবার কীসের ভয় স্রষ্টার?'

'স্রষ্টার ভয় নেই, কিন্তু সেই সাথে মানুষের ক্ষতি করবে ওরা।'

ঠোঁটের কাছে পানির গ্লাস তুলেও থেমে মাথা দোলাল ব্যবসায়ী। পড়ে গেছে চিন্তার ভেতর। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আপনি কি জানেন, আসলে কেন সঙ্গে রাখি বডিগার্ড?'

আঁচ করতে পারল এলেনা। মুখে কিছু বলল না।

'যাতে খামোকা খুন না হয়ে যাই,' বলল মেহেদি, 'আমরা লেবানিজরা মিলেমিশে থাকতে পারব। কিন্তু সিরিয়া, ইজরায়েল বা ইরানের সরকারি এজেন্টরা চাইছে আমাদের ভেতর লড়াই চলতে থাকুক। কাজেই সাবধান না হয়ে উপায় নেই। রানা আমার পুরনো বন্ধু। ওর বান্ধবী আপনি। নিরাপদে ওই নিলামে আপনাকে পৌঁছে দেয়া বা আবার ফিরিয়ে আনা আমার দায়িত্ব।

আপনার প্রশংসা শুনেছি ওর মুখে। কখনও মিথ্যা বলে না ও।'

'আমাকে সঙ্গ দিতে হবে, এমন কথা নেই,' বলল এলেনা। 'আপনি শুধু ওই নিলামে পৌঁছে দিয়ে জানিয়ে দেবেন, ওখানে কীসের ওপর চোখ রাখতে হবে। বাকি কাজ আমি করব।'

মাথা নাড়ল মেহেদি। 'তাতে সন্দেহ করবে অনেকে।'

'আমি মহিলা বলে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল এলেনা।

'না,' মৃদু হাসল কন্ট্রাক্টর। 'কারণ আমি না গেলে ওরা সন্দেহ করবে।'

'ও।'

'আমরা কেউ লোভ থেকে মুক্ত নই, ভাল কিছু পেলে কিনব না কেন?'

'বুঝলাম। নিলাম হবে কখন এবং কোথায়?'

'সন্ধ্যার আযানের পর নামাজ শেষ হলে শহরের ওদিকে একদল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব,' বলল মেহেদি। 'তারপর দেখতে পাবেন আবু রশিদ কী হারিয়ে ফেলেছিল।'

একুশ

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যেতেই বাধা পড়েছে ভিডিয়ো প্রেযেন্টেশনে। বলরুমে জলতরঙ্গের মিউযিক নেই, হৈ-চৈ করছে অন্তত বিশজন ব্যবসায়ী ও সুন্দরী মডেল। কিন্তু তাদের গলা ছাপিয়ে উঠল অটোমেটিক অস্ত্রের হুঙ্কার। শুরু হয়েও থামল ক'জনের করুণ আর্তচিৎকার।

‘বাইরে এসব কী চলছে?’ আবারও জানতে চাইল মোনা।

ভাল করেই জানো কী হচ্ছে, ভাবল রানা। নিচু স্বরে বলল, ‘ভুল না হয়ে থাকলে এদের হয়েই কাজ করছিলেন তোমার বাবা।’

আরেক পশলা গুলি হতেই করিডোর কাঁপল প্রতিধ্বনিতে।

‘এরা মানুষ মেরে ফেলছে,’ বেসুরো কণ্ঠে বলল মোনা।

কোনও সন্দেহ নেই রানার। মুখে বলল, ‘মনে হয় না। আসলে ওরা খুঁজছে তোমাকে।’

‘আমাকে?’

‘তোমার বাবাকে তুলে নেয়ার পর তাঁর ল্যাবে গিয়েছিল। ওখানে সবকিছু পায়নি।’

‘তাই এরা ভাবছে সেসব থাকবে আমার কাছে?’ কাঁপা গলায় জানতে চাইল মোনা। আগেও এই সুরে কথা বলেছে, মনে পড়ল রানা। তখন রিপাবলিক অভ দ্য কঙ্গো ত্যাগের আগে এমনই ভয় পেয়েছিল।

রানা নিজেকে চেনে। মোনাকে অবিশ্বাস করছে, কিন্তু কোনও মতেই ওই কাল্টের হাতে ওকে পড়তে দেবে না। ছবিতে দেখেছে মেয়েটার বাবাকে কী করেছে তারা।

বলরুম থেকে এল ছোট একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

‘এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব না আমরা,’ বলল মোনা।

একই কথা ভাবছে রানা। একটু পর চালমাত হবে, ছুটে আসবে হোটেল সিকিউরিটি, তার কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছুবে দুবাইয়ের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ফোর্স। তার আগেই মোনাকে চাই এদের, প্রথম সুযোগে নিজেদের হেলিকপ্টারে তুলবে ওকে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে: বলরুমের আশপাশের করিডোর ও দু’ পাশের ঘর দেখার পর এদের বেশিক্ষণ লাগবে না মোনাকে খুঁজে বের করতে।

অস্ত্রের খোঁজে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। দেখল দেয়ালের কাছে দীর্ঘ, সরু এক প্যানেলে বাতি— জায়গাটা রেকর্ডিং স্টুডিয়োর মিক্সিং রুম। অডিয়োভিযুয়াল ডিসপ্লের কণ্ট্রোল এখনও আলোকিত। বিদ্যুৎ যায়নি।

কাল্টের লোক কেটে দিতে পেরেছে বাতির লাইন, অথবা সহজেই অফ করেছে মেইন সুইচ। কিন্তু যত প্ল্যানই করা হোক, বুর্জের মত বড় হোটেলের সব বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দেয়া খুবই কঠিন কাজ।

'চাই না আমার জন্যে অন্যরা মরুক,' বলল মোনা।

'একবার তোমাকে হাতে পেলে তোমার মাধ্যমে কোটি মানুষ খুন করবে ওরা,' বলল রানা, 'কথাটা ভেবে দেখেছ?'

রানার বক্তব্য যেন বুঝতে পারেনি মোনা, অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। আবছা আলোয় ওকে দেখল রানা। মনে হলো না অভিনয় করছে মেয়েটা।

বাইরের করিডোরে বেশ কয়েকজনের চিৎকার। ক্রল করে প্যানেলের কাছে গেল রানা। বুঝে পেল না, কীভাবে ব্যবহার করবে সামনের প্যানেল। আন্দাজে অন করল আট-দশটা সুইচ, চাপ দিল কয়েকটা বাটনে। ভাবল, ডানের পাশাপাশি দুই লিভার চালু করবে স্পিকার ও বাতি। লিভার ওপরে তুলে দিল ও।

বলরুমে আবারও চালু হলো জলতরঙ্গের মত বাজনা। লিভার পুরো ওপরে ঠেলে দিল রানা। পাশেই দানবীয় এক ডিভিডি প্লেয়ার পেয়ে টিপে দিল প্লে বাটন।

অন্তত এক শ' গুণ জোরে বাজতে লাগল জলতরঙ্গের বাজনা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গমগমে গলায় বলতে লাগল সেই লোক: 'ওয়েলকাম টু দ্য সিটি অভ দ্য ফিউচার!'

যেন ফাটিয়ে দেবে কান।

আরও কয়েকটা লিভার ও বাটন টিপে মোনার হাত ধরে

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘এসো!’

বলরুমের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে গেস্টরা। এরই ভেতর খুন হয়ে গেছে তিনজন। মার্বেলের মেঝেতে রক্তের পুকুরে লাশ। প্রচণ্ডভাবে পেটানো হয়েছে কয়েকজনকে।

সবাইকে ঘিরে আছে কালো ফ্যাটিগ ও স্কি মাস্ক পরা একদল ডাকাতের মত লোক। সহজেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা। সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তাক করেছে অসহায় মানুষগুলোর বুকে।

মস্ত ঘরের মাঝে তাদের দলের দু’জন। একজনের হাতে অস্ত্র তৈরি। অন্যজনের মুখে মুখোশ নেই। অন্ধকারে কেউ দেখবে না, তার পনিটেইল সোনালি রঙের। জিম্মিদের ভেতর খ্যাপা নেকড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

কয়েক পা গিয়ে আবারও থামল সে। ‘অ্যাই, তুমি!’ মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশনের এক কর্মচারীর দিকে আঙুল তাক করল। ‘উঠে দাঁড়াও!’

ভীত লোকটা উঠতেই তার গলা খামচে ধরল সন্ত্রাসী-নেতা। ‘তুমি তো কর্পোরেশনের মুখপাত্র?’

কাঁপতে কাঁপতে মাথা দোলাল কর্মচারী।

‘তা হলে মুখ চালাও! ওই মেয়ে কোথায়?’

‘কার কথা বলছেন?’

‘মোনা মোবারক।’

গলা শুকিয়ে যেতে বড় করে ঢোক গিলল মুখপাত্র। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা নিয়ে বলল, ‘মিস্টার হ্যানসনের সঙ্গে গেছে পুবের করিডোরে।’

‘হ্যানসন মানে ওই বুড়ো লোকটা?’

মাথা দোলাল মুখপাত্র।

আপত্তির সুরে মাথা নাড়ল পনিটেইল। 'আমরা ওকে খুন করেছি। ওর সঙ্গে মেয়েটা ছিল না।'

করুণ সুরে বলল লোকটা, 'শপথ করে বলছি, নিজ চোখে দেখেছি যেতে; এই তো আপনারা আসার কয়েক মিনিট আগে।'

পিস্তল তুলে তার কপালে ঠেকাল পনিটেইল, পরক্ষণে কক করল হ্যামার।

'শপথ করছি! নিজ চোখে দেখেছি যেতে! আর কিছু জানি না, স্যর!'

'তা হলে তোমাকে দরকার নেই আমার,' বলল পনিটেইল। টিপে দিল ট্রিগার।

বিস্ফোরিত হলো কর্মচারীর মাথা। পিছিয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ল লাশ। ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন। পরক্ষণে হাত চাপা দিল মুখে।

'আর কেউ নতুন কোনও তথ্য দিতে পারবে?' চিৎকার করে বলল পনিটেইল, 'এমন তথ্য, যেটার কারণে তোমাদেরকে মেরে ফেলব না?'

কেউ টুঁ শব্দ করার আগেই জ্বলে উঠল বিশাল দুই প্লাযমা স্ক্রিন, হাইড্রলিক স্লাইডে ভর করে ধীরে ধীরে নেমে আসছে ছাত থেকে। এক সেকেণ্ড পর শুরু হলো কান ফাটিয়ে দেয়া মিউযিক। ওই বিকট আওয়াজের ওপর দিয়ে এল গমগমে কণ্ঠ। এতই জোরে ভলিউম দেয়া, স্পিকারে বিকৃত হয়ে গেল সব।

'ওয়েলকাম টু দ্য সিটি অভ দ্য ফিউচার!'

ভয়ানক আওয়াজের কারণে হঠাৎ করেই নার্ভাস হয়ে গেছে পনিটেইলের সঙ্গীরা। তাদের একজন পিছিয়ে গেল কয়েক পা। অন্যরা শক্ত হাতে ধরল অস্ত্র।

'আপনারা এবার দেখবেন কী হতে চলেছে ভবিষ্যৎ...'

দপ-দপ করছে স্ক্রিন, ফলে অস্বাভাবিক হয়ে উঠল বলরুমের

আবছা অন্ধকার।

'এসব কী শুরু হলো?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল এক খুনি।

জবাব দিল না তার নেতা। মাথা ঠাণ্ডা। খপ করে ধরল হোটেলের এক স্টাফের গলা। পিস্তল ঠেসে ধরল গালে। 'কন্ট্রোল রুম কোথায়?'

পুবের করিডোর দেখিয়ে দিল লোকটা।

ওদিকেই গেছে মোনা মোবারক।

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্টাফকে মেঝেতে ফেলল সন্ত্রাসী নেতা। হাতের ইশারা করল দলের দু'জনের উদ্দেশে। ড্যান্স ফ্লোর মাড়িয়ে ঝড়ের গতি তুলে অন্ধকারে চলল পুব করিডোরের দিকে।

হাতে হাত রেখে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা ও মোনা। পুবের করিডোর পেরিয়ে পৌঁছল পশ্চিমের করিডোরে। দালানের এই তলার সেটআপ খুব সহজ। মাঝে প্রকাণ্ড ঘোড়ার নালের মত বলরুম, পুব করিডোর মিশেছে পশ্চিমের করিডোরে।

বলরুমে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে সাউণ্ড সিস্টেম। আবছা আঁধার ঘরে দপ-দপ করছে প্লাযমা স্ক্রিনের আলো। খুব কঠিন হবে কাউকে অন্ধকারে খুঁজে বের করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রানা বা মোনাও চট্ করে বুঝবে না কোথায় আছে শত্রু।

করিডোরের দূরে চোখ বোলাল রানা।

স্ক্রিনের আলো একবার বেড়ে যেতেই দেখল, একটু দূরেই জ্যানিটরের ক্লযিট। মোনাকে ওদিকে নিয়ে দরজা খুলল রানা। ছোট্ট ক্লযিটের ভেতর বালতি, মেঝে মোছার কাপড়, তারপুলিন ও নানান পরিষ্কারের জিনিসপত্র। ভাল জায়গা।

‘ঢুকে পড়ো,’ প্রায় ঠেলে মোনাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা। ‘জিনিসপত্রের ওদিকে মেঝেতে চুপ করে শুয়ে থাকবে। যা-ই হোক, নড়বে না বা শব্দ করবে না। ওরা হয়তো খুঁজতে আসবে। মনে করো আবারও কঙ্গোতে ফিরেছি আমরা। বুঝতে পেরেছ?’

দর-দর করে অশ্রু ঝরছে চোখ থেকে, মাথা দোলাল মোনা।

‘ভয় পেয়ো না,’ মৃদু হেসে বলল রানা। ‘একটু পর ফিরব।’

ক্লযিট থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে ভাবল রানা, সত্যি প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরব কি না, ঠিক নেই। প্রথম কাজ এখন অস্ত্র সংগ্রহ করা।

বিকট বাজনা ও বিকৃত গলার আওয়াজ, সেই সঙ্গে প্লাযমা স্ক্রিনের ঝাঁকি খাওয়া ফ্ল্যাশলাইটের মত আলো। সব উপেক্ষা করে দলের দু'জনকে নিয়ে পুবের করিডোরে ঢুকে পড়েছে পনিটেইল। সব মিলে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। অথচ খুব সহজেই কাজটা শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

সামনে বামের দেয়ালে অস্ত্র তাক করে বলল সে, ‘সাবধানে এগোও।’

তার মত একই কাজ করছে অন্য দু'জন। কিন্তু হামলে পড়ল না কেউ। এভি রুমের সামনে পৌঁছল বিপদ ছাড়াই। দু'জনের একজন ধাক্কা দিয়ে খুলতে চাইল দরজা।

‘লক করা।’

হ্যাণ্ডেলের দিকে পিস্তল তুলে কয়েকটা গুলি করল পনিটেইল। টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল ডোরজ্যাম। পাশের জনের লাথি খেয়ে দড়াম করে অন্ধকারে খুলে গেল দরজা।

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখল না তারা।

পেছনের দিকে দরজা।

দলের দু'জনকে করিডোর ধরে এগোতে ইশারা করল পনিটেইল। 'মেয়েটাকে খুঁজে বের করো!'

তারা চলে যেতেই ভাল করে ঘরটা দেখল পনিটেইল। কোথাও নেই মেয়েটা। গলা ফাটিয়ে ডাকল: 'মোনা!'

জবাব দিল না কেউ।

কোথাও নেই মেয়েটা।

অডিয়োভিয্যুয়াল কণ্ট্রোলের সামনে থামল সন্ত্রাসীদের নেতা। উঁচু করে ধরল রাইফেল, পরক্ষণে গুলি করে চুরমার করল প্যানেল। 'তুমি আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ, মেয়ে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি থেমে যেতেই নতুন করে আবারও নীরব হলো হোটেলের একাশিতম তলা। একবার হাতঘড়ি দেখল পনিটেইল। হাতে সময় নেই।

এক পা এক পা করে করিডোর ধরে চলেছে রানা। হাত তুলে রেখেছে মাথার ওপর। কেউ দেখলে ভাববে, ভিতু কর্মচারী ও। কান ফাটানো আওয়াজে সমস্যা হচ্ছে না ওর। কিন্তু তখনই শুনল রাইফেলের গুলির আওয়াজ। থেমে গেল স্পিকার ও প্লাযমা স্ক্রিন।

যাহ্, গেল প্ল্যান 'এ', ভাবল রানা। পুরো অন্ধকারে বিড়ালের মত দেখতে চাইল দূরে। ওই যে, একটু চিকচিক করছে একটা সাইন: ফায়ার অ্যালার্ম।

কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওটার কাঁচের ঢাকনি ভাঙল রানা, পরক্ষণে হ্যাঁচকা এক টানে নামিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল।

শুরু হলো পুরো ফ্লোর জুড়ে কর্কশ, তীক্ষ্ণ আওয়াজ। কান চাপা দেয়ার মত প্রচণ্ড সাইরেন শেষ হতে না হতেই এল ছোট ছোট চারটে হুঙ্কার। দপ-দপ করে জ্বলে উঠল লাল ইমার্জেন্সি

বাতিগুলো।

অ্যালার্মের ভয়ঙ্কর শব্দের ভেতর রানা দেখল, করিডোরের শেষমাথায় এক লোক। উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সেখানে বিঁধল একরাশ গুলি। 'বিঈং' শব্দ তুলে পিছলে গেল কিছু বুলেট। অস্ত্রের আওয়াজ, অ্যালার্ম ও দপদপে লাল বাতির কারণে নরক হয়ে উঠেছে চারপাশ।

পরক্ষণে গুলি করল আরেক লোক। সে গুলি করেছে রানার পেছন থেকে সামনের ওই লোকের দিকে।

অন্ধকারে অস্থির লোকদু'জন গুলি করছে পরস্পরকে লক্ষ্য করে। বলরুমের কাছের লোকটা গুলি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঘুরে তাকাল রানা। পরক্ষণে এক দৌড়ে পৌঁছে গেল আহত লোকটার পাশে। ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল রাইফেল। সামনে থেকে এল এক পশলা গুলি। খুবলে তুলল চারপাশের দেয়াল। মার্বেলের মেঝেতে লেগে পিছলে গেল কয়েকটা গুলি। অ্যালার্মের বাতির আলোয় আততায়ীকে পরিষ্কার দেখল রানা, ব্যারেল ঘুরিয়ে পাল্টা গুলি পাঠাল করিডোরের ওদিকে।

পুরো ফ্লোর জুড়ে শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে কয়েকজন জিম্মি, দেরি না করে লাফিয়ে উঠে ছুটল স্টেয়ারওয়েলের দিকে। অন্যরা এখনও মেঝেতে। ভিড়ের ওপর গুলি চালাল এক সন্ত্রাসী। ওখানে কয়েকজনকে আহত হয়ে পড়ে যেতে দেখল রানা।

লক্ষ্যস্থির করে ওই সন্ত্রাসীকে ফেলে দিল ও। কিন্তু ওকে চিনে ফেলল আরেকজন। গুলি এল ওর করিডোরে।

মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। কানের খুব কাছ দিয়ে গেল গুলি। হঠাৎ করেই ব্যস্ত হয়ে পালাতে শুরু করেছে সন্ত্রাসীরা।

সবাই ছুটছে পুব করিডোর লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে থেমে গুলি ছুঁড়ছে পেছনের ভিড়ে। স্টেয়ারওয়েলের দিকে চলেছে, উধাও হবে হেলিকপ্টারে উঠে।

গুলি না ছুঁড়ে সন্ত্রাসীদেরকে যেতে দিল রানা, উঠে এক দৌড়ে ঘুরল পশ্চিম করিডোরের কোণ। ভিড়ের মাঝ দিয়ে ছুটে পৌঁছল জ্যানিটরের ক্লযিটের দরজায়।

ভেতরে থাকার কথা মোনার।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলল রানা। 'মোনা!'

জবাব দিল না কেউ!

'মোনা?'

ক্লযিটে ঢুকল রানা।

কোথাও নেই মেয়েটা!

বাইশ

সন্ধ্যার একঘণ্টা পর বৈরুত শহরের মাঝামাঝি রুপালি মার্সিডিজ এসইউভি থেকে নামল এলেনা রবার্টসন। সামনেই বোমা হামলায় বিধ্বস্ত এক প্রকাণ্ড বাড়ি। দেয়াল ঝাঁঝরা হয়েছে বুলেটের আঘাতে। গত কয়েক বছর ধরে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল একপাল বুনো জন্তু। কিন্তু নতুন করে আবারও এই বাড়ি দখল করে নিয়েছে মানুষ। পুরোদমে চলছে মেরামত কার্যক্রম। মস্তবড় এই দালান লেবাননের জাতীয় জাদুঘর।

জাদুঘরের পাশেই নতুন করে চালু হয়েছে ব্যস্ত হাসপাতাল।

আরেক দিকে সরকারি পাঠাগার, নতুন করে আবারও গড়ে তোলা হয়েছে ওটা। পুরনো পাথরের দেয়ালের মাঝে আধুনিক সব টিন্টেড কাঁচ। রাতের আঁধারে উজ্জ্বল আলোয় বলরুমের মত ঝকমক করছে তিন দালান।

এলাকা কঠোরভাবে পাহারা দিচ্ছে সিকিউরিটির লোক। এখানে ওখানে ক্যামেরা। বোমা শুঁকে বের করতে চাইছে কয়েক পাল প্রশিক্ষিত কুকুর। নানান দিকে অবস্থান নিয়েছে লেবানিজ আর্মির লোক।

এসইউভি নিয়ে ভ্যালে সরে যেতেই লাল গালিচা মাড়িয়ে চলল এলেনা। চারপাশে উজ্জ্বল সব বাতি, বাজছে মিষ্টি মিউযিক। খয়েরি মসৃণ, ঝিলমিলে গাউন পরেছে ও, সচ্ছন্দে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ওকে পেছন থেকে পাহারা দিচ্ছে নাসের আল মেহেদি ও তার দুই বডিগার্ড। সবার পরনে দামি টাক্সিডো।

জাদুঘরের উঁচু মেঝেতে পৌঁছে ভাবল এলেনা, এখন কী করছে রানা? নিশ্চয়ই দুবাইয়ের দামি কোনও হোটেলে? ডিনার সারছে? নাকি হোটেলের বয় সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে? নাকি ওই মেয়েটার সঙ্গে...

বুকে ঈর্ষার ছোবল টের পেল এলেনা।

ওই মেয়েটা... মোনা... সে এখন আছে রানার খুবই কাছে। সম্পূর্ণ মনোযোগ পাচ্ছে ওর।

নিজেকে ধমক দিল এলেনা। তোর এখন ভাবতে হবে না রানার কথা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে মেহেদিকে বলল, 'আপনারা নতুন করে সব গড়ে নিচ্ছেন। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না।'

'চিরকাল ধরেই এ শহর বা দেশ গড়ছি আমরা,' বলল নাসের আল মেহেদি। 'এবার আমাদের শেখা উচিত কীভাবে বন্ধ করা যায় ধ্বংসের খেলা।'

এলেনা খেয়াল করেছে, শহরের বেশ কিছু জায়গায় ভারী সব মেশিন নিয়ে কাজ করছে মেহেদির মজুর ও কর্মচারীরা। প্রত্যেকের পরনে মালিকের কোম্পানির ইউনিফর্ম। রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড। 'নতুন করে শহর গড়ে তোলা ভাল ব্যবসা,' মন্তব্য করল ও।

'জাদুঘর ঠিক করতে মুনাফা করিনি,' জোর দিয়ে বলল মেহেদি। 'লাভ করেছি বড়লোকদের জন্যে তৈরি হাসপাতালে। এই তিন ভবন চালু হবে বলে দেশের সেরা সবাই এসেছে আজ। ওপরের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে, কিন্তু বড়লোকদের বেশ কয়েকজন ওখানে না থেকে হাজির হবে জাদুঘরের নিচের নিলামে। চোরাই আর্ট কিনে হালকা করবে নিজেদের সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট।'

'ও। জানতে পেরেছেন কীসের ওপর নিলামে ডাক দেব?'

'কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বলল কণ্ট্রাক্টর, 'আবু রশিদের হারিয়ে যাওয়া জিনিস মেসোপটেমিয়ান আর্ট।'

'ওসব দিয়ে কী হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেহেদি। 'জানি না। তার নিজেরও কিছু জিনিস নিলামে উঠবে। ওগুলো বিক্রি করেই নাকি কিনে নিতে চেয়েছিল মেসোপটেমিয়ান আর্ট।'

'জিনিসটা কী?'

'দ্বিতীয় লটের সেরা জিনিস। লেবেল অনুযায়ী: ওটা একটা তাম্রলিপি। প্রোটো-এলামাইট। ধারণা করা হচ্ছে, এ ছাড়াও আছে বিখ্যাত রাজা গিলগামেশের সময়ের একটা খোদাই করা আর্ট। তবে লট থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে ওটাকে।'

আগ্রহ বোধ করল না এলেনা। মেহেদিকে দেখে ওর মনে হলো না এসবের জন্যে টাকা খরচ করবে লোকটা। হঠাৎ করেই ভাবল, সঙ্গে কোনও এক্সপার্ট এলে ভাল হতো। রানা মানিয়ে

যেত ওই কাজে।

'আমি যদি কিছু কিনতে চাই?' জানতে চাইল এলেনা।

চট্ করে ওকে দেখল মেহেদি। 'আপনি বললেন ডক্টর মোবারক মারা গেছেন, ঠিক না?'

মাথা দোলাল এলেনা। 'হ্যাঁ।' বুঝল না, হঠাৎ এ কথা কেন। 'আপনি তো বলেছিলেন তাঁকে চিনতেন না?'

'হ্যাঁ, চিনি তো না-ই। কিন্তু নতুন কেউ নিলামে যোগ দিতে চাইলে কখনও কখনও আমার সাহায্য নেয়।'

এলেনা বলল, 'আপনি ব্রোকার হিসেবে কাজ করেন?'

'সবাই বিশ্বাস করে আমাকে,' বলল মেহেদি, 'সব পক্ষ। সেজন্যে নানান সুবিধা পাই।'

'নিলামে ওঠা আর্টের টাকার একটা অংশ আপনি পাবেন।'

'হ্যাঁ। আপনি নিলামে ডাক দিলে পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফা আসবে আমার পকেটে। আমেরিকান সরকারের টাকা বলে নেব, নইলে রানার কাছ থেকে আপনি এলে চার-আনা পয়সাও নিতাম না। আবু রশিদের তরফ থেকে ডাক দেবেন, বলে দিয়েছি নিলামদারকে।'

'এর ফলে বিপদে পড়তে পারি,' বলল এলেনা।

'আসলে পুরো নিরাপদ নয় কেউ,' বলল মেহেদি। 'আমার ধারণা, সঙ্গে অস্ত্র এনেছেন। আমি কি মিথ্যা বললাম?'

'না, ঠিকই বলেছেন।' এলেনার পার্সে ঘুমিয়ে আছে কাহ্‌র পি ৩৮০ পিস্তল, জুতোর হিলে ছোট কার্বন-ফাইবারের ছোরা।

'আপনি নিজেও বিপজ্জনক মানুষ,' হাসল কণ্ট্রাক্টর মেহেদি। 'আশা করি বিপদে পড়বেন না। আমার কাজ হবে আপনাকে নিরাপদে রাখা।'

মাথা দোলাল এলেনা।

জাদুঘরের রিসেপশনে একঘণ্টারও বেশি সময় কাটাল ওরা,

তারপর একহারা এক লম্বা লোক এসে টোকা দিল মেহেদির কাঁধে। কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলল। ঘুরে হনহন করে রওনা হয়ে গেল।

এলেনার বাহু স্পর্শ করে বলল কণ্ট্রাক্টর, 'ওই লোকের পিছু নিতে হবে।'

প্রকাণ্ড হলরুম ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। এলেনার মনে হলো না আশপাশে নিলাম ডাকার মত জায়গা আছে। জাদুঘরের পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পুরনো এক মালটানা এলিভেটরের সামনে থামল ওরা।

গভীর সন্দেহ নিয়ে মেকানিকাল খাঁচা দেখল এলেনা।

'পাতালে হবে নিলাম,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল মেহেদি। 'জাদুঘরে নয়। আরও নিচে।'

এনআরআই চিফের কথা মনে পড়ল এলেনার। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নিলাম। ওর ধারণা ছিল, জাদুঘরের কোনও ঘরে বা লাইব্রেরিতে হবে। একবার মনে হলো, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। আগেই লোকটার কাছে জানতে চাওয়া উচিত ছিল, এই এলিভেটর ছাড়া অন্য উপায়ে নামতে পারবে কি না। ভয়টাকে বাড়তে না দিয়ে নিজেকে বলল, জরুরি কাজে এসেছি, দরকার হলে ঝুঁকি নেব। অত ভয় পাওয়ার কী আছে? সঙ্গে রয়েছে অস্ত্র, প্রয়োজনে নিজেও বিপজ্জনক হয়ে উঠব।

বাহুর ওপর থেকে মেহেদির হাত সরিয়ে দিল এলেনা। 'আপনি আগে উঠুন।'

কণ্ট্রাক্টর এলিভেটরে চাপতে উঠল এলেনা। সব শেষে একহারা লোকটা। টেনে আটকে দিল দরজা, বাটন টিপতেই নামতে লাগল এলিভেটর। টিমটিম করে জ্বলছে দশ ওয়াটের বাতি। করুণ সব ক্যাঁচকোচ শব্দ তুলে ঝাঁকি খাচ্ছে ভাঙাচোরা খাঁচা।

কিন্তু এটা দুলতে দুলতে নামছে কোন্ নরকে? গলা শুকিয়ে গেল এলেনার।

তেইশ

নরক গুলজার করছে আর্তচিৎকার, গুলি ও ফায়ার অ্যালার্ম। জ্যানিটরের খুপরির ভেতর কাউকে দেখল না রানা। বিশ্বাস করছে না নিজের চোখ। দপদপ করা লাল আলোয় আবারও দেখল ফাঁকা জায়গাটা। প্রচণ্ড আওয়াজের ওপর দিয়ে চিৎকার করল ও, 'মোনা!'

জবাব দিল শুধু হুঁই-হুঁই শব্দে ফায়ার অ্যালার্ম।

হয়তো লুকাবার ভাল কোনও জায়গা পেয়েছে মোনা, তা নইলে...

যা বোঝার বুঝে গেল রানা, পুবের করিডোর লক্ষ্য করে ছুটল রাইফেল হাতে। ভাল করেই জানে, সিকিউরিটি দলের কেউ এই তলায় উঠে এলে, দেরি না করে গুলি করবে ওকে।

এক দৌড়ে স্টেয়ারওয়েলে পৌঁছল। ভিড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে চাইছে অনেকে। মোটা এক লোক পড়ল রানার সামনে। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠবে। ভিড় ঠেলে রেলিং টপকে সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠল, ছুটল হেলিপোর্ট লক্ষ্য করে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বেরিয়ে এল রাতের আকাশে। ছাতের ক্যাটওয়াক গেছে হেলিপ্যাডে। চারপাশে তুমুল বাতাস ছড়িয়ে

দিচ্ছে ফ্রেঞ্চ ডফিন হেলিকপ্টার, যে-কোনও সময়ে ভেসে উঠবে আকাশে। যান্ত্রিক ফড়িঙের দিকে মোনাকে টেনে নিচ্ছে সশস্ত্র দু'জন লোক।

বাম হাঁটুর ওপর ভর করে কাঁধে রাইফেল তুলল রানা। ওর প্রথম গুলি লাগল ডানের লোকটার মেরুদণ্ডে। বামের লোকটা মোনাকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যাটওয়াকে। উঠে বসেই আন্দাজে গুলি করল। কিন্তু মস্ত ছাতে যে-কোথাও থাকতে পারে তার শত্রু।

ক্যাটওয়াকের শুরুতে কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা।

উঠে মোনাকে বর্মের মত ধরে পিছিয়ে যেতে লাগল সন্ত্রাসী।

সুবিধা হবে না তার। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে মোনার কাছ থেকে সে সরলেই...

হেলিকপ্টারে মোনাকে ঠেলে তুলল লোকটা। ওই একই মুহূর্তে রানার গুলি ফুটো করল তার মগজ। ছিটকে ক্যাটওয়াকে পড়ল লাশ।

তখনই হেলিকপ্টার থেকে এল রানার দিকে গুলি। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে কাভার নিল ও। মাথা তোলার সুযোগ নেই, চারপাশের ক্যাটওয়াকে লেগে পিছলে যাচ্ছে এক ঝাঁক গুলি।

এদিকে কানফাটা শব্দ তুলছে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন। আরও বাড়ল বাতাসের দাপট। রানা বুঝল, পিচ বাড়িয়ে দিয়েছে পাইলট। এবার যে-কোনও সময়ে টেক অফ করবে।

ওদিকে গুলি পাঠাল রানা, পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড় দিল হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে। মৃত্যু-খেলায় হারবে না, জেদ ধরেছে। যান্ত্রিক ফড়িং আকাশে উঠছে বলে ল্যাণ্ডিং গিয়ারের ওপর থেকে কমল চাপ। ছোট সব স্ফুলিঙ্গ ও খুদে সব ধাতুর টুকরোর ঝড় চারপাশে, ওর দিকে আসছে একগাদা গুলি। অথচ আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ শুনল না। একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়েই পাল্টা গুলি পাঠাল

রানা।

হেলিকপ্টারের সামনের বুদ্বুদের মত প্লেক্সিগ্লাসে তৈরি হলো সাদা গোল গর্ত। পাল্টে গেল রোটরের গর্জন। সিটে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাইলট। কাঁপতে কাঁপতে কিছুটা উঠল হেলিকপ্টার। পরক্ষণে কাত হয়ে ধুম করে নামল হেলিপ্যাডে। হাজার টুকরো হয়ে চারদিকে ছিটকে গেল রোটরের ভাঙা কার্বন কমপোজিট।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা। দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে বাহু ও কাঁধ কেটে। আরেকটু হলে উড়ন্ত অজস্র ছোরা খতম করত ওকে। খুন হয়নি বলে খুশি, তার চেয়েও খুশি, হেলিকপ্টার নিয়ে পালাতে পারেনি সন্ত্রাসীরা। মুখ তুলে তাকাল, আর তখনই ভীষণ ভয়ে আত্মা কেঁপে গেল ওর।

কাত হয়ে পড়েছে হেলিকপ্টার, অর্ধেক দেহ ছাতের বাইরে। এতক্ষণে অনেক নিচের রাস্তা লক্ষ্য করে নেমে যেত যান্ত্রিক ফড়িং। হেলিপ্যাড ঘিরে রাখা তিনটে কেবলের গার্ডরেইল আটকে রেখেছে ল্যাণ্ডিং গিয়ারের এক অংশ।

চাপের মুখে টানটান হয়ে উঠেছে তিন কেবল। বেঁকে যাচ্ছে ওগুলোকে ধরে রাখা লোহার খুঁটি। খুব ধীরে আরও কাত হচ্ছে হেলিকপ্টার। অনেক নিচে রাস্তা।

লাফিয়ে উঠে হেলিকপ্টারের দিকে ছুট দিল রানা, দেখতে না দেখতে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠল বিধ্বস্ত আকাশযানের গায়ে।

রাইফেল তাক করল রানা। ঝাঁকি লেগে খুলে গেছে কপ্টারের দু'দিকের দরজা। নিচ থেকে রানার দিকে চেয়ে আছে মোনা। এখনও আটকে আছে সিটবেল্টের কারণে। ভীষণ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। দু'হাতে শক্ত করে ধরতে চাইছে সিট। পিছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে সোনালি পনিটেইলওয়ালা এক লোক।

রানাকে দেখে দাঁত খিঁচাল সে।

শত শত ফুট নিচে রাস্তার বাতি ও গাড়ি দেখল রানা। ইমার্জেন্সি সব ভেহিকেল থামছে হোটেলের সামনে।

হাত বাড়িয়ে খপ করে মোনার বাহু ধরল রানা, কিন্তু ওর নিজের ওজনে আরও কাত হলো হেলিকপ্টার। ধাতব আওয়াজ এল রেইলগার্ড থেকে।

'পড়ে যাচ্ছি! আমার হাত শক্ত করে ধরো, রানা!' বেসুরো কণ্ঠে চিৎকার করল মোনা।

'ধরেছি!' পাল্টা চেঁচাল রানা।

রাতের নীরবতায় গুলির রিকোশের মত 'বিঙ্ঙ্' আওয়াজ তুলে একফুট নেমে গেল হেলিকপ্টার। ছিঁড়ে গেছে তিনটে কেবলের একটা!

ঝাঁকি খেয়ে মোনার বাহু পিছলে গেল খানিকটা। রানার ধরা বাহুতে বেকায়দা টান লাগতেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সে।

শক্ত হাতে কিছু ধরে টেনে তুলতে হবে মোনাকে, ভাবল রানা। কিন্তু মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরেছে সোনালি চুলের সন্ত্রাসী। এক সঙ্গে দু'জনকে তোলার সাধ্য ওর নেই। আরও শক্ত করে মোনার বাহু ধরল ও, অন্য হাতে হাতড়াতে শুরু করেছে। পেয়ে গেল রাইফেল। ওটা ঘুরিয়েই তাক করল সন্ত্রাসীর দিকে।

'না!' ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মোনাও। কিন্তু দু'জনের গলা চাপা পড়ল রাইফেলের গর্জনে।

নিচের অন্ধকারে হারিয়ে গেল সোনালি পনিটেইল।

রাইফেল ফেলে দু'হাতে মোনাকে ধরল রানা, ধমকের সুরে বলল, 'উঠে এসো!'

'পারছি না!' কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'হাতে খুব ব্যথা!'

'সিটবেল্ট খুলে উঠে এসো!' চিৎকার করল রানা। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। কপ্টার থেকে টেনে বের করবে মোনাকে।

কয়েক ইঞ্চি উঠে এল মেয়েটা, এক পা তুলল ফিউযেলাজে।

আবারও পিছলে গেল হেলিকপ্টার। বিকট খটাং আওয়াজে ছিঁড়ল দ্বিতীয় কেবল। শেষের কেবল বেশিক্ষণ ওজন নেবে না।

'এসো!' পাগলের মত চিৎকার করল রানা। গায়ের সব শক্তি দিয়ে তুলে আনতে চাইছে মোনাকে।

ব্যথায় আর্তচিৎকার করছে মেয়েটা। এক পায়ে ভর করে উঠে আসতে চাইল। বাটন টিপে খুলে দিল সিটবেল্ট।

পিছিয়ে যাচ্ছে রানা, নিজের দিকে তুলে আনবে মোনাকে। কপ্টারের কোমরে পা রেখে প্রাণপণে লাথি মেরে পিছিয়ে যেতে চাইল। তৃতীয়বার পায়ের চাপে পেছাতে যেতেই বুলেটের মত শব্দে ছিঁড়ে গেল তৃতীয় কেবল।

ছিটকে পেছনের হেলিপ্যাডে পড়ল রানা, ওর বুকের ওপর মোনা। অনেক নিচের রাস্তা লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার।

মোনাকে বুকে নিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই শুনল না, তারপর দূর থেকে এল জোরালো অসুস্থকর কুড়মুড়ে আওয়াজ। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো কী যেন। পোড়া হাই-অকটেনের ঝাঁঝাল গন্ধের পর হেলিপ্যাডের আকাশে উঠল ঘন কালো ধোঁয়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আপাতত বিপদ নেই। তবে মোনাকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে এই হোটেল ছেড়ে। বুকের ওপর থেকে মোনাকে নামিয়ে দিল রানা। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

ভয়ে চুনের মত ফর্সা হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। চোখে অশ্রু নেই, কথাও বন্ধ। আছে শকের ভেতর।

'এসো,' নরম সুরে বলল রানা। মোনার হাত ধরে ফিরে চলল সিঁড়ির দিকে।

একদল লোক জড় হয়ে হেলিকপ্টার পড়ে যাওয়া দেখেছে। তাদের একজন খুলে দিল সিঁড়ির দরজা। হাততালি দিল আরেকজন।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এল জন এফ. হার্বার্ট। এখন মুখে রা নেই। অন্তর কেঁপে গেছে তার। দ্বিধা নিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি সিকিউরিটির লোক নও, না?'

'না।' লোকটাকে ঠেলে মোনাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা।

একাশিতম তলায় পৌঁছে দেখল, আগের চেয়ে কমেছে হৈ-চৈ। গোলাগুলির সময় আহত হয়েছে বাইশজন লোক। খুন হয়েছে সন্ত্রাসী সহ বারোজন। একদল সিকিউরিটির লোক শান্ত করছে সাধারণ মানুষকে। পৌঁছে গেছে ডাক্তার ও নার্স। মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের অনেকে নিজেরাই ডাক্তার। দেরি করেননি ট্রেনিং অনুযায়ী কাজ করতে। সুস্থ পুরুষ ও মহিলারা সাহায্য করছে আহতদেরকে। সরিয়ে নেয়া হচ্ছে তাদের। কোত্থেকে হাজির হয়েছেন এক যাজক। মৃতদের জন্যে প্রার্থনা করছেন।

এক হাতে আহত বাহু ধরে চারপাশ দেখছে মোনা। যেন নেশার ভেতর আছে। বাংলায় বিড়বিড় করে বলল, 'মিনতি।'

'কী বললে?' জানতে চাইল রানা।

মুখ তুলে ওকে দেখল মোনা, হঠাৎ করেই হয়ে উঠেছে সতর্ক। নিচু স্বরে বলল, 'এরা এসেছিল আমাকে তুলে নেয়ার জন্যে। তার মানে মিনা ফুফু আর মিনতি আছে ভয়ঙ্কর বিপদের ভেতর।'

'মিনা ফুফু আর মিনতি?' আগে এসব নাম মোনা বা ডক্টর মোবারকের মুখে শোনেনি রানা।

'ওদেরকে সরিয়ে নিতে হবে,' গালে রং ফিরে এসেছে

মোনার। 'এসো, দেরি করা ঠিক হবে না।'

লবিতে নেমে ওরা দেখল, পুরো হোটেল ঘিরে ফেলেছে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের লোক। আহত ও সন্ত্রস্ত রোগীদেরকে নিয়ে ছোটাছুটি করছে প্যারামেডিকরা।

রক্তমাখা পোশাকে মোনাকে দেখে এগিয়ে এল হোটেলের ম্যানেজার। 'আল্লাকে ধন্যবাদ, তিনি আপনাকে রক্ষা করেছেন। খুব গুরুতরভাবে আহত হননি তো?'

'না,' বলল মোনা। 'আমার একটা গাড়ি দরকার।'

মাথা নাড়ল ম্যানেজার। 'এই গণ্ডগোলের ভেতর গাড়ি নিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না।'

পুরো রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার। এখনও জ্বলছে ওটার তেল।

'আমাকে যেতেই হবে, প্লিয,' কাতর সুরে বলল মোনা।

ওকে এবং রানাকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল ম্যানেজার, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'আমাদের হোটেলের বোট আছে টুরিস্টদের জন্যে।'

'খুব উপকৃত হব ওটা দিলে,' বলল মোনা।

পাঁচ মিনিট পর বোটে চেপে রওনা হলো রানা ও মোনা। এই নৌযান ব্যবহার করা হয় দুবাইয়ের তীর থেকে হোটেলে টুরিস্ট আনার কাজে। বোট ওদেরকে পৌঁছে দিল তীরে। ওখানে অপেক্ষা করছে গাড়ি। তিরিশ মিনিট পর দুবাইয়ের শহরতলীতে পৌঁছল ওরা। গাড়ি থামল বিলাসবহুল এক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের গ্যারাজে।

চতুর্থতলায় উঠে সামনের দরজায় জোরে জোরে টোকা দিল মোনা। চিৎকার করে ডাকল: 'মিনা ফুফু! মিনা ফুফু!'

কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে দিলেন কাঁচা-পাকা চুলের এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। কাঁধে শাল। চেহারা দেখে ভীতা মনে

হলো। অবশ্য জড়িয়ে ধরলেন মোনাকে। 'একটু আগে নিউযে দেখলাম কী হয়েছে! খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।' মোনার পোশাকে রক্ত দেখছেন।

'রক্ত আমার না,' বলল মোনা।

সোনালি পনিটেইলের, ভাবল রানা।

'আর ইনি?' সন্দেহ নিয়ে রানাকে দেখলেন মহিলা।

'আমার বন্ধু,' বলল মোনা। 'অনেক দিন পর দেখা। ওঁর নাম মাসুদ রানা।'

পিছিয়ে গেলেন মিনা। চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে সন্দেহ। সেখানে বিস্ময় ও উষ্ণতা। 'ও, তা হলে আপনিই তিনি।'

ভুরু উঁচু করল রানা। 'বুঝলাম না।'

'আপনিই ওদেরকে বের করে এনেছিলেন কঙ্গো থেকে,' বললেন মিনা। 'মোবারক ভাইয়া বলেছিল আমাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু বুঝতে পারছিল না ঠিক সময়ে আপনাকে খুঁজে পাবে কি না।'

'পাননি,' নিচু স্বরে বলল রানা, 'ওঁর কাছে ঠিক সময় যেতে পারিনি।'

চোখ সরিয়ে নিলেন মোনার ফুফু। অবশ্য ভাস্তির মত মস্ত ঝাঁকি লাগেনি। শুকনো গলায় বললেন, 'খুব অবাক হইনি।'

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব,' বলল রানা, 'কিন্তু আজ যা হলো, এরপর আপাতত এ বাড়ি আপনাদের জন্যে নিরাপদ নয়।' ফ্ল্যাটের ভেতর চোখ বোলাল ও। প্রতিটি জিনিস খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখা। কিন্তু মেঝেতে কয়েকটা ব্যাগ ও একটা সুটকেস। 'আপনারা বোধহয় কোথাও যাচ্ছিলেন?'

'পাঁচ মিনিটের ভেতর যেন বেরিয়ে যেতে পারি, সেভাবে গুছিয়ে রেখেছি মালপত্র,' বললেন মিনা, 'মোনা, তোর বোনকে ঘুম থেকে তোল।'

এটা নতুন সংবাদ রানার জন্যে। জানত না মোনার কোনও বোন আছে।

অন্ধকার করিডোর থেকে দুর্বল কণ্ঠে বলল কেউ, 'আমি উঠে গেছি!'

ঘুরে ওদিকে তাকাল রানা।

কমবয়সী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৈর্ঘ্যে বড়জোর তিন ফুট। এগিয়ে এসে মোনার কোমর জড়িয়ে ধরল।

অবাক চোখে ওকে দেখল রানা।

মেয়েটার চোখে পুরু প্লাস্টিকের চশমা। কুঁচকে আছে মুখের চামড়া। পাতলা হয়েছে পাকা চুল। গায়ের ত্বক জরজর, সেখানে জায়গায় জায়গায় খয়েরি রং।

রানার প্রথমে মনে হয়েছিল, আলোর কারণে এমন লাগছে। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা চশমা ঠিক করে ওর দিকে ফিরে হাসতেই চমকে গেল। এই মেয়ের মুখ কী করে যেন হয়ে গেছে আশি বছরের বুড়ি মহিলার মত!

মিনতিকে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিয়ে চাপা স্বরে বলল মোনা, 'ও আমার বোন। নাম মিনতি। বয়স এগারো বছর।'

চব্বিশ

কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যেন নেমে চলেছে প্রাচীন এলিভেটর। কাঠের দরজার সরু এক চিলতে ফাঁক দিয়ে বাইরে স্বল্প ওয়াটের মিটমিটে হলদে আলো দেখছে এলেনা। তাতেই বুঝতে পারছে,

পেরিয়ে এসেছে দুই তলা। কিন্তু একেক তলা অনেক উঁচু। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর তৃতীয়তলায় ঝাঁকি খেয়ে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে দিল একহারা লোকটা। বেরিয়ে এসে চারপাশে স্যাণ্ডস্টোনের দেয়াল দেখল এলেনা। একপাশে বাড়ি মেরামতের ইকুইপমেন্ট, আরেক পাশে নিচু করে বাঁধা দড়ি। সাইনবোর্ডে লেখা: দয়া করে দড়ি পেরিয়ে যাবেন না।

'আমরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল এলেনা।

'নতুন করে শহর গড়তে গিয়ে অতীত জানছি আমরা,' বলল মেহেদি। এক্সকেভেশন দিক দেখাল। 'একসময় ওদিকে ছিল রোমান বাথ।'

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক, দু'জনের শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল আছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে।

'এই পথে আসুন,' ডানের করিডোর ধরে এগোল একহারা লোকটা।

করিডোর শেষ হলো এক স্টেয়ারওয়েলে। সিঁড়ির অনেক ওপরে কারুকাজ করা আর্চওয়ে। প্রাচীন শহর গড়ে তোলা হয়েছিল স্যাণ্ডস্টোন ব্যবহার করে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' আবারও জানতে চাইল এলেনা।

থমকে গিয়ে ঘুরে ওকে দেখল একহারা লোকটা। পরক্ষণে মেহেদিকে বলল, 'নিলাম নিচে হবে। নামতে হবে চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি। মাদাম নামতে রাজি না হলে, বা কোনও অসুবিধে থাকলে, তাঁর হয়ে নিলামদাতাকে বলে দেব, তিনি আসছেন না। কিন্তু অংশ নিতে গিয়ে যে টাকা জমা দেয়া হয়েছে, সেটা ফেরতযোগ্য নয়।'

মেহেদিকে বলল এলেনা, 'মাদামের কোনও অসুবিধে নেই। সে শুধু জানতে চেয়েছে, কীসের ভেতর গিয়ে পড়ছে।'

'নিজেই দেখবেন।' পাশের দরজা খুলে দিল লম্বু।

প্রথমে দরজা পেরিয়ে গেল এলেনা, তারপর মেহেদি। প্রায় অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল ওরা। মূল শহরের অনেক নিচে পৌঁছে গেছি, ভাবল এলেনা। উচিত ছিল না গাউন পরা। বিপদ হলে দৌড়াতে পারবে না।

'আমরা চলেছি ছয় হাজার বছর আগের ইতিহাসের মাঝখান দিয়ে,' বলল রানার বন্ধু, 'নিচে পাবেন বৈরুতের সবচেয়ে আগের ভূগর্ভের সমাধিক্ষেত্র। মৃতদেরকে ওখানে রাখত ফনেশিয়ানরা। অনেক পরে ওই একই কাজ করেছে রোমানরা। কিছু লিপি থেকে জানা গেছে, এখানে আছে ইউরোপ থেকে আসা ক্রুসেডারদের লাশও।'

'তাতে আমার সমস্যা নেই, আপত্তি তুলব এখানে চিরকালের জন্যে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হলে,' বলল এলেনা।

শেষ হলো সিঁড়ির ধাপ, পৌঁছে গেছে ওরা নিচের মেঝেতে। সামনেই লোহার গেট। হয়তো ক্রুসেডের সময়ের জিনিস। দুই কবাটের পাশে দুই লোক, হাতে অস্ত্র। ডানের লোকটা খুলে দিল একদিকের কবাট। তাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল মেহেদি।

পিছু নিয়ে জানতে চাইল এলেনা, 'বিপদ হবে না তো?'

'না,' মাথা নাড়ল মেহেদি। 'আমরা এখানে নিরাপদ।'

এনআরআই এজেন্ট হওয়ার আগে এলেনাকে কঠোর সব ট্রেনিং নিতে হয়েছে, সেগুলোর ভেতর একটি: চট্ করে মানিয়ে নেবে পরিবেশের সঙ্গে। এখন প্রশিক্ষকের কথা মনে পড়ল ওর। ওই একই কথা শুনেছে রানার মুখে: "যে-কোনও ঝামেলা থেকে বেরোতে পারে ভাল অপারেটর, কিন্তু সেরা অপারেটর এড়িয়ে যায় ঝামেলা।"

একবার পেছনের গেট, তারপর চেপে আসা দু'দিকের দেয়াল ও স্টেয়ারওয়েল দেখল এলেনা। ফাঁদে পড়ে গেছে বলে মনে হলো ওর। অবশ্য বুঝল, খুবই আত্মবিশ্বাসী নাসের আল

মেহেদি।

মাথার ইশারা করে সরু করিডোর ধরে পা বাড়াল ঠিকাদার। সামনেই চার করিডোরের মোড়। মেঝে ও দেয়াল এখানে ভেজা। জায়গায় জায়গায় মেঝেতে পানির অগভীর ডোবা।

যথেষ্ট কারণ আছে বলেই প্রাচীন ফনেশিয়ানরা এ শহরের নাম দিয়েছিল: বৈরুত, অর্থাৎ কূপ। ভুল ছিল না কথায়। এই শহরের মাটি সামান্য খুঁড়লেই পাওয়া যায় প্রচুর পানি। প্রাচীন শহরের ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র থেকে খুব দূরে নয় ওঅটার টেবিল।

চারপাশে আর কেউ নেই। অবশ্য, বিশ গজ দূরেই নীরবে ডাকছে পুরু কাঠের এক দরজা। ওদিক থেকে এল মানুষের গলার আওয়াজ।

দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে টোকা দিল নাসের আল মেহেদি।

ওদিক থেকে খটাং শব্দে সরানো হলো ভারী বোল্ট। দরজা খুলে যেতেই উজ্জ্বল সাদা আলোয় ওরা দেখল বিশাল এক ঘর। জড় হয়েছে কমপক্ষে বিশজন লোক। সবার পরনেই ওপরের ওই পার্টিতে ব্যবহার করা পোশাক।

সমাধিক্ষেত্রের মতই মস্ত এ ঘরও স্যাণ্ডস্টোনের তৈরি, তবে ঝেড়েমুছে রাখা। ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ জায়গায় উজ্জ্বল আধুনিক বাতি। এখানে ওখানে কমপিউটার টার্মিনাল। ঘরের এক কোণে ছোট বার। একদিকের দেয়ালে রয়েছে একের পর এক অ্যালকোভ। ঘরের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা, হুড়কো দিয়ে আটকে রাখা।

এলেনার মনে হলো, কারও ব্যক্তিগত লাউঞ্জে ঢুকে পড়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও হাজির হলো একহারা লোকটা। চোখে এখন অন্য ধরনের দৃষ্টি। বিনীত চাকর নয়, হাঁটার ভঙ্গিতে মালিকের গর্ব। অন্য কোনওভাবে পৌঁছেছে ঘরে।

'সবাই যখন পৌঁছে গেছেন, দয়া করে সময় নিয়ে দেখুন কী

ধরনের জিনিস কিনতে চান,' বলল লম্বু। প্রাচীন একটা চাবি বের করে ঘরের শেষমাথার দরজা খুলল। তার পিছু নিয়ে ভেড়ার পালের মত ওদিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই। নানান জিনিস দেখে স্থির করবে কী কিনবে।

অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে এলেনা। সাবধানে দেখতে লাগল সব আর্টিফ্যাক্ট। প্রথম দুটো মনে হলো গ্রিক বা মিনোয়ান মাস্ক। এরপর তৃতীয় জিনিস গিলগামেশের ছোট এক মূর্তি। চতুর্থ তাম্রলিপি। পাশেই সুমেরিয়ান লেখা ভরা কাদার এক ট্যাবলেট। তার ওদিকে পারস্যের প্রথম সাম্রাজ্যকালীন পাথরের এক দেবী মূর্তির মুখ।

এসব আর্টিফ্যাক্ট থেকে একটু দূরে চার ফুটি এক বর্শা, এক দিকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা, অন্যদিকে রুপার কাঁটাতার। এসব বর্শাকে বলে ডোরি, গ্রিক স্বর্ণযুগে ব্যবহার করত স্পার্টার হোপলাইট সৈনিক।

শেষ আর্টিফ্যাক্ট একটা প্যাপিরাস। তার বুকে গিজগিজ করে কালো কালিতে লেখা। পড়তে চাইলে আগে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সবার হাতে ধরিয়ে দেয়া কাগজ অনুযায়ী: ডেড সি-র স্ক্রলের মতই ওই প্যাপিরাসে আছে অ্যারামাইক ভাষা। কার বাপের সাধ্যি বুঝবে ওসব!

তিক্ত হয়ে গেল এলেনার মন। এসব জিনিস সত্যিকারের, নকল নয়। নিউয পেপার ও ইনশ্যুরেন্স ক্লেইম অনুযায়ী চুরি হয়েছে নানান দেশের জাদুঘর বা সংগ্রাহকদের কাছ থেকে। অবশ্য, কোথাও থেকে চুরি করা হয়নি তাম্রলিপিটা।

'কিছু পছন্দ হলো?' এলেনার কানের কাছে বলল মেহেদি।

'এখনও না,' বলল এলেনা, 'কিন্তু আবু রশিদ আগ্রহী ছিল ওই তাম্রলিপি কেনার জন্যে।'

'কয়েকজনের কাছে শুনেছি, লোকটা বলেছিল ওই লিপি খুঁজে

পাওয়া যে কারও সারাজীবনের সেরা কাজ হতে পারে।'

'প্রমাণীকরণ নেই কেন?' জানতে চাইল এলেনা।

'হয়তো সরাসরি এসেছে এক্সকেভেশন এলাকা থেকে, বা কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছ থেকে, অথবা এতই বিরল যে ওটার কথা কেউ কিছু জানাতে পারেনি,' বলল মেহেদি।

নকল জিনিস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ভাবল এলেনা। তাম্রলিপির বিষয়ে লেখা কাগজে চোখ বোলাল। জিনিসটা দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ইঞ্চি। বাটালির মত কিছু দিয়ে পেছন থেকে টোকা দিয়ে ওপরদিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লেখা। পোস্টার বা দানবীয় ধাতব সুইস রোলের মত। লিপি খুলে ছবি তোলা হয়েছে অদক্ষ হাতে। আলো এতই কম, লেখা বোঝা কঠিন। কোনওখানে বলা হয়নি কোথা থেকে পাওয়া গেছে তাম্রলিপি। কেউ চেষ্টাও করেনি অনুবাদ করতে।

'সত্যি যদি আর্কিওলজিস্টদের কারও চোখে না পড়ে থাকে, আমরা বুঝব কী করে, কোনও গ্যারাজে বসে কেউ এই কাজ করেছে কি না?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেহেদি। 'ক্যাভিয়্যাট এম্পটর।'

'বুঝেশুনে সাবধানে কিনতে হবে, এই তো?'

মাথা দোলাল কণ্ট্রাক্টর। 'যা করার করবেন, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এই তাম্রলিপির জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল আবু রশিদ। কেন, তা আমরা জানি না।'

তার খুব দরকার ছিল, ভাবল এলেনা। কিন্তু এই জিনিস দিয়ে কী করবে কোনও জেনেটিসিস্ট কিংবা কাল্ট? এটা দিয়ে তো দুনিয়া জুড়ে প্লেগ তৈরি করতে পারবে না কেউ। বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

'এক গ্লাস পানি পেলে ভাল হতো,' বলল এলেনা।

'বার থেকে আনছি,' বলল নাসের আল মেহেদি। 'ভুলেও

বেশি নজর দেবেন না জিনিসটার ওপর, দাম বেড়ে যাবে। আপনার দেখাদেখি অন্তত এক ডজন লোক ওটা কিনতে চাইবে।'

মৃদু হাসল এলেনা, মনোযোগ দিল চারপাশের লোকগুলোর ওপর। সব মিলে তারা আট দল। তিন দম্পতি। আলাদা দুই লোক। এদের দেখলেই মনে হয়, এসেছে মেডিটারিয়ান এলাকার বড় পরিবার থেকে। এখনও উড়িয়ে দিতে পারেনি সব টাকা। এ ছাড়াও আছে তিনটে দল। তাদের ভেতর দু'জন আরব, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী। একটু দূরে এক ইউরোপিয়ান যুবক, আঙুলে দামি হীরার আংটি। পরনের সুট রাজকীয়। চেহারা দেখে মনে হলো সত্যিকারের সমঝদার লোক।

সে বার থেকে এক গ্লাস ওয়াইন নিতেই তার দিকে মনোযোগ দিল এলেনা। লোকটার হাতের তালু ভরা কড়া। আঙুল পরিশ্রম করা মানুষের। নিজ পয়সা খরচ করতে এখানে আসেনি। যারা এসেছে, তাদের বেশিরভাগই হয়তো এমন।

দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরল নাসের আল মেহেদি। নিজের জন্যে শ্যাম্পেন, এলেনার জন্যে পানি। তাকে মনে হলো বেশ হতাশ।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল এলেনা।

'এদের বেশ কয়েকজনকে চিনি,' বলল কণ্ট্রাক্টর। 'আজ রাতে বেরিয়ে যাবে আপনাদের সরকারের অনেক টাকা।'

মৃদু হাসল এলেনা। 'চাপ দিয়ে পাবলিকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে যা খুশি করা সব দেশের সরকারের জরুরি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে!'

কয়েক মুহূর্ত পর সবাইকে নিয়ে প্রকাণ্ড ঘরে ফিরল একহারা লোকটা। এলেনা ও মেহেদিকে নিয়ে ঢুকল সে এক অ্যালকোভে। পেতে রাখা হয়েছে দামি কয়েকটি চেয়ার ও ছোট এক টেবিল। একইভাবে সাজানো অন্যান্য অ্যালকোভ। প্রতিটিতে থাকবে নিলামে ডাক দেয়া একেকটি করে দল।

এলেনার হাতে একটা আইপ্যাড ধরিয়ে দিল লম্বু। 'এটার মাধ্যমে বুঝবেন কখন কী জিনিস তোলা হবে নিলামে। এ ছাড়া, কেউ ডাক দিলে সেটাও দেখতে পাবেন।'

'কিন্তু কে আসলে ডাক দিল, তা জানব না,' আন্দাজ করল এলেনা।

'হ্যাঁ, মাদাম, এসব জিনিসের ক্রেতারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হন।'

'আমার মতই আর কী।'

তাড়া খাওয়া তেলাপোকার মত ছেঁচড়ে বেরিয়ে গেল লম্বু। ঢুকল গিয়ে পাশের অ্যালকোভে। এলেনার উল্টো দিকের চেয়ারে বসল কন্ট্রাক্টর মেহেদি। সামনে ঝুঁকে নিচু স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি তো বোধহয় আসলে নিলামে ডাক দেবেন না?'

'বলা যায় না,' বলল এলেনা, 'অন্তত সবকিছু কিনতে চাইব না।'

আরেক চুমুক শ্যাম্পেন নিল রানার বন্ধু। মনে হলো এলেনার কথা শুনে একটু চমকে গেছে।

টিং আওয়াজে বাজল ঘণ্টি। বড় ঘর থেকে এল একহারা লোকটার গলা, 'আমরা এবার নিলামে তুলছি প্রথম আইটেম।'

আইপ্যাডে মন দিল এলেনা। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল স্ক্রিনে চারটে ডাক। প্রথম ডাকের পর ক্রমেই বেড়েছে টাকার অঙ্ক। সবুজ একটা বার দেখিয়ে দিচ্ছে কত পর্যন্ত খরচ করলে জিনিসটা হাতে পাওয়া যাবে। বর্তমান ডাক অনুযায়ী সুমেরিয়ান ট্যাবলেটের জন্যে একজন দিতে রাজি এক লাখ বিশ হাজার ডলার।

'প্রশংসনীয় অত্যাধুনিক সেটআপ,' বলল এলেনা, 'এটা চালাচ্ছে কারা?'

'সেটা জানা কঠিন, তবে চিকন লোকটাকে এসব চালাবার

দায়িত্ব দেয়া হয়েছে,' বলল মেহেদি, 'দুনিয়ার চারপাশ থেকে আসছে আর্টিফ্যাক্ট। তবে আপাতত বেশি আসছে ইরাক থেকে। ওদের একের পর এক সাইট লুঠ হচ্ছে। এমনও হয়েছে, চোরাই জিনিস বিক্রির পর ক্রেতার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে। আবারও বিক্রি হয়েছে এই নিলামে।'

আইপ্যাডের দিকে তাকাল এলেনা। ডাক গিয়ে উঠেছে দু' লাখ ডলারে। স্পর্শ করেছে সবুজ রিযার্ভ বার। পরের কয়েক সেকেণ্ডে সবুজ লাইন পেরিয়ে গেল টাকার অঙ্ক।

এলেনা খেয়াল করল, অন্য সব নিলামের মতই এখানে প্রতিযোগিতায় নেমেছে মাত্র কয়েকজন। মালিক পক্ষের দিক থেকে এটাই ভাল কৌশল। একজন জানবে না, আসলে কে বা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। ফলে জেদ ও গর্ব বাধ্য করবে বেশি টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনতে।

প্রথম আইটেম বিক্রি হলো দু' লাখ আশি হাজার ডলারে।

মস্ত ঘরের মাঝে দুই গার্ড মখমল দিয়ে মুড়িয়ে দিল কারও অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট। ওটা চলে গেল কাঠের বাক্সের ভেতর। মোম সিল মেরে সরিয়ে রাখা হলো।

এবার এল একহারা লোকটার কণ্ঠ: 'এবার নিলামে উঠছে পারস্যের দেবী।'

এবার ডাক দিল এলেনা। এক লাখ ডলার।

'সাবধান,' বলল কণ্ট্রাক্টর মেহেদি। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্বিগুণ হলো ডাকের অঙ্ক। স্বস্তির শ্বাস ফেলল মেহেদি।

এলেনার কারণে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে দু'দল লোক। কয়েক দফা দাম বাড়ল জিনিসটার। তারপর হার মেনে নিল এক পক্ষ।

'চার লাখ সত্তর হাজার ডলার,' বিড়বিড় করল এলেনা। 'দেবীর পুরো শরীর পেলে কত গুণ খরচ করত?'

‘এতই, যে কখনও কিনতে পারতাম না,’ জোর দিয়ে বলল মেহেদি।

ঘরের মাঝে দেবীর মূর্তির মাথা মখমল দিয়ে মুড়িয়ে কাঠের বাক্সে রেখে দিল দুই গার্ড। বুকে মোমের সিল নিয়ে বাক্স চলে গেল একপাশে।

‘ওই সিল দিয়ে প্রমাণীকরণ করা হলো,’ বলল এলেনা।

‘আনুষ্ঠানিকতা,’ বলল মেহেদি, ‘এরা যে ধরনের লোক, কিছু চুরি করলে খুন হয়ে যাবেন ওদের হাতে।’

তৃতীয়বারের মত বেজে উঠল ঘণ্টি।

এবার নিলামে তোলা হলো গিলগামেশের মূর্তি।

পাঁচ লাখ ডলারে চট্ করে শেষ হলো ওটার জন্যে ডাক।

এবার চতুর্থ আইটেম: তাম্রলিপি।

স্ক্রিনের সবুজ বার জানিয়ে দিল, কমপক্ষে এক লাখ ডলার পেলে বিক্রি হবে।

চতুর্থ দলের তরফ থেকে এল ডাক: দেড় লাখ ডলার।

এলেনা ডাকল দু’ লাখ ডলার।

আট নম্বর প্রতিযোগী ডাকল আড়াই লাখ ডলার।

কিন্তু ওটাকে বাড়িয়ে তিন লাখ করল চার নম্বর দল।

তাদেরকে টপকে গেল এলেনা।

টাকার অঙ্কটা দেখে নিয়ে চুপ থাকল কণ্ট্রাক্টর মেহেদি।

আবারও ডাকল চতুর্থ নম্বর। পাঁচ লাখ ডলার।

সাড়ে পাঁচ লাখ ডলার ডাক দিল এলেনা। কিন্তু ওকে পেরিয়ে গেল চার নম্বর। সে দেবে ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার।

‘খুব সাবধান,’ নিচু স্বরে বলল মেহেদি, ‘ওরা আপনাকে বড়শিতে বাজিয়ে নিয়েছে।’

একমত নয় এলেনা। ওর ধারণা, বরং কয়েকজনকে গেঁথে নিতে পেরেছে। এই জিনিস যদি এতই দরকার ছিল আবু

রশিদের, সেক্ষেত্রে কাউকে নিলামে আকাশ পর্যন্ত তুলে দিলে, হয়তো বেরোবে কে বা কারা গুম করেছে আর্কিওলজিস্টকে বা খুন করেছে বিজ্ঞানীকে।

আট নম্বর দল থেকে ডাক দেয়া হলো সাত লাখ ডলার। তিন সেকেণ্ড পর বিরাট এক লাফে টপকে গেল চার নম্বর। আট লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার। এর কোনও দরকার ছিল না। বোধহয় নার্ভাস কোনও বিডার, খেলা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে প্রতিযোগীকে। ফলে খরচ করে বসছে অনেক বেশি টাকা।

এলেনা আট লাখ পঁচাত্তর হাজার ডলার ডাক দিতে চোখ কুঁচকে ফেলল কণ্ট্রাক্টর। তখনই ওই অঙ্কের টাকাকে পিছনে ফেলল চার নম্বর— নয় লাখ পঁচিশ হাজার ডলার!

'জানা দরকার এ কোন্ হারামজাদা,' বিড়বিড় করল এলেনা। অ্যাল্কোভ সব আলাদা, কেউ কারও মুখ বা হাত দেখবে না।

ডাক দিতে চেয়েছে এলেনা, নয় লাখ পঁচাত্তর হাজার ডলার। কিন্তু লাল একটা লাইন ফুটে উঠল আইপ্যাডের স্ক্রিনে। আবারও ডাক দিতে গেল ও, কিন্তু দেখা দিল সেই লাল লাইন।

ওর অ্যালকোভে হাজির হলো একহারা লোকটা, ফিসফিস করে বলল, 'মাদাম কি জমা টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চান?'

তাকে দেখল এলেনা, তারপর মেহেদির দিকে। 'মাদাম কি বাড়তি টাকা পেতে পারে?'

চোয়াল ফুলে গেল কণ্ট্রাক্টর মেহেদির। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখে-মুখে নিদারুণ কষ্ট নিয়ে মাথা দোলাল।

'সীমা কত?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল লম্বু।

'সব,' কর্কশ স্বরে বলল মেহেদি, 'পুরো তিন মিলিয়ন ডলার!'

খুব খুশি লম্বু, যেন এইমাত্র বড়শিতে গেঁথে নেটে তুলেছে মস্ত.

কাতলা মাছ।

'পুরো খরচ করতে হবে, এমন নয়,' কড়া চোখে এলেনাকে দেখল মেহেদি।

নিজের আইপ্যাডে কয়েকবার টোকা দিল লম্বু। আবারও সবুজ হলো এলেনার স্ক্রিনের লাইন।

এলেনা লক্ষ করল, কিছুক্ষণ ধরে কম টাকা বাড়িয়ে খেলছে চার নম্বর সদস্য। এর কারণ বোধহয়, টান পড়েছে তার পুঁজিতে।

বড় করে দম নিয়ে নতুন অঙ্ক টাইপ করল এলেনা। ডলারের অঙ্ক দেখে প্রায় অসুস্থকর সবুজ হলো কণ্ট্রাক্টর মেহেদির চেহারা।

এণ্টার বাটন টিপল এলেনা।

বিড করা হয়েছে পুরো দেড় মিলিয়ন ডলার!

প্রকাণ্ড ঘর ও সব অ্যালকোভ থেকে এল ফিসফিস কণ্ঠের আলাপ। টেবিলে মাথা রাখল মেহেদি। বুঝতে পারছে, কী সর্বনাশ হয়েছে!

তার দিকে ঘুরে আইপ্যাডের স্ক্রিন দেখাতে চাইল এলেনা। কিন্তু হাত সামনে বাড়িয়ে মাথা নাড়ল মেহেদি। 'না রে, সিস্, আমি জানতেও চাই না।'

আবারও স্ক্রিনের দিকে তাকাল এলেনা। অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময়ে ওকে পেছনে ফেলবে চার নম্বর সদস্য। কিন্তু ঠিক তখনই ধূসর হলো স্ক্রিন। তার মানে, ওই আর্টিফ্যাক্টটা পেয়ে গেছে এলেনা। তাম্রলিপি এখন ওর। ভেরিফিকেশনের জন্যে ওর কাছে চাওয়া হলো একটা কোড। ওটা ইলেকট্রনিক সিগনেচার।

দেরি না করে নাসের আল মেহেদির হাতে আইপ্যাড ধরিয়ে দিয়ে খুশি খুশি সুরে বলল এলেনা, 'আপনি অন্তত পাঁচ পার্সেন্ট পাবেন।'

'নিজের সব টাকা খরচ করে তার পাঁচ পার্সেন্ট ফিরে পেলে চলবে আমার ব্যবসা?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেহেদি। করুণ চেহারায়

টাইপ করল কোড।

কাজ শেষ। আবু রশিদের ওই তাম্রলিপি এখন সত্যি এলেনার। জানে না, আসলে পুরো দেড় মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলল কি না। এবার কী করবে ভাবছে, এমন সময় বাইরের ঘর থেকে এল কর্কশ চিৎকার। রেগে গেছে কেউ। সন্দেহ কী, সে চার নম্বর সদস্য। নিচু স্বরে কী যেন তর্ক করছে কারও সঙ্গে।

ঝনঝন করে ভাঙল একটা কাঁচ। ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেল কে যেন। খুলে গেল ভারী দরজা, আবারও বন্ধ হলো দড়াম করে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনি।

প্রকাণ্ড ঘরের মাঝে থামল একহারা লোকটা, ওখান থেকে প্রতিটি অ্যালকোভ দেখছে। নরম সুরে বলল, 'চার নম্বর বিডার বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু চলবে আমাদের নিলাম।'

ওই লোক আসলে কে জানলে ভাল হতো, ভাবল এলেনা। ঠিক করল, পরে চেষ্টা করবে লম্বুর পেট থেকে খবর বের করতে। তবে, নকল কোনও নাম ব্যবহার করে থাকতে পারে চার নম্বর। স্মৃতি হাতড়াল ও। ওই লোক ছিল ছয় ফুট লম্বা। চওড়া কাঁধ। কালো চুল বাদামি চোখ। এবড়োখেবড়ো দাঁত। ভাঙা দু'একটা। এসব তথ্য এনআরআই চিফকে দিলে কমপিউটারে খুঁজে দেখা হবে প্রোফাইল। পাওয়া যেতে পারে তাকে কোথাও।

পরের আইটেমের জন্যে শুরু হয়েছে বিড।

এলেনার হাতে আইপ্যাড ধরিয়ে দিল মেহেদি। 'নিন, খতম করে দিন আমাকে।'

মিষ্টি হাসল এলেনা। খামোকা তিক্ত চেহারা করে বসে আছে কণ্ট্রাক্টর। আগামীকাল সকালেই ইউএস সরকারের কাছ থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা ফিরে পাবে সে। 'আমার কাজ শেষ,' বলল ও। 'যা চেয়েছি, পেয়ে গেছি।'

গার্ডরা যেদিকে তাম্রলিপি বাক্সে ভরছে, সেদিকে তাকাল

এলেনা। একটা কেসে জিনিসটা রাখল লোকদু'জন। মোম গেলে সিল করে দিল। তখনই সামান্য কেঁপে উঠল চারপাশ।

মৃদু ভূমিকম্প?

একবার প্রায় নিভেই আবার জ্বলতে লাগল সব বাতি। টিং-টিং শব্দে নড়ে উঠেছে কয়েকটা কাঁচের গ্লাস।

মস্তবড় ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল এলেনা। ওদিকের দেয়ালের কাছে জ্বলছে এক সারি মোমবাতি। একটু কেঁপে গেল লাল-হলদে শিখা। যেন ঘর থেকে ভুস করে টেনে নেয়া হয়েছে অনেক বাতাস।

এলেনার মনে হলো না পরিবর্তনটা খেয়াল করেছে কেউ। ওর নিলামের ডাক নিয়ে এখনও ফিসফিস করে আলাপ করছে অন্যরা। বিপদের আশঙ্কায় খাড়া হয়ে গেল ওর ঘাড়ের ছোট ছোট রোম। নিচু স্বরে বলল, 'কোথাও গোলমাল আছে।'

মাথা দোলাল নাসের আল মেহেদি। 'চলুন, বেরিয়ে যাই।'

টেবিলে আইপ্যাড রেখে উঠে দাঁড়াল এলেনা, কিন্তু তখনই শুনল জোরালো ভারী আওয়াজ।

ওটা হয়েছে দূরে, কিন্তু থরথর করে কাঁপল গোটা ঘর। কড়িবরগা থেকে ঝরঝর করে ঝরল ধুলো। বার-এ টুং-টাং শব্দে দুলল বোতল। ঠুস্ শব্দে মেঝেতে পড়ে ভাঙল একটা গ্লাস।

এবার খেয়াল করেছে সবাই।

অ্যালকোভ থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে চলল এলেনা ও মেহেদি। কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে থরথর করে কাঁপছে পুরো দালান। ছিটকে খুলে গেল ভারী দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ঘন ধুলোর ঝড়। চারপাশ হলো প্রায় রাতের মত আঁধার।

পঁচিশ

নাক চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়েছে এলেনা। ধুলোর ভেতর আটকে আসতে চাইছে শ্বাস। ওর হাতে পরিষ্কার রুমাল তুলে দিল রানার বন্ধু। নাকে-মুখে কাপড় ধরার পর একটু স্বস্তি পেল এনআরআই এজেন্ট।

'আমরা কি বেরিয়ে যাব?' জানতে চাইল মেহেদি।

অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে এলেনা। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে ওর মনে হয়েছে, দূরের করিডোরে ফেটেছে স্টান গ্রেনেড। আসার পথে ওদিকে দেখেছিল সশস্ত্র লোক।

খোলা দরজা দিয়ে এল কয়েকজনের চিৎকার। করিডোর থেকে প্রকাণ্ড ঘরে এসে ঢুকল এক গার্ড, রক্তাক্ত।

তার দিকে ছুটে গেল লম্বু, দু'জন মিলে বন্ধ করল পুরু কাঠের দরজা। আটকে দিতে গেল হুড়কো, কিন্তু তখনই প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলা হলো কবাট। একহারা আর আরব গার্ড ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

নিলামের দুই গার্ডের একজন গুলি পাঠাল দরজা দিয়ে বাইরে। এদিকে এক লাফে ওর অ্যালকোভে ঢুকল এলেনা।

প্রকাণ্ড ঘরে চিৎকার করে কিছু বলল কেউ। ভাষা লেবানিজ।

মাথার ওপর হাত তুলেছে নাসের আল মেহেদি। পৌঁছে গেল অ্যালকোভে এলেনার পাশে। 'আমরা আত্মসমর্পণ করছি!'

'আত্মসমর্পণ?' চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল এলেনা।

'মনে তো হচ্ছে রেইড করা হয়েছে।'

'পুলিশ তো আপনাদের পকেটে থাকে,' বলল এলেনা, 'তা হলে কী হচ্ছে?'

'আমাদের চেয়েও বড় কোনও পার্টি টাকা দিয়েছে পুলিশের বড় অফিসারদেরকে,' বলল মেহেদি।

অ্যালকোভে এসে ঢুকল একহারা ডিলার, মাথার ওপর দু'হাত। বাইরের ঘরের মাঝে থেমেছে ইউনিফর্ম পরা একদল ট্রুপার। হাতের অস্ত্র তাক করেছে অ্যালকোভের দিকে। তাদের কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে এলেনা ও মেহেদি। হামলা করা বা পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এইমাত্র ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল এক লোক, বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতি। এই নতুন দলের কমাণ্ডার সে। এক পলক দেখল এলেনা ও মেহেদিকে, তারপর তার চোখ স্থির হলো আর্টিফ্যাক্টগুলোর ওপর।

এলেনার মনে পড়ল, প্যারিসে পুলিশের পোশাক পরে বিজ্ঞানী আহসান মোবারককে খুন করেছিল একদল সন্ত্রাসী। বাঙালি ডক্টর চিঠিতে লিখেছিলেন: *ওরা বুঝে গেছে সব। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। একবার ধরতে পারলে মেরে ফেলবে আমাকে।*

সত্যিই এরা হামলা করছে ঝড়ের গতি তুলে। কেউ বুঝবে না কখন কী করবে।

'সবকিছু গোলমেলে লাগছে,' বলল এলেনা।

'হ্যাঁ, তবে ঝামেলা ঠিক করে ফেলা হবে,' বলল লম্বু।

ট্রুপারদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে ফিসফিস করে বলল এলেনা, 'আমার তা মনে হয় না। এটা রেইড নয়। ডাকাতি।'

'এসব কী বলছেন!' আঁৎকে উঠল লম্বু।

'দেরি না করে যা করার করতে হবে, নইলে এদের হাতে খুন হব আমরা,' সহজ সুরে বলল এলেনা।

কড়া চোখে ওকে দেখল লম্বু। 'আপনি কি পাগল নাকি? কেন আপনার কথা শুনতে যাব?'

'আমি পাগল হলে শুনতেন?' বিরক্ত হয়ে বলল এলেনা।

'না, তা নয়।'

'তা হলে শুনুন, ভাল করেই জানি আপনি আপনাদের দলের দ্বিতীয় নেতা। আর গার্ডের ভঙ্গি নিয়ে একটু আগে যে রক্তাক্ত আরব ঘরে ঢুকল, সে প্রধান নেতা। সে ইরাকি। পুরো নিলাম চালায় সে। ভুল বললাম?'

'হ্যাঁ, ভুল,' বলল লম্বু। 'আমরা দু'জন সমান পার্টনার।'

'আপনাকে অপমান করতে চাইনি,' বলল এলেনা। 'কিন্তু আসল কথায় আসি, নিজ চোখে যা দেখছেন, তা কিন্তু বড় ধরনের নাটক। ট্রুপারদের পায়ের জুতো দেখুন। আপনার মনে হচ্ছে ওগুলো কোনও সৈনিকের?'

সশস্ত্র লোকগুলোর পা-র দিকে তাকাল একহারা। তাদের পায়ে পালিশ করা সৈনিকের বুটের বদলে হাইকিং বুট।

আর্টিফ্যাক্টের বাক্সের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল নকল ট্রুপারদের নেতা, কী যেন খুঁজছে। তার পায়ে কমব্যাট বুট নেই, ব্যবসায়ীর শু্য।

'শালারা নকল,' ফিসফিস করল লম্বু। 'কিন্তু এই অবস্থায় কী করব?'

ঘরের মাঝে তার দুই সৈনিকের সামনে থামল নকল দলের নেতা। কথা বলছে ফিসফিস করে। ঠিক করছে এরপর কী করবে তারা।

'এরা নিচে নামল কী করে?' জানতে চাইল এলেনা।

'চারপাশে মাটির নিচে সমাধিক্ষেত্র, নানান দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়,' বলল মেহেদি।

এলেনা কিছু বলার আগেই ওদের অ্যালকোভে এসে ঢুকল

সন্ত্রাসীদের নেতা। কোনও কথা না বলে খপ করে ধরল এলেনার বাহু, টেনে নিয়ে গেল আর্টিফ্যাক্টের বাক্সের কাছে। বাধা দেয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি এলেনা। ফলে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে মুঠো একটু আলগা করেছে লোকটা।

দরজার দিকে ঘুরে তাকাল সে। আর ওই একই সময়ে ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটার কনুই মুচড়ে ধরল এলেনা। ওর অন্য হাত নেমে এল হাতুড়ির মত। খট্ আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল নেতাজির বাহুর হাড়।

তখনই গায়ের জোরে এক গার্ডের দিকে লম্বুকে ঠেলে দিল মেহেদি, নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তৃতীয় গার্ডের ওপর।

এদিকে ঘুরেই হোপলাইট ডোরি তুলে নিয়েছে এলেনা। অস্ত্রটার রুপালি অংশ নামল প্রথম গার্ডের ঘাড়ের ওপর। বর্শার অন্য দিক খটাস্ করে পড়ল আরেক গার্ডের মাথার তালুতে।

দলের চারজন আহত, কিন্তু গোলাগুলি শুরু করল অন্যরা।

লাফিয়ে আলাদা দুই অ্যালকোভে ঢুকল এলেনা ও মেহেদি। ওদিকে ঘরের দূর থেকে পাল্টা গুলি করল নিলামের গার্ডরা।

এলেনার পাশে পৌঁছে গেছে একহারা। প্রায় চেপে এসেছে ওর দিকে।

'পিছনে লুকিয়ে পড়ুন,' ধাক্কা দিয়ে তাকে অ্যালকোভের এক কোণে পাঠিয়ে দিল এলেনা। বর্শা চালাতে হলে যথেষ্ট জায়গা চাই। 'মেহেদি!' চিৎকার করে ডাকল।

'আমি ঠিক আছি,' এল জবাব। 'পারলে বেরিয়ে যান!'

লম্বুর দিকে ফিরল এলেনা। 'বেরিয়ে যাওয়ার পথ? আপনি এসেছিলেন কোন্ পথে?'

প্রকাণ্ড ঘরের শেষমাথা দেখাল লম্বু। কিন্তু উপায় নেই ওদিকে যাওয়ার। একাধিক দিক থেকে আসবে গুলি। ঝাঁঝরা হতে হবে। এমনিতেই চারপাশের দেয়ালে লাগছে গুলি। নানান দিকে ছিটকে

যাচ্ছে পাথরের দেয়ালের কুচি।

অ্যালকোভ থেকে সাবধানে উঁকি দিল এলেনা। আহত সঙ্গীদেরকে সামনের দরজার দিকে সরিয়ে নিচ্ছে নকল ট্রুপারদের কয়েকজন। কিন্তু তাদের সঙ্গে আরেকটা জিনিস! ওই বাক্সের আকার ও আকৃতি দেখে ওর মনে হলো, হাত ছাড়া হচ্ছে ওর সাধের তাম্রলিপি!

'স্ক্রল ওদের কাছে!' চিৎকার করে জানাল এলেনা।

'নিজের টাকা ফিরে পেতে হবে আমাকে!' রাগী গলায় বলল মেহেদি।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে দলের শেষ দু'জন। ধোঁয়ার গন্ধ পেল এলেনা। সেই সঙ্গে পেট্রোলিয়ামের গন্ধ। অ্যালকোভের কিনারা থেকে দেখল, লোকগুলো দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছে ম্যাচের বেশ কয়েকটা জ্বলন্ত কাঠি।

মেঝেতে অগভীর পেট্রোলিয়ামের ডোবায় দপ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। প্রকাণ্ড ঘরের সামনের দিক চাটছে লেলিহান নীল শিখা।

থেমে গেল গোলাগুলি। বদ্ধ ঘরে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল ধোঁয়া ও তাপ। দম আটকে মরার পরিবেশ।

'বেরিয়ে যেতে হবে!' চেঁচিয়ে বলল এলেনা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের অ্যালকোভ থেকে বেরোল কণ্ট্রাক্টর মেহেদি, প্যান্টের ঊরুতে রক্ত।

সামনে বেড়ে এক হাতে তার ওজন নিল এলেনা।

'আমি ঠিক আছি,' বলল মেহেদি। 'কোনও সমস্যা নেই।'

'আপনি দেখান কীভাবে এখান থেকে বেরোতে হবে,' কড়া সুরে লম্বুকে বলল এলেনা।

'আসুন!' এলেনা ও মেহেদির সামনে সামনে চলল একহারা।

চলেছে ঘরের পেছনের দিকে।

এখনও এক হাতে এলেনার বর্শা। এগোবার সময় সুস্থ ও আহতদেরকে সঙ্গে নিল ওরা।

পেছনের ঘরের পাশের দেয়ালে একটা ট্র্যাপডোর সরাতেই দেখা গেল স্টেয়ারওয়েল। সদলবলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সবাই, শহরের ওঅটার টেবিলের খুব কাছে পৌঁছে গেছে। সামনেই পড়ল সরু ওয়াকওয়ে। পাশেই পানিতে ভরা মস্ত এক গভীর দিঘি।

একটা সিঁড়ি বেয়ে নামার পর সামনে পড়ল আরেকটা স্টেয়ারওয়েল। ওটা গেছে ওপরে। বিপদের গন্ধ পেল এলেনা। চাপা স্বরে বলল, 'ওরা এদিকে চোখ রাখবে। অন্য পথ ব্যবহার করুন।'

'অন্য কোনও পথ চিনি না,' বলল লম্বু।

নাসের আল মেহেদির দিকে তাকাল এলেনা।

মাথা নাড়ল কণ্ট্রাক্টর।

'খুঁজে বের করে নেব, চলুন,' বলল এলেনা।

নিকষ অন্ধকারে হেঁটে চলল ওরা। কিছুক্ষণ পর একদম হারিয়ে গেল সরু পথ, আছে অগভীর পাথরের নালা। পা ভিজিয়ে আধ মাইল হাঁটল ওরা। ওপরে উঠছে নালা। আরও কিছুক্ষণ চলার পর গাঢ় অন্ধকারে দেখা গেল একটা শাফট। ওখানেই পাওয়া গেল নতুন স্টেয়ারওয়েল। ওপর থেকে এল আবছা আলো। তাতেই খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

কিছুক্ষণের ভেতর সিঁড়ি বেয়ে ওপরের রাস্তার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একহারা ও এলেনা মিলে ঠেলে তুলল ভারী ঝাঁঝরির মত গ্রেট। অন্যরা উঠে এল গলিতে। নাসের আল মেহেদি ছাড়া কেউ গুরুতরভাবে আহত নয়, নিলামের অন্য সদস্যরা যে যার মত হারিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

লম্বু ও তার পার্টনার রয়ে গেল গলির ভেতর ঝাঁঝরির পাশে। নীলচে আলোয় তাদেরকে দেখাল ভিন গ্রহের প্রাণীর মত।

'আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ,' বলল লম্বু, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, ওটা রেইড হতে পারে না। সব জায়গায় ঠিকমত ঘুষ দিই আমরা।'

'জরুরি তথ্য দিয়ে শোধ করতে পারেন ঋণ,' বলল এলেনা। 'যেমন, ওই পার্টিতে কারা এসেছিল।'

'বলার উপায় নেই,' বলল লম্বু। 'বললে খুন হয়ে যাব।'

'তা হলে জানাতে পারেন কোন্ ঠিকানায় এদের আর্টিফ্যাক্ট পৌঁছে দেন,' বলল এলেনা, 'এমন তো নয় যে আপনাদের নিলাম থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের মূর্তি, কাদার ট্যাবলেট বা পাঁচ ফুটি বর্শা বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরবে এরা।'

'এসব পৌঁছে দেয়া হয় লণ্ডনে বা কায়রোর ব্যাঙ্কে। বা আবু ধাবির কোনও অফিস দালানে।' মাথা নাড়ল লম্বু। 'এসব জেনে কোনও লাভ হবে না আপনাদের।'

ধরা পড়বার ভয় পাচ্ছে লোকটা, ভাবল এলেনা। 'তা হলে একটা ইনফর্মেশন দিন: কে ছিল আপনাদের চার নম্বর বিডার।'

'আগেই বলেছি, মাদাম...'

'আপনি কিন্তু একটা দিক খেয়াল করেননি, সৈনিকরা যখন এল তাদের সঙ্গে ছিল না ওই লোক।'

দ্বিধায় পড়ল লম্বু। যেন মনের ভেতর তথ্য হাতড়ে চলেছে। আরবি ভাষায় আলাপ করল ইরাকি পার্টনারের সঙ্গে, তারপর বলল, 'নিলামের ওই শেষ সময়ে টাকার অভাবে রেগে গিয়েছিল।'

'সে লোকই গুণ্ডাদল পাঠিয়ে নিয়ে গেছে তাম্রলিপি,' বলল এলেনা। 'অন্য কিছু কিন্তু নেয়নি ওরা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, তাম্রলিপি দখলের ওই ব্যাকআপ প্ল্যান রেখেছিল সে-ই।'

'শুধু জানি নাম মার্ডক, এখানে আছে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। কাজ করে এক গ্রিকের হয়ে, ডেলিভারি অ্যাড্রেস কুয়েত সিটিতে।'

'আর ওই তামার লিপি, ওটা এসেছিল কোথা থেকে?' জানতে চাইল এলেনা।

'এক ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছ থেকে,' বলল লম্বু। 'শুনেছি মরুভূমিতে পেয়েছিল একদল বেদুঈন। বড় সংগ্রাহক নয় ওই লোক, কোথা থেকে পাওয়া গেছে তা-ও বলতে পারেনি।'

'কী কারণে একদল লোকের কাছে ওটা এত জরুরি?'

মাথা নাড়ল লম্বু।

'ওটার জন্যে এরই ভেতর খুন হয়ে গেছে কমপক্ষে হাফ ডজন লোক,' বলল এলেনা। 'ওটা এত বড় শিল্প হয়ে ওঠেনি যে মানুষ খুন করতে হবে।'

'কী কারণে এত দামি, জানি না,' বলল লম্বু। 'আবু রশিদ ছাড়া কেউ অত আগ্রহ দেখাননি। তারপর আজ রাতে পাগল হয়ে গেল ওরা। ওই তামার লিপির সঙ্গে বিক্রির কথা ছিল পারস্যের দেবীর মুখ। পরে আলাদা করে ফেলা হয়।'

নাসের আল মেহেদির দিকে তাকাল এলেনা। লোকটার উরু থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত। বুলেটের ক্ষতটা গভীর। দেরি করা ঠিক হবে না, তাকে পৌঁছে দেয়া উচিত হাসপাতালে।

লম্বুর দিকে আবারও তাকাল এলেনা। 'আপনাদের কাছে ওই তামার লিপির ছবি আছে। যেগুলো দিয়েছেন, যথেষ্ট ভাল নয়। ভাল কোনও ছবি আছে?'

মাথা দোলাল লম্বু।

'ওগুলো আমার দরকার,' বলল এলেনা। 'পেয়ে গেলে ধরে নেব আপনারা ঋণ শোধ করে দিয়েছেন।'

ইরাকি পার্টনারের সঙ্গে আরবিতে আলাপ করল লম্বু, তারপর

মাথা দোলাল। 'কোথায় পাঠিয়ে দেব?'

আহত নাসের আল মেহেদিকে দেখিয়ে দিল এলেনা। 'আমি ওঁকে নিচ্ছি হাসপাতালে। তাঁর হাতে দিয়ে দেবেন ছবি। তিনি জানবেন কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে।'

ছাব্বিশ

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ঝলমলে উষ্ণ রোদ। যে কারও মন চাইবে সৈকতে গিয়ে শুয়ে-বসে রোদ পোহাতে। হাতে থাকবে শীতল বিয়ার। কিন্তু ছেলের বাড়ির পেছনের বাগানে বন্দি হয়েছেন প্রফেসর পিট বার্ডম্যান। পাঁচ বছরের নাতিকে দেখে রাখার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর। বিরাট এক প্লাস্টিকের ক্লাব দিয়ে প্লাস্টিকের বড় এক গলফ বল-এ বাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছে টম। এখন পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই আশপাশের ঘাস ও গাছের বারোটা বেজে গেছে। এরই ভেতর দুই হাঁটুর বাটিতে চারটে বাড়ি খেয়েছেন প্রফেসর। কিন্তু নাতির উৎসাহের অভাব নেই। তার গায়ে তো লাগছে না।

বাড়ির ভেতর টেলিফোন বেজে উঠতেই ওদিকে মনোযোগ গেল প্রফেসর বার্ডম্যানের। 'তুমি চালিয়ে যাও,' কণ্ঠে আদর ঢেলে বললেন। 'গ্র্যাণ্ডপা ফোন ধরতে গেল।'

চওড়া হাসল টম। এসব দারুণ সুন্দর হাসি দেখা যায় শুধু পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়েদের মুখে। পরক্ষণে টমের ক্লাবের

মারাত্মক এক হামলায় গাছ থেকে ছিটকে গেল অপরূপ সুন্দর মস্ত এক গোলাপ।

বাড়িতে পা রেখে বিড়বিড় করলেন প্রফেসর, 'এবার বলব সিনডারেলার গল্প... তা হলে যদি ব্যাটা ব্যাট ছাড়ে!'

পেছনে বন্ধ করে দিলেন স্ক্রিন ডোর। তুলে নিলেন ফোনের রিসিভার। 'হ্যালো।'

'প্রফেসর,' ওদিক থেকে এল নরম নারী কণ্ঠ।

চিনে ফেললেন প্রফেসর বার্ডম্যান। ওদিকের মেয়েটাকে খুব স্নেহ করেন তিনি। কিন্তু একই সঙ্গে মনে এল: টেলিমার্কেটার ফোন করলেই বুঝি ভাল ছিল। মৃদু হেসে বললেন, 'কবে আমাকে বলবে যে রিটায়ার করছ? ভাল করে খুঁজে দারুণ কোনও চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

'না, প্রফেসর, আছি আরামে,' বলল মেয়েটা, 'একটা সাহায্য চাইতে ফোন করলাম। আসলে দরকার জ্ঞান। সময় দিতে পারবেন?'

একটু গম্ভীর হলেন প্রফেসর বার্ডম্যান। গত দু'বছর ধরে কাজ করেছেন এনআরআই-এর হয়ে। বার কয়েক মস্তসব বিপদেও পড়তে হয়েছে। 'আমার গুলি খাওয়া হাঁটুর ব্যথা কিন্তু সারেনি এখনও। এসব মারাত্মক মিশন বাদ দিয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, এবার বিয়ে করে ফেলো বাঙালি হ্যাণ্ডসাম ছেলেটাকে। নইলে...'

'আপনাকে কোনও ঝুঁকি নিতে হবে না, প্রফেসর,' বলল মেয়েটা, 'একটা জিনিস একটু শুধু দেখে দিলেই হবে।'

স্বস্তি পেলেন বার্ডম্যান। 'তোমার সঙ্গে রানাও আছে?'

'না, প্রফেসর, ও আপাতত অন্য কাজে ব্যস্ত,' বলল এলেনা।

'তুমি নিজে কী নিয়ে ব্যস্ত?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'এখন সব খুলে বলতে পারব না, স্যর, কিন্তু আপাতত দেখছি প্রাচীন একটা লিপির ছবি। স্বাভাবিক জিনিস না। তামা

দিয়ে তৈরি। জানা দরকার ওটার সব লেখা অনুবাদ করা যায় কি না।'

'তার মানে ডেড সি-র ওই তাম্রলিপির মত?'

'অনেকটা তা-ই, কিন্তু শুনেছি আরও অনেক পুরনো।'

'কোত্থেকে এল?'

'ইরাকের কাছে, বা ইরানে। ওটার লেখা সুমেরিয়ান মনে করা হচ্ছে। কিন্তু ক্লিংঅনও হতে পারে।'

হাসলেন প্রফেসর। 'সুমেরিয়ান অনুবাদ করতে পারব। আর কয়েকজনকে চিনি, ওরা ক্লিংঅনও অনুবাদ করতে পারবে।'

'তা-ই?' হাসল এলেনা, 'এনক্রিপটেড ই-মেইলে পাঠাচ্ছি।'

'পাসওঅর্ড কী?'

'শেষ অভিযানে যাওয়ার তারিখ মনে আছে, প্রফেসর?'

'ভুলি কী করে? পঞ্চম দিনে ফুটো হয়ে গেল আমার হাঁটু।'

'ঠিক আছে, প্রফেসর, রওনা হয়ে গেছে ই-মেইল। কিছু পেলে মিস্টার ব্রায়ানকে জানাবেন, তিনি জানেন কোথায় থাকব।'

ছেলে ও তার স্ত্রীর সাজানো, ছিমছাম, সুন্দর ঘরটা দেখলেন প্রফেসর। তাঁর পরনে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট ও হাওয়াইয়ান টি-শার্ট। নিরাপদ, শান্ত এক পরিবেশে বাস করছেন। মন চাইল না আবারও ঝাঁপ দিতে ভয়ঙ্কর বিপদে। কিন্তু একই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন চিন্তিত। জটিল কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এলেনা। নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে আছে ওই বাঙালি দুর্ধর্ষ ছেলেটা? মারাত্মক সব বিপদে জড়িয়ে যায় ওরা।

'আমার কি সতর্ক হওয়া উচিত?' জানতে চাইলেন বার্ডম্যান।

'আপাতত নয়,' বলল এলেনা। 'যে কাজে আছি, সেজন্যে একটুও বিপদে পড়বেন না আপনি।'

'কিন্তু...'

'খারাপ একটা কিছু ঠেকাতে চাইছি, নইলে মস্ত বিপদ হবে,'

বলল এলেনা।

ঝুঁকি না নিয়ে উপায় থাকে না ওদের, ভাবলেন প্রফেসর।

'এসবের সঙ্গে তামার লিপির সম্পর্ক নেই, এমন হতে পারে,' বলল এলেনা, 'আবার থাকতেও পারে। জরুরি একটা সূত্র পেয়ে এগোতে হচ্ছে। দেরি করা ঠিক হবে না।'

প্রফেসর একবার ভাবলেন বিষয়টি কী জানতে চাইবেন, কিন্তু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন চিন্তাটা। এমনিতেই ওই বাঙালি ছেলেটা বা এই মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ তিনি। না, এলেনার পেট থেকে জোর করে তথ্য বের করার চেষ্টা অনুচিত হবে। এসব হয়তো জটিল কোনও কিছুর অংশ। সব জানতে গিয়ে নিজের ছেলে, ছেলে-বউ আর নাতিকে বিপদে ফেলবেন কেন! তবুও জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের অবস্থা কেমন?'

'ভাল না। নইলে আপনার সাহায্য চাইতাম না।'

বড় করে দম নিলেন প্রফেসর। 'ঠিক আছে। ই-মেইল পেয়ে গেলেই কাজে নামব।'

সাতাশ

দুবাইয়ের নীলচে জলের মেরিনা থেকে সরে যাচ্ছে চল্লিশ ফুটি, পুরনো কেবিন ক্রুযার। ওটার মালিক ছিলেন মিনা মোবারকের স্বামী, মারা গেছেন কয়েক বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায়।

প্রথম থেকেই বিপত্নীক ভাইয়ের মেয়ে কিশোরী মোনা ও শিশু মিনতির লালন-পালনের জন্য মন ঢেলে দিয়েছিলেন নিঃসন্তান

মিনা মোবারক। গত দশ বছরে আরও বেড়ে গেছে ভালবাসা। একমাত্র উদ্দেশ্য ভাইয়ের দুই মেয়েকে ভাল রাখা।

কেবিন ক্রুযারের পেছনে আছে রানা। পাইলটিং করছেন মিনা মোবারক। পেছনে দুবাই শহরের কোটি ঝলমলে হরেকরঙা বাতি। এখনও দূরে দেখা যাচ্ছে বুর্জ আল আরব হোটেলের নিচ থেকে ওঠা কালো ধোঁয়া। শহরের এত আলোর কারণে মাথার ওপরের আকাশে নক্ষত্র উধাও। সাগরে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে কোনও জলযান নেই। রানার মনে হলো, ওরা হারিয়ে যাচ্ছে সাগরের গভীর শূন্যতায়।

বোটে ওঠার পর ডক্টর মোবারক সম্বন্ধে মোনার কাছে জানতে চেয়েছে রানা। ওর জানা দরকার, কোন্ ধরনের লোকের সঙ্গে মিশছিলেন তিনি। এমন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যেটা পরে কাজে আসবে। এদিকে মোনা আর ওর ছোট বোনের কারণে কঠিন হয়ে গেছে পরিস্থিতি। যখন-তখন ওদের ওপর হামলা হবে।

রানা প্রশ্ন শুরু করতেই বাধা দিয়েছে মোনা। ছোট বোনকে নিয়ে গেছে সামনের কেবিনে। মিনতিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর আসবে। রানার মনে হয়েছে, বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত শোক কাটিয়ে উঠেছে মোনা। একই কথা খাটে মিনা মোবারকের ক্ষেত্রে। শান্ত হাতে রাতের সাগরে নিয়ে চলেছেন কেবিন ক্রুযার।

বাবার ভালবাসা পায়নি মিনতি, বড় হয়েছে ফুফুর কাছে। তাই বাবার মৃত্যু-সংবাদ বড় ধরনের ঝাঁকি দেয়নি বাচ্চা মেয়েটাকে। তার ওপর গুরুতরভাবে অসুস্থ। কেবিন ক্রুযারে ওঠার সময় রানা দেখেছে, খুব কষ্ট হয়েছে বেচারির। মোনা বলেছে, খুব জটিল আর্থ্রাইটিস মিনতির। এ ছাড়া, ভারী পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করতে হয় বয়স্ক মানুষের মত।

হঠাৎ ডক্টর মোবারকের একটা প্রশ্ন জেগে উঠল রানার মনে। মাঝে মাঝে ওই বিষয়ে ভাবতেন ভদ্রলোক। *আমাদের মত মানুষকে শাস্তি দিচ্ছেন স্রষ্টা। আমাদের উচিত ছিল না এতকাল বেঁচে থাকা।*

ডক্টর মোবারকের মনে এসব এসেছে হয়তো মিনতির অসুখ হওয়ার পর। বোনের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন অসুস্থ মেয়েকে। সত্যিকারের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, তিনি কি চেষ্টা করেননি ওই রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে? নাকি তাঁরই এক্সপেরিমেন্টের কারণে মেয়েটার এই অবস্থা? নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন এমন এক ড্রাগ, যেটা কমিয়ে দেয় আয়ু? প্রয়োগ করেছিলেন নিজের শিশু মেয়ের ওপর? ডক্টর মোবারকের ল্যাবে বয়স্ক ইঁদুর দেখেছে এলেনা। কিছুই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

হয়তো এ কারণেই স্রষ্টার প্রতিশোধের কথা ভেবেছেন। এমন এক জেনেটিকস বিজ্ঞানী, যিনি খেলেছেন জীবন বা আয়ু নিয়ে। রেলিঙে হাত রেখে চুপ করে আঁধার সাগরে চোখ রাখল রানা। সামনে খুলে গেল কেবিনের দরজা। পাশে এসে দাঁড়াল মোনা। ওর বাহুতে হাত রেখে নীরবে যেন জানাচ্ছে কৃতজ্ঞতা। ফিরে মোনার চোখে তাকাল রানা। খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে মেয়েটা।

'কিছু প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন,' বলল রানা। 'তোমার বাবা যাদের সঙ্গে মিশছিলেন, তাদের সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

রানার বাহু থেকে হাত সরিয়ে দূরে তাকাল মোনা। 'খুব বেশি কিছু জানি না। আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর আলাদা পথে হেঁটেছি। দু'জনের যোগাযোগ হয়েছে কখনও, কিন্তু...'

চুপ হয়ে গেল মোনা। ফিরল রানার দিকে। 'তোমাকে বলেছি, [illegible]া অন্তত বারোবার ঝগড়া হয়েছে।'

'কী কারণে?'

'কারণ অন্যরকম জীবন চেয়েছি।'

'তা হলে এক সঙ্গে কাজ করতে কেন? অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তোমার।'

আবারও সাগরে চোখ রাখল মোনা। 'বাবার সঙ্গে কাজ করেছি মিনতির জন্যে।'

এসবের সঙ্গে জড়িত বাচ্চা মেয়েটার অসুখ। তার সঙ্গে মিশে গেছে কাল্টের বিপদ।

'কাল্টের হয়ে কাজ করতে গেলেন কেন তিনি?'

'তাঁর পছন্দ মত কোথাও ভাল সুযোগ ছিল না। বাধ্য হয়েই ওই নিষ্ঠুর লোকগুলোর হয়ে কাজ করতে রাজি হন।'

'কত দিন ধরে কাজ করেন?'

'অন্তত এক বছর,' বলল মোনা। রানার চোখে চোখ রেখেও সরিয়ে নিল দৃষ্টি। 'বাবাকে খুব নির্যাতন করেছে?'

অদ্ভুত প্রশ্ন।

নরম সুরে বলল রানা, 'ওরা তাঁকে খুন করেছে।'

'জানি। কিন্তু মৃত্যু এক কথা, আর প্রচণ্ড কষ্ট দেয়া অন্য কিছু। কখনও চাইনি বাবাকে কষ্ট দিক কেউ। মৃত্যুর চেয়েও বেশি কষ্ট আছে। আফ্রিকায় জেনারেলরা ভয়ঙ্কর সব শাস্তির কথা বলত, মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলত।'

চুপ করে থাকল রানা।

'রানা, একবার বল, বাবাকে কষ্ট দেয়নি ওরা,' ভেজা কণ্ঠে বলল মোনা।

মিথ্যা বলতে বাধল রানার, সংক্ষেপে বলল, 'এ ধরনের লোক সহজে মরতে দেয় না।'

সাগরের অন্ধকারে তাকাল মোনা। আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ। সামলে নিতে চাইছে অশ্রু।

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল রানা, 'আসলে কী হয়েছে মিনতির?'

পাশের গদিওয়ালা বেঞ্চে বসে বলল মোনা, 'জানতে চাও

আসলে কী হয়েছে ওর?'

'হ্যাঁ।'

'বলতে পারো *কী হচ্ছে*।'

'এখনও হচ্ছে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল মোনা। 'হ্যাঁ, ওর যা হচ্ছে, তা ঘটছে সবারই। কিন্তু তার ভেতর তফাৎ আছে।'

রানার মনে পড়ল, বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকার কথা। কবে যেন পড়েছিল, এ ধরনের এক-দু'জন বাচ্চা ছেলে-মেয়ে পাওয়া গেছে, যারা অকালে বুড়িয়ে যায়। বেশি দিন বাঁচে না।

কানের ওপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে দিল মোনা, হাতের ইশারা করল রানাকে পাশে বসতে।

বসল রানা। বুঝতে পারছে, অনেক কথা জমে আছে মোনার মনে।

'সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি জলদি বয়স বাড়ছে মিনতির,' বলল মোনা।

নীরব থাকল রানা।

'মিনতির বয়স মাত্র এগারো বছর,' বলল মোনা, 'আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট, কিন্তু বেড়ে গেছে অস্টিওপোরোসিস। ছানি পড়ছে চোখে। শক্ত করে কেউ ধরলে ছড়ে যায় ত্বক, রক্ত পড়ে। বেশি দিন নেই ডায়ালাইসিস করতে হবে। ফেইল করছে ওর কিডনি।'

ভাবল রানা, সত্যি, বড় অদ্ভুত মানুষের জীবন!

'জটিল জেনেটিক ডিযিয, বিজ্ঞানীরা নাম দেন প্রোজেরিয়া বা ওয়ার্নার সিনড্রোম। স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে না মিনতির ত্রুটিযুক্ত ডিএনএ।'

'প্রাকৃতিকভাবে এমন হচ্ছে ওর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে শ্বাস নিল রানা। এসব দুঃসংবাদের ভেতরেও ওর ভাল লাগল, এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে মেয়ের ক্ষতি করেননি ডক্টর মোবারক।

'যা করার করছেন স্রষ্টা,' বলল মোনা, 'যদি তাঁর অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস রাখো আর কী!'

'চিকিৎসা করে রুখে দেয়া যায় না ওই অসুখ?' জানতে চাইল রানা।

আবছা হাসি ফুটে উঠল মোনার ঠোঁটে, চোখে অশ্রু। যেন খুঁজছে এমন এক প্রশ্নের জবাব, যেটা কখনও পাবে না। করুণ শোনাল ওর কণ্ঠ: 'আমরা চেষ্টা করছি।' মুখ অন্য দিকে সরিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

'তুমি আর তোমার বাবা,' মন্তব্যের সুরে বলল রানা। 'তোমরা গবেষণা করে বের করতে চেয়েছ ওষুধ।'

মাথা দোলাল মোনা।

'আফ্রিকায় ওই কাজেই ব্যস্ত ছিলে? তাই বিপদের ঝুঁকি নিতেও তোয়াক্কা করোনি?'

মাথা দোলাল মোনা। 'আমার মা মারা যান মিনতিকে প্রসব করতে গিয়ে। এক বছর পর ধরা পড়ল ওর ওই রোগ। যে-কোম্পানির হয়ে কাজ করতেন বাবা, সেখানে বললেন এই রোগ নিয়ে গবেষণা করতে চান। তাঁর লাগবে তাদের দামি সব ইকুইপমেন্ট। দরকার ফাণ্ড। কিন্তু সাহায্য করতে চাইল না তারা।'

চুপ করে থাকল রানা।

'তাদেরকে গোপন করে এক্সপেরিমেন্ট করতে লাগলেন বাবা। হয়তো বোকার মতই। আর কী-ই বা করতেন? ওরা যখন জানল, খুব রেগে গেল। চাকরি হারালেন বাবা। ডেটা ও স্যাম্পল নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। হাতে যথেষ্ট টাকা নেই যে গবেষণা

করবেন। সতেরো বছর বয়সে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেলাম জেনেটিকস-এ। কিন্তু কিছু দিন পর লেখাপড়া ছেড়ে সাহায্য করতে চাইলাম বাবাকে। জোর করে গেলাম তাঁর সঙ্গে আফ্রিকায়।'

বোটের পাইলট হাউসের দিকে তাকাল মোনা। 'মিনা ফুফুর সঙ্গে রয়ে গেল মিনতি। প্রথমে গেলাম কোস্টা রিকা, তারপর কঙ্গো। আমাদের মনে হয়েছিল, ঠিক জায়গায় গেছি। গবেষণা করতে বাধা ছিল না। ভাবতাম, কয়েক বছরের ভেতর আবিষ্কার করব ওই রোগের ওষুধ।'

বিষণ্ন হাসল মোনা। 'কত ভুলই না ভেবেছি।'

অসহায় এক বাবা ও তার জেদি মেয়ের মন বুঝল রানা। দিনরাত কাজ করেছে ওরা। রানা আগে ভেবে পায়নি, কেন তরুণী মেয়েকে অত বিপদে রেখে পাগলের মত গবেষণার পেছনে সময় দিতেন ডক্টর মোবারক। আসলে মোনার চেয়েও অসহায় শিশু মেয়েকে বাঁচাতে জান দিতেও আপত্তি ছিল না তাঁর।

কেবিন ক্রুযারের সামনের কেবিনের দিকে তাকাল রানা। বাচ্চা মেয়েটা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। 'কী কারণে হয় এই রোগ?'

'কয়েক ধরনের টাইপ আছে,' বলল মোনা। 'মিনতির বেলায় ডিএনএর টেলোমারগুলোর আয়ু কমছে। সবারই তাই হয়। আমাদের সেল ভেঙে গেলে কমে টেলোমার। কিন্তু মিনতির ক্ষেত্রে তা অনেক জলদি হচ্ছে। প্রোজেরিয়ার কোনও কোনও রোগী অন্যভাবে আক্রান্ত হয়। তাদের চোখে ছানি পড়ে না। বোঝাও যায় না চট্ করে বাড়ছে বয়স। কিন্তু মিনতির বেলায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সব সেল। প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ওর টেলোমার।'

আবারও দূরের সাগরে তাকাল মোনা। 'নতুন কোনও ব্রেকথ্রু না হলে বারো বছর হওয়ার আগেই মারা যাবে মিনতি।'

রানার মনে হলো, ওর বুকে চেপে বসেছে কয়েক টন ওজনের পাথর। মনে পড়ল লুবনার কথা। ওকেও বাঁচতে দেয়নি একদল পশু। কিন্তু মিনতির ব্যাপারটা অন্যরকম, ওকে বাঁচতে দিতে চাইছে না প্রকৃতি।

'তার মানে, টাকা জোগাড় করা, রিসার্চ করা, বিপজ্জনক লোককে মিথ্যা বলা, সবই ডক্টর মোবারক করেছেন মিনতির জন্যে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল মোনা। 'তুমি কি এর চেয়ে কম কিছু করতে, রানা?'

কেন যেন বুকে অসহায় রাগ টের পেল রানা। আসলে কিছুই তো করার নেই ওর!

ডক্টর মোবারক প্যারিসে গোপনে গবেষণা করছিলেন। ওটার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই রোগের। ভুল পথে যাচ্ছিলেন তিনি।

মার্ভেল ড্রাগ্‌স্ কর্পোরেশন চকচকে সব বিজ্ঞাপন দিলেও তারা মোনার সাহায্য নিয়ে অনেক দূর এগোতে পেরেছে। তার মানে এটা নয় যে, আবিষ্কার হয়েছে তারুণ্যের চিরকালীন ফোয়ারা। আরেকটা কথা মনে পড়ল রানার। ডক্টর মোবারকের ট্রায়াল ৯৫২-র সঙ্গে মিল কেন মোনার গবেষণায়?

'মার্ভেল ড্রাগ্‌স্ কর্পোরেশনের প্রথম মালিকদের একজন তোমার বাবা, ওখানে থেকেই গবেষণা করতে পারতেন,' বলল রানা।

'ডিরেক্টররা রাজি হননি, আগেই দামি সব গবেষণা করতে গিয়ে নিজের মালিকানা বিক্রি করে দিয়েছিলেন বাবা,' বলল মোনা।

ওর ফুফু এসে বসলেন বেঞ্চে। শেষ কিছু কথা শুনেছেন। 'বড়দা একা গবেষণা করতে গিয়ে শেষ করে ফেলেছিল প্রায় সব টাকা। তার ওপর পেছনে লেগে গিয়েছিল একদল খারাপ লোক।'

সবাই চুপ হয়ে যাওয়ায় জানতে চাইল রানা, 'মোনা, মিনতির মত রোগীর জন্যে কোনও ওষুধ আবিষ্কার করেছে তোমার কর্পোরেশন?'

একটু দ্বিধা নিয়ে বলল মোনা, 'এখনও না। গবেষণা করছি আমরা।'

'তা হলে হোটেলে যে বিজ্ঞাপন...'

'ফাণ্ড পাওয়ার জন্যে,' বলল মোনা। 'প্রোজেরিয়া সারাতে পয়সা খরচ করবে না কেউ। ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক নয়। বিরল রোগ। রোগী না পেলে কার কাছে ওষুধ বিক্রি করে টাকা তুলবে? ওষুধ আবিষ্কার করলেও একেক ডোযের জন্যে পড়বে হয়তো দশ মিলিয়ন ডলার।'

'কোনও অনুদান পাওয়া যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'চেষ্টা করেছেন বাবা, সফল হননি।' দুবাই শহরের দিকে তাকাল মোনা। 'ওই শহরে এমন লোক আছে, যারা টাকা পুড়িয়েও শেষ করতে পারবে না। পড়ে আছে তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আমাদের তো নেই। বাবা সবই শিখিয়েছেন আমাকে। এটাও শিখিয়ে দিয়েছেন, বড়লোকের কাছে হাত পেতে নিজেকে ছোট কোরো না।'

চুপ হয়ে গেল মেয়েটা। একটু পর বলল, 'দয়া করবে এমন লোকের কাছে চাইনি। এমন লোক বেছে নিয়েছি, যারা অনুরোধ করবে তাদের টাকা নিয়ে জরুরি গবেষণা সফল করতে। এখন মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশনের কাছে যথেষ্ট ফাণ্ড আছে। মিথ্যা বলতে হবে না, লুকিয়ে কাজ করতে হবে না, বাবা যেমন চেয়েছেন, তেমন করেই গবেষণা করতে পারব।'

একটু গর্ব টের পেল রানা মেয়েটার কণ্ঠে। মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশনে আছে মোনার ক্ষমতা। এক ধাপ এগিয়ে গেছে ওর বাবার দেখিয়ে দেয়া পথে। লাখে লাখে কোটিপতি টাকা খরচ

করবে অমৃতের মত ওষুধ পেতে। আমেরিকার এফডিএ-এর মত সংগঠনের মতই পাশে পাবে মোনা একদল যোগ্য গবেষককে।

'আসলে দীর্ঘায়ু হতে হলে টাকা চাই,' একটু তিক্ত সুরে বলল মোনা। 'বড়লোকরা দীর্ঘায়ু হবে। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে, সুন্দর হয়ে উঠবে পৃথিবী। আসলে এসব নিয়ে ভাবি না। আমার চিন্তা মিনতিকে ঘিরে।' আবারও চুপ হয়ে গেল মোনা। বুঝতে পারছে, গবেষণা করার সুযোগও আসলে নেই। ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু চাই, তাই ওকে গবেষণায় বাধ্য করতে চাইছে একদল পশু।

'তোর বাবা চেয়েছিল গোপনে গবেষণা করতে,' বললেন মিনা মোবারক, 'নইলে এত বিপদে পড়ত না। কখনও চায়নি, চিরকালের জন্যে মানুষ বেঁচে থাকুক।'

'এক ডিভিডিতে ওঁর বক্তৃতা শুনেছি,' বলল রানা। 'জোর করে পৃথিবীর লোকের আয়ু কমাবার কথা বলেছেন। অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলেছেন ।...এসব কি বলেছেন হতাশা থেকে?'

বিব্রত চেহারা হলো মোনার। 'আসলে ওসব বিশ্বাস করতেন না। বোঝাতে চেয়েছেন, সামনে বড় বিপদে পড়বে মানবজাতি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের বিষয়ে দায়িত্বশীল বাবা-মাদেরকে বোঝাতে জোর দিতেন। এখন তো ওষুধের গুণে আগের অবস্থা নেই যে, দশটা ছেলে-মেয়ে হলে বাঁচবে দু'জন।'

'আমি বিচারক নই, ডক্টর মোবারককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বুঝতে চাইব না, তিনি ঠিক বলেছেন না ভুল,' বলল রানা। 'বড়জোর বলব, বাধ্য হয়ে একদল খারাপ লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তোমাদের তিনজনকে ফেলে দিয়েছিলেন মস্ত ঝুঁকির ভেতর।' মোনার দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত, সঠিক সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারিনি। কিন্তু চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দারুণ

কিছু আবিষ্কারের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওই পর্যায়েই খুন হন। মোনা, তুমি কি বলতে পারবে কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর?'

নিষ্পাপ চোখে রানাকে দেখল মোনা। দৃষ্টিতে একই সঙ্গে গর্ব ও জ্ঞানের ছটা। 'কয়েক বছর গবেষণা করার পর অন্য পথে হাঁটেন বাবা। দীর্ঘায়ু প্রাণীদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেন।' একবার দেখল সামনের কেবিন। 'বাবার গবেষণা থেকে যা বেরিয়ে এসেছিল, সে অনুযায়ী মিনতির দেহে কিছু সেল যুক্ত করেছি। ওগুলো এখন ওর দেহের অংশ। মনে হচ্ছে, কাজও করছে। বাড়ছে ওর আয়ু।'

'এটাই কি ব্রেকথ্রু?' জানতে চাইল রানা।

'বাবা ভাবতেন, প্রকৃতি যেহেতু কমিয়ে দিচ্ছে টেলোমার, তা হলে প্রকৃতির বুকেই আছে তার উল্টো কিছু। অর্থাৎ, অমৃত ধরনের জিনিস। অনেক কাহিনিতে আমরা পড়েছি, হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতেন কেউ কেউ। বাস্তবেও হয়তো তা সম্ভব। বাবার এক ইরানিয়ান আর্কিওলজিস্ট বন্ধু ছিল। নাম আবু রশিদ। বলতে পারো, দু'জনই পাগলাটে মানুষ। তাঁরা দু'জন মিলে খুঁজতে শুরু করেছিলেন অমৃত। রশিদের ধারণা ছিল, তিনি মরুভূমির বালিতে হারিয়ে ফেলেছেন অমৃত তৈরির ফরমুলা।'

আবু রশিদের কথা শুনে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা।

'আবু রশিদ আর বাবার স্বপ্ন ছিল, পাবেন অমৃত,' বলল মোনা। 'মরুভূমিতে রশিদ নাকি পেয়েছিলেন তামার এক লিপি। ওটার লেখা অনুযায়ীঃ পৃথিবীতে আছে প্রায় স্বর্গের উদ্যানের মত এক বাগান।'

'যেখানে আছে অমৃত,' রানার মনে হলো গভীর সাগরে সাঁতরে চলেছে, কিন্তু কোথাও নেই ঠাঁই, 'কোথায় ছিল ওই বাগান?'

'জানি পাগল ভাবছ তাঁদের দু'জনকে,' বলল মোনা। 'কিন্তু রশিদ ভাবতেন ঠিকই খুঁজে পাবেন ওই উদ্যান। আর তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলেন বাবা। ভাবতেন, বাগানের ওই অমৃত পেলে বাঁচাতে পারবেন মিনতিকে।'

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা, 'ওঁরা জানতেন কোথায় আছে ওই বাগান?'

'রশিদ ভাবতেন, ওই উদ্যান স্রষ্টার অদ্ভুত এক অলৌকিক কিছু। বাবা ভাবতেন, অমৃতের মত কিছু পাওয়া গেলে তা হবে বিজ্ঞানের অলৌকিক ঘটনা। সত্যিই হয়তো কখনও আর মরতে হবে না মানুষকে।'

'চিরকালীন জীবন?' মোনার চোখে তাকাল অবাক রানা।

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'পবিত্র প্রায় সব মহাগ্রন্থে আছে জীবন ফিরিয়ে দেয়া গাছ বা জীবন-বৃক্ষের কথা।'

আটাশ

যে লোহার আঁধার ঘরে পাল্টে দেয়া হয়েছে জুবায়ের পাশার নাম, সেখানেই কাল্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা মার্ডকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মামবা। জরুরি কাজের জন্যে ডাকা হয়েছে ওকে।

ওদের সামনে উপস্থিত লোকটি বয়স্ক। মাথার চুল সব ধূসর। গায়ের ত্বক বাদামি।

তাকে আবু রশিদ বলে ডাকছে কাল্টের দ্বিতীয় নেতা। 'তোমার জন্যে একটা জিনিস আছে,' বলল মার্ডক।

'আপনার কিছুই আমার চাই না,' বললেন রশিদ।

অসুস্থকর খলখল হাসি হাসল নেতা। 'আমি যা দেব, ওটা আগে তোমারই ছিল। অন্তত তা-ই বলতে।'

আবু রশিদের কথার সুরে মামবা বুঝেছে, সে মিডল ইস্টের লোক। তবে আরব নয়, ইরানিয়ান। কেন ধরে আনা হয়েছে, জানে না ও। প্রচণ্ড পেটানো হয়েছে বয়স্ক লোকটাকে। ফেটে গেছে গাল-চিবুক। দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে টলছে। এক চোখ নেই, কিন্তু ওটা অনেক পুরনো ক্ষত।

'আহসান মোবারকের বন্ধু ছিলে,' বন্দিকে বলল মার্ডক, 'সে বলে গেছে কী বিশ্বাস করো তুমি।'

'নির্যাতন করে তাঁর মুখ থেকে এসব বের করেছেন।'

'মোবারক গাদ্দারি করার অনেক আগেই এসব বলেছে।'

'আপনাদেরকে ত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁকে খুন করেছেন,' বললেন রশিদ।

'না, তা করেছি গাদ্দারি করেছে বলে।'

'কোন্ অধিকারে মানুষকে শাস্তি দিচ্ছেন?' রাগী সুরে বললেন প্রাক্তন আর্কিওলজিস্ট।

'স্রষ্টা যেমন প্রথম থেকেই যা খুশি করছে, আমরাও তার মতই একই কাজ করছি,' বলল মার্ডক, 'মোবারক এটা ভাল করেই বুঝত। জানত, দলের বিরুদ্ধে গেলে শাস্তি পেতে হবে। দলের সবাই এটা জানে।'

দীর্ঘ এক কার্ডবোর্ডের টিউব তার হাতে। ওটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। টিউবের ভেতরে কী, জানে না মামবা।

'আমি কোনও কাজে আসব না,' বললেন রশিদ। 'আগেও সহ্য করেছি অনেক নির্যাতন। যা খুশি করুন, আমি তৈরি।'

খপ করে রশিদের কান খামচে ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে আনল মার্ডক। মনোযোগ দিয়ে দেখছে পুরনো ক্ষত। কয়েক

সেকেণ্ড পর বলল, 'আমরা অনেক বেশি কিছু করতে পারি।'

কান ছেড়ে ধাক্কা দিয়ে রশিদকে একটা চেয়ারে ফেলে দিল সে। তুলে নিল লম্বাটে কার্ডবোর্ডের টিউব। খুলল।

কোনও অস্ত্র দেখবে ভেবেছিল মামবা। বর্শা, তলোয়ার বা ধারালো ফলার কোনও অস্ত্র। না, জিনিসটা ধাতু দিয়ে তৈরি হালকা পাত। খোদাই করা।

মুড়িয়ে রাখা জিনিসটা টেবিলে রেখে খুলছে কাল্টের নেতা।

উত্তেজনার বশে উঠে দাঁড়ালেন আবু রশিদ। একটু ঝুঁকে গেলেন টেবিলের দিকে।

চুপচাপ দেখছে মামবা। খুব সাবধানে পাতলা ধাতুর পাত খুলল মার্ডক। তার নির্দেশে দলের একজন আঙুল দিয়ে টিপে ধরল ধাতুর পাতের দু'দিক, যাতে আবারও মুড়িয়ে না যায়।

পাতের ওপর চোখ রেখে অবাক হলো মামবা। তামার লিপি। তার ভেতর কয়েক রকমের সিম্বল।

'জীবনের অর্ধেক সময় পার করেছ এটা আবারও দেখবে সে আশায়,' বলল মার্ডক। 'এবার সুযোগ পাচ্ছ পড়ে দেখার।'

মুখ তুলে তাকালেন আবু রশিদ।

'ভুলেও মিথ্যা বলবে না। অন্যদের কাছ থেকেও পরীক্ষা করিয়ে নেব, তুমি ঠিক বলেছ কি না।'

'এসব জেনে কী লাভ আপনার?' জানতে চাইলেন রশিদ। 'এটা অনেক প্রাচীন জিনিস।'

'এটা প্রমাণ করবে ভয়ঙ্কর এক মিথ্যা ছড়ানো হয়েছিল,' বলল মার্ডক।

'কীসের মিথ্যা?'

'যে আসলে স্রষ্টা আছে,' বলল মার্ডক।

দ্বিধান্বিত হয়ে গেছেন রশিদ।

'ছোট্ট একটা ভুল করেছিল বলে স্বর্গ থেকে বের করে দিল

স্রষ্টা, মানুষ এসে পড়ল কঠিন এই জীবনে,' বলল মার্ডক। 'ওই ভুলের জন্যে মরতে হবে তাকে পৃথিবীতে। কেউ যাবে স্বর্গে, আবার কেউ নরকে। এসবই বলা হয়েছে। কিন্তু সত্যি যদি চিরকাল বেঁচে থাকে মানুষ, তো কীসের দরকার তার স্বর্গ বা নরকের? কেন মানুষ বিশ্বাস করবে একদল মানুষের তৈরি ভ্রান্ত স্রষ্টাকে!'

এর জবাব দিতে চাইলেন রশিদ, কিন্তু বুঝে গেলেন কিছু বলে লাভ হবে না। ওই লোক নিজেকে মনে করছে স্রষ্টার সমকক্ষ।

'ওটাই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় মিথ্যা,' ধমকের সুরে বলল মার্ডক, 'আর ওটা থেকেই এসেছে আরও একগাদা মিথ্যা। দুনিয়ার চার কোনায় যেখানে যাও, অনেক মানুষকে পাবে যে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছে ক্ষমা চেয়ে। কিন্তু কোথাও নেই মুক্তি। স্রষ্টাই তো নেই! আর তাই কখনও ক্ষমা চাই না আমরা। যা করি, বুঝে শুনে করি। কারও ক্ষমার তোয়াক্কাও করি না।'

এক পা পিছিয়ে গেলেন রশিদ। কিন্তু তাঁর কাঁধ খামচে ধরল মার্ডক। কর্কশ সুরে বলল, 'ভাল করে দেখো তামার লিপি!'

'আপনি বদ্ধ-উন্মাদ!' আতঙ্ক ভরা কণ্ঠে বললেন রশিদ, 'আপনারা সবাই তা-ই! যারা আল্লার নাম ভাঙিয়ে অন্য মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, বা যারা সম্পদের লোভে যা খুশি তাই করে, আপনারা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট!'

'ওই তামার লিপিতে লেখা আছে সত্য,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মার্ডক। 'তুমি নিজে তা আগেই জেনেছ।'

'না, প্রাণ থাকতে এই লিপি অনুবাদ করব না,' কাঁপা গলায় বললেন রশিদ। 'মারবেন? মেরে ফেলেন!'

ঘাড় ধরে তাঁকে তাম্রলিপির দিকে ঝুঁকিয়ে দিল মার্ডক, পরক্ষণে ওটার ওপর আছড়ে ফেলল তাঁর মুখ। 'পথ দেখাবে তুমি!'

'নরকে যান!' ফুঁপিয়ে উঠলেন রশিদ।

হ্যাঁচকা টানে তাঁর মাথা ওপরে তুলল মার্ডক। প্রচণ্ড দুটো চড় খেয়ে পাশের দেয়ালে গিয়ে পড়লেন রশিদ। ওখান থেকে পিছলে মেঝেতে। রক্তপিশাচের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইলেন রশিদ।

কাল্টের এক লোককে ইশারা করল মার্ডক। ওই লোক রশিদকে তুলে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল নেতার দিকে। কয়েক পা সামনে বেড়ে নাগালের ভেতর অসহায় আর্কিওলজিস্টকে পেয়ে গেল মার্ডক। কোমর থেকে ছোরা বের করে ওটার কোপে কেটে দিল বন্দির হাতের দড়ি। এক এক করে দু'হাতের কবজিতে আটকে দিল দেয়ালের আঙটার হ্যাণ্ডকাফ। কয়েক দিন আগে ওখানেই বন্দি ছিল মামবা।

'মামবা!' রশিদের পা দেখাল মার্ডক।

বসে পড়ে আর্কিওলজিস্টের দু'পায়ে শেকল জড়াল মামবা। এমনভাবে টেনে দিল স্ট্র্যাপ, চাইলেও হাত-পা নাড়তে পারবেন না রশিদ।

'আপনারা এসব কী করছেন?' ভীত কণ্ঠে জানতে চাইলেন রশিদ।

জবাব দিল না কেউ।

দরজার দিকে চলল মার্ডক।

পাশের দেয়াল থেকে অ্যাসেটিলিন টর্চ নিয়ে জ্বেলে নিল কাল্টের এক সদস্য। নীল-সাদা আগুনের শিখা ছিটকে বেরোচ্ছে লকলক করে।

'আমি পড়ব,' বললেন রশিদ। 'সবই খুলে বলব।'

মামবা বুঝে গেছে, যা করা হবে, তা ঠেকাতে পারবে না কেউ। অসুস্থ বোধ করল। মার্ডকের দিকে তাকাল। নেতা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

ব্লো টর্চ হাতে রশিদের পাশে পৌঁছে গেল কাল্ট সদস্য।

'এক মিনিট,' বলল মার্ডক।

বুকের ভেতর ধকধক করছে মামবার হৃৎপিণ্ড। মনের ভেতর দুলে উঠল স্বস্তির মস্ত এক ঢেউ। যাক, মাথা কাজ করছে ইরানিয়ানের। হয়তো তাকে বাঁচতে দেবেন দ্বিতীয় প্রভু।

ব্লো টর্চওয়ালা সদস্যের দিকে চেয়ে হাসল মার্ডক। 'কাজটা মামবাকে করতে দাও। অনেক কিছু শেখার আছে ওর। নইলে কী করে উন্নতি হবে?' দরজা পেরিয়ে গেল সে, পেছনে ভিড়িয়ে দিল ধাতব দরজা।

ঊনত্রিশ

মোনার কথা শুনে চমকে গেছে রানা। মনে পড়ল, ডক্টর মোবারকের বুকে পুড়িয়ে লেখা হয়েছিল জেনেসিসের স্তবক। প্রাচীন সব আর্টিফ্যাক্টের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন বিজ্ঞানী। সুযোগ পেলে চোরাই আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করতেন আবু রশিদ। শোনা যায় নিজের জন্যে খরচ না করে ওই টাকায় বিপ্লবীদের জন্যে অস্ত্র কিনে দেশে পাঠাতেন। বৈরুতের এক নিলামে যেতে চেয়েছিলেন। সেটা জেনেই ওই শহরে গেছে এলেনা। কিন্তু এসবের সঙ্গে অমৃতের কী সম্পর্ক?

একটু বেসুরো হয়ে গেল ওর কণ্ঠ, 'জীবন-বৃক্ষ?'

'হ্যাঁ, স্বর্গের জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে পতন হয়েছিল অ্যাডাম ও ইভের, আর সব ছিল জীবন-বৃক্ষ। অনেকটা তেমনই ছিল

পৃথিবীর বুকেও বিভিন্ন জায়গায় বেশকিছু বাগানে জীবন-বৃক্ষ। যারা খেত ওটার ফল, হতো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কখনও মরত না তারা।'

'তোমার বাবা বিশ্বাস করতেন সত্যিই পৃথিবীর বুকে তেমন গাছ ছিল বা আছে?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করতেন।'

'ডক্টর মোবারক আর আবু রশিদ ভেবেছিলেন খুঁজে পাবেন সেই বাগান, যেখানে আছে অমৃতের গাছ?'

'হ্যাঁ, পাগল ভেবে বোসো না।' একটু থেমে তারপর জানতে চাইল মোনা, 'বলো তো কতটুকু জানো জেনেটিকস সম্পর্কে?'

বহু কিছুই জানে রানা। কয়েক দিন আগেও কিছুই জানত না। তারপর এলেনার অনুরোধে এনআরআই-এর এক গবেষকের হাতে তুলে দিয়েছিল নিজেকে। নাম তার লাউ আন। লাউ না এনে পুরো দুইঘণ্টা ওর ওপর বক্তৃতা দিল চিনে ব্যাটা। শেষ দিকে কেমন ধরে গেল ওর মাথাটা, মনে হচ্ছিল লাউটাউ দিয়ে হবে না, এর মাথায় ভাঙা দরকার কাঁচা কাঁঠাল।

'যতটুকু জানি, সেসব ভাইরাসের সঙ্গে জড়িত।'

'ঠিক আছে। শুধু এটুকু জানলেই হবে, বহু দিন বেশি বাঁচে অনেক প্রাণী, নানান কায়দায়। আসল কথা বেশি দিন বাঁচা। যেসব প্রাণীর আয়ু কম, তারা বংশ রক্ষা করতে গিয়ে চট্ করে বাচ্চা নেয়। এই সুবিধা করে দিয়েছে প্রকৃতি। আবার এমন সব গাছ আছে, যেগুলো বেঁচে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। এসব গাছ অমৃত তৈরি করে না। ওরা কীভাবে যেন জেনে গেছে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার কৌশল। যেমন আছে এক ধরনের জেলি ফিশ। ওটার নাম টারিটোপ নিউট্রিকিউলা— প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মরে যাওয়ার বদলে নিজেকে আবারও তরুণ করে তোলে। একবার বুড়ো হয়, আবার হয়ে ওঠে তরুণ। এভাবে মৃত্যুকে কাঁচকলা

দেখিয়ে পার করে দেয় বহু বছর। কেউ ওদেরকে খেয়ে না ফেললে মরে না এরা।'

'এসব জেলি ফিশ নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর মোবারক?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মোনা, 'কিন্তু ওরা অন্য নিয়ম মেনে চলে। ওদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার নেই মিনতির। জেলি ফিশের চেয়ে অনেক জটিল মানবদেহের যন্ত্রপাতি। মিনতির যেসব সেল মরে যাচ্ছে, তার বদলে যেসব জন্ম নিচ্ছে, সেগুলোর ভেতর থাকছে একই জেনেটিক কোড। রয়েই যাচ্ছে ক্রটি। কোনওভাবেই ওর দ্রুত বয়স বেড়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারছি না আমরা। জন্ম নিচ্ছে না ভাল সেল। ওকে বাঁচাতে হলে নতুন করে লিখতে হবে জেনেটিক কোড। সেক্ষেত্রে হয়তো নতুন সেল হারিয়ে দেবে ক্রটিযুক্ত প্রোজেরিয়ার সেলকে। বয়স কমে আবারও কিশোরী হবে ও, স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠবে।'

'সেটা কী করে সম্ভব?'

'মিনতির টেলোমার চেনের সেল থেকে জিন নিয়ে সুস্থ করে দিতে হবে ওটাকে, তারপর চাই ইমপ্লান্ট। এভাবে সারাতে হবে সারাশরীরের সেল।'

বিজ্ঞানীর বাড়ি থেকে এলেনার আনা তথ্য মনে পড়ল রানার। পরক্ষণে ভাবল ইউএন ভাইরাসের কথা। ওই ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে মানবদেহে সংক্রমিত হতে। ওটার সেলিউলার ইনফেকশন রেট নব্বুই পার্সেন্ট। ডক্টর তৈরি করেছিলেন মেয়ের অসুখ দূর করতে।

'জিন ইমপ্লান্ট করতে একটা ভাইরাসকে ব্যবহার করবে তুমি?'

মাথা দোলাল মোনা। 'এমন ভাইরাস, যেটা মানুষের সেল নষ্ট করবে না। তা হলেই মানুষের ডিএনএ-তে যোগ করে দেয়া

যাবে যে-কোনও নতুন গুণ।'

এলেনার আনা ডেটার একটা ট্রায়ালে দেখা গেছে, নব্বুই ভাগ সফলভাবে ইনফেক্ট করা সম্ভব। কিন্তু তা করতে গেলে মৃত্যুর ঝুঁকি খুব বেশি। কাজেই ডক্টর মোবারক ওই ট্রায়াল বাতিল করেন। ভাইরাস দিয়ে ভয়ঙ্কর বায়োলজিকাল অস্ত্র তৈরির ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

'প্রথম কাজ শেষ করেছেন ডক্টর,' বলল রানা।

মাথা দোলাল মোনা। 'হ্যাঁ, এক মাস আগে পাঠিয়ে দেন সব ডেটা। অনেক দিন কথা নেই, তারপর হঠাৎ করেই যোগাযোগ করলেন।'

সাহায্য চেয়েছিলেন ওর কাছে, বাধ্য হয়ে যোগাযোগের ঝুঁকি নেন, ভাবল রানা। বুঝে গিয়েছিলেন কী আসছে।

'ট্রায়াল ৯৫২।'

অবাক চোখে রানাকে দেখল মোনা। 'হ্যাঁ, ঠিক! জানলে কী করে?'

'হোটেলে তোমার প্রেযেণ্টেশনে দেখেছি।'

'হ্যাঁ, ডেলিভারি ভেহিকেল আমাদের কাছে আছে, এবার চাই মেরামত করা ডিএনএ। ভরে দিতে হবে ভাইরাসের ভেতর।'

'তোমার বাবার ট্রায়াল ৯৫২ অনুযায়ী কমে যায় আয়ু,' বলল রানা।

'কমতে হবে না,' বলল মোনা। 'আমরা ইঞ্জিনিয়ার করে তার ঠিক উল্টো কাজ করব। এখন দরকার শুধু সঠিক সুস্থ ডিএনএ।'

'পাওয়া যাবে ওই বাগানে?' জানতে চাইল রানা।

'সব ভাইরাসের হোস্ট লাগে,' বলল মোনা, 'এমন এক আস্তানা, যেখানে ক্ষতি হবে না তার, বিশ্রাম নিতে পারবে ওটা। ইবোলা, মারবার্গ... সবাই টিকে থাকে কোথাও না কোথাও। সুপ্ত বা আধাসুপ্ত হয়ে। তারপর সুযোগ পেলে মানুষের দেহে ঢুকে হয়ে

ওঠে পুরো সজাগ। বুঝতেই পারছ, কেন নাম দেয়া হয়েছে এসব ভাইরাসের? সোয়াইন ফ্লু বা বার্ড ফ্লু? ওসব প্রাণীর শরীরে আরামে বাস করে ওরা।'

'এ ক্ষেত্রে আধার হবে কোন্ জিনিস?'

'প্রাচীন আমলে ছিল এক ধরনের গাছ,' বলল মোনা। 'ওটার ফলের ভেতর থাকত এক ধরনের ভাইরাস। ওটার কারণে বদলে যেত মানুষের ডিএনএ। ওই ফল যে খেত, হয়ে উঠত দীর্ঘায়ু। আসলে টেলোমারগুলো দীর্ঘ হতো বলেই সহজে আসত না মৃত্যু। প্রাচীন মানুষ বুঝত না কেন এমন হচ্ছে। কিন্তু এটা বুঝত, ওই গাছের ফল খেলে চিরকালের জন্যে বেঁচে থাকে মানুষ। তারা বলত, ওই ফল পাঠানো হয়েছে স্রষ্টার তরফ থেকে। স্বর্গের উদ্যান নাম দিত তারা ওই গাছের বাগানের। ওই গাছই আসলে জীবন-বৃক্ষ।'

মোনা থেমে যাওয়ায় রানা ভাবল, তা হলে আমাদের পরের কাজ হবে ওই উদ্যান খুঁজে বের করা।

'মিথ্যা নয়, কিংবদন্তী,' বলল মোনা। 'অদ্ভুত কিছুও নয়। বলতে পারো সায়েন্স। আমরা হয়তো খুঁজে পাব ওই জীবন-বৃক্ষ। তা যদি পারি, বাঁচবে মিনতি।'

ত্রিশ

এলিভেটরে করে মুর ফার্মাসিউটিকাল কর্পোরেশনের বেসমেন্ট গ্যারাজে নেমে এল আর্নল্ড মুর ফিফ্থ্, বরাবরের মতই সারাটা

দিন হাজার দুশ্চিন্তা করে ক্লান্ত। গত ক'দিন ঘুমাতে পারেনি। মাথায় উঠেছে নাওয়া-খাওয়া। কড়া উইস্কির গ্লাসে কয়েকবার দীর্ঘ চুমুক দিয়েও শান্ত হয়নি মন।

ভীষণ অস্বস্তি লাগছে তার, এই বুঝি কেউ জেনে ফেলল! আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে তার। প্রিয় বুলেটপ্রুফ লিংকন টাউন কার পাশে থামতেই গাড়ির পেছনের সিটে উঠল বিলিয়নেয়ার। কয়েক সেকেণ্ড পর মুরের বডিগার্ড।

পার্কিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে চওড়া রাস্তায় পড়ল গাড়ি। সেন্টার কন্সোল নুক থেকে বোতল নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মুর। মনে আশা, গ্লেনফিডিক ৪০-এর পঞ্চম পেগ ঠাণ্ডা করবে মাথা।

কাউন্ট নামের ওই ভয়ঙ্কর পশুর ইচ্ছেকে পাত্তা না দিয়ে বিপজ্জনক এক কাজ করে বসেছে সে। প্রথম সুযোগে মোনা মোবারককে চেয়েছে নিজের মুঠোর ভেতর। মেয়েটা দুবাইয়ে ফাণ্ড জোগাড় করছিল। গোলাগুলি হলেও হাতের নাগালে পাওয়া যায়নি তাকে। এই চরম ব্যর্থতা ডেকে আনতে পারে চরম সর্বনাশ!

বুর্জ আল আরব হোটেলে কী হয়েছে ব্রডকাস্ট করেছে সিএনএন। নিচের রাস্তায় ছিল হেলিকপ্টার, বিধ্বস্ত। চারপাশে সিকিউরিটির লোক। খুন হয়ে গেছে মুরের পাঠানো একদল লোক। তাদের হাতে খুন হয়েছে নিরীহ একদল মানুষ।

সরাসরি গলায় নির্জলা উইস্কি ঢালল আর্নল্ড মুর ফিফ্থ্। দু' হাজার ছয় শ' ডলার দাম ওই বোতলের, ভেতরের জিনিস ফোঁটা ফোঁটা করে জিভে দিয়ে আয়েস করার জন্যে তৈরি। যেন গলে যাবে জিভে। নাকে আসবে দামি ওয়াইনের সুবাস। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বস্তি দিচ্ছে না গ্লেনফিডিক ৪০। বারবার ভাবছে সে, কী করে ওই হামলাকারী দল আর নিজের মাঝের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবে। যে মধ্যস্থ করেছে, সে হামলার জন্যে জোগাড়

করেছে এক লোককে। সেই লোক আবার জুটিয়েছে অন্যদেরকে।

কিন্তু অন্য কারণে ভয় লাগছে মুরের। মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে কোনও মতেই যোগাযোগ করতে পারছে না সে। ফোন ধরছে না কেন লোকটা?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুর। মনে প্রাণে চাইছে, খুন হয়ে যাক কমাণ্ডোদের ওই নেতা। সেক্ষেত্রে কোনও চিন্তা নেই। কেউ অভিযোগের আঙুল তুলতে পারবে না তার দিকে।

আরেক চুমুক গ্লেনফিডিক নিল মুর। বার কয়েক বড় করে দম নিয়ে শান্ত করতে চাইল নিজেকে। আসলে নিচের লোকগুলো দায় নিলে ওপরের লোকদেরকে আর বিপদ ছুঁতে পারে না।

বিপদের জোয়ার স্পর্শ না করলেই হলো।

জানালা দিয়ে সাগর দেখল মুর।

আরে, এ পথে তো বাড়ি ফেরে না সে!

উপকূলীয় এই রাস্তা গেছে পুবের ক্লিফগুলোর মাঝ দিয়ে।

'ড্রাইভার!' ধমকে উঠল মুর। 'বোকার মত কোথায় চলেছ?'

জবাব দিল না ড্রাইভার।

মুর শুনল দুটো খুক-খুক আওয়াজ। তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বডিগার্ড। রক্ত ছিটকে লাগল মুরের গালে। এত ভয় পেয়েছে যে হাত থেকে ফেলে দিল দামি বোতল।

'ক্ব-ক্বী হচ্ছে?'

লাফিয়ে গতি বাড়াল দ্রুতগামী গাড়ি। যেন পেছন থেকে টেনে নেয়া হলো মুরের ঘাড়। বেকায়দা হয়ে গেল সে। ভয়ে থরথর করে কাঁপল শরীর। খপ করে ধরল দরজার হ্যাণ্ডেল, লাফিয়ে নেমে পড়বে গাড়ি থেকে। কিন্তু গাড়ি তো চলছে ষাট মাইল বেগে! পাশেই গার্ডরেল, ওই বেড়া ভেঙে গেলে আশি ফুট নিচের পাথুরে সৈকতে পড়বে গাড়ি।

'যাও, লাফ দাও!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল ড্রাইভার।

সাঁই করে বাঁক নিল লিংকন, ফলে উল্টো দিকের দরজার ওপর আছড়ে পড়ল মুর। শরীরটা স্থির হলো বডিগার্ডের পিঠে। রক্তাক্ত লোকটা মরেনি, মুখ থেকে বেরোচ্ছে ঘড়ঘড় শব্দ।

তাকে ঠেলা দিয়ে নিজে সরে এল মুর।

রাস্তা সোজা হওয়ায় ফিরে পেল ভারসাম্য।

'লাফ দে, হারামজাদা!' ধমক দিল ড্রাইভার। 'লাফ দে!'

ভয়ঙ্কর ওই কণ্ঠ এবার চিনল মুর। লোকটার ঘাড়ে উলকি। 'কাউন্ট!! পাগল হয়ে গেলে?'

'কী বলেছিস মনে আছে তোর?' সুইচ টিপে সাউণ্ড সিস্টেম চালু করল লোকটা। নিজের কণ্ঠ শুনল মুর।

'...না, ওই সাইকোপ্যাথের কথা মত চললে হবে না। জোগাড় করো যোগ্য লোক, তারপর তুলে আনো মোবারকের মেয়েকে। ওকে হাতের মুঠোয় চাই!'

ভয়েস চেঞ্জিং টেকনোলজির কারণে অন্য লোকটার কণ্ঠ বিকৃত শোনাল: 'কাজটা সহজ হবে না। ওর বাবার মতই লুকিয়ে বেড়ায়।'

'ওকে যেতেই হবে দুবাই শহরে,' নিজের কণ্ঠ চিনল মুর।

'অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হবে।'

'যা করার করো! যত খুশি টাকা লাগুক! ওকে চাই!'

জানতে চাইল বিকৃত কণ্ঠ: 'কাউন্ট? তার কী হবে?'

'সরিয়ে দিতে হবে। মেয়েটাকে এনেই আর দেরি করবে না তাকে শেষ করে দিতে।'

গাড়ি সামনে বাঁক নিতেই ফিরে তাকাল কাউন্ট। মুরের পাশে সিটে কী যেন ফেলল। ভয় পেয়ে ওটার দিকে ঘুরল মুর। জিনিসটা ভেজা, লাল রঙের কাপড়। সামান্য সরে গেছে বলে মুর দেখল রক্তাক্ত একটা আঙুল।

'বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছে,' বলল কাউন্ট, 'এত বড় ভুল

করা উচিত হয়নি ওর।'

বুক ঠেলে ভীষণ বমি পেল মুরের। ধাক্কা দিয়ে কাটা আঙুল ফেলে দিল সিট থেকে মেঝেতে। গতি আরও বাড়ছে গাড়ির।

'কী চাও?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল মুর।

'আমি চাই লাফ দিবি,' বলল কাউন্ট।

'এসব কী বলছ!'

কষে ব্রেক করল কাউন্ট। তৈরি ছিল না মুর, ধুপ করে বাড়ি খেল সামনের সিটের পেছনে। দু'ঠোঁট ফেটে যেতেই ঝরঝর করে ঝরল রক্ত। খসে পড়েছে সামনের একটা দাঁত। আবারও গতি তুলল গাড়ি। গতির কারণে হ্যাঁচকা টান খেয়ে সিটে পড়ল মুর।

'পরেরবার সিট বেল্ট বেঁধে নিস,' অশুভ হাসল কাউন্ট। মেঝের সঙ্গে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর।

কঠিন মৃত্যুর চিন্তা মনে আসতেই একমাত্র উপায়ে বাঁচতে চাইল মুর। 'আমি টাকা দেব! পুরো দুই মিলিয়ন! ঠিক তোমার কথা মত!'

'অনেক দেরি করে ফেলেছিস।'

'পাঁচ মিলিয়ন... দশ মিলিয়ন!' প্রায় কেঁদে ফেলল মুর। 'যা চাও!'

আবারও ব্রেক চাপল কাউন্ট। আটকে গেল চার চাকা। পুরো এক শ' ফুট পিছলে গাড়ি থামল উঁচু এক ক্লিফের পাশে।

এই সুযোগ! দরজার হ্যাণ্ডেল মুচড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল মুর। তখনই গুলি করা হলো তাকে।

ভীষণ ব্যথায় কাতরে উঠল মুর। ফুটো হয়ে গেছে ভুঁড়ি, ছোট্ট গর্ত থেকে তিরতির করে বেরোচ্ছে রক্ত। দু'হাতে ক্ষত চেপে ধরল সে।

পিস্তলের নলের ওপর দিয়ে তাকে দেখল কাউন্ট। নিষ্কম্প হাতে পিস্তলের নলে আটকে নিল সাইলেন্সার। 'ঠিক আছে, কল

কর্। ট্রান্সফার কর্ টাকা।'

কোটের পকেট থেকে ফোন বের করল মুর। ডায়াল করল কাঁপা হাতে। কানে ঠেকিয়ে জানাল কোড।

'কত?'

'বিশ মিলিয়ন ডলারই যথেষ্ট।'

আরেকটা কোড উচ্চারণ করল মুর। 'ট্রান্সফার করুন বিশ মিলিয়ন ডলার। ...হ্যাঁ। বিশ মিলিয়ন ডলার। দেরি করবেন না।' তৃতীয় কোড দেয়ায় মেনে নেয়া হলো অথেনটিসিটি।

নিজের ফোন দেখল কাউন্ট। অ্যাকাউন্টে এইমাত্র জমা পড়েছে বিশ মিলিয়ন। পাশের দরজা খুলে ফেলল, চোখ রেখেছে মুরের ওপর।

'সব নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে কখনও কারও সঙ্গে চুক্তি করতে যাসনে,' বলল সে। 'কঠিন পথে এটা শিখেছি, ওই জ্ঞান তোকে দিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কাউন্ট।

সে এক পা যেতে না যেতেই ফোনে ৯১১ ডায়াল করল মুর। কিন্তু তখনই পেছনের সিটে কী যেন ফেলল কাউন্ট। হন-হন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আবারও কারও বিচ্ছিন্ন অঙ্গ দিল কি না দেখতে ঘুরে তাকাল মুর। জিনিসটা ধূসর ক্যানের মত। ওপরে কী যেন।

ইনসেনজেরি গ্রেনেড!

দু'হাতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরল মুর, দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আর তখনই বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। গাড়ির ভেতর থেকে ছিটকে বেরোল লেলিহান আগুন।

বিস্ফোরণের ধাক্কা সামনে ঠেলল মুরকে, পার করিয়ে দিল ক্লিফের কিনারা। আগুন ও ধোঁয়ার ভেতর সাঁই-সাঁই করে নেমে চলেছে সে। অবাক হয়ে দেখল, উঠে আসছে পাথুরে সৈকত!

বিশ্রী কুড়মুড় শব্দে এবড়োখেবড়ো পাথরে আছড়ে পড়ল সে। একবার গড়িয়ে থেমে গেল।

লকলকে আগুন চাটছে তার নিথর দেহ।

একত্রিশ

কার্লসপিট-এ ছেলের বাড়িতে এলেনার পাঠানো ফোটোগ্রাফগুলো পুরো আঠারো ঘণ্টা ধরে দেখেছেন প্রফেসর বার্ডম্যান। নানান রেফারেন্স ঘেঁটেছেন। ক্রস-রেফারেন্স শেষ করে দ্বিতীয়বারের মত পরখ করলেন সব। নার্ভাস লাগল তাঁর। অস্থির মনে ভাবলেন, যোগাযোগ করবেন এলেনার সঙ্গে। ওই আলাপ হতে হবে অতি গোপনে।

রাতের আঁধারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন তিনি। ১-৫ ফ্রিওয়েতে পড়ে চললেন বালবোয়া পার্কের ভেতর দিয়ে। পেছনে পড়ল স্যান ডিয়েগোর বড় একাংশ। উঠলেন করোনাডো সেতুর ওপর। অনেক নিচে উপসাগরের বুকে চাঁদের রুপালি ঝিলিক।

নেভাল বেসের গেটে পৌঁছে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখালেন গার্ডকে। চট্ করে কার্ড চেক করল লোকটা। লিস্টে আছে এই ভদ্রলোকের নাম। ওপরে উঠে গেল স্টিলের বার। যেতে পারেন প্রফেসর বার্ডম্যান।

গার্ডকে স্যালুট দিলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রফেসরের দরজার পাশে থেমে বলল গার্ড,

'স্যর, আপনি সিভিলিয়ান। দয়া করে স্যালুট দেবেন না।'

'ঠিক,' হেসে মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'ফেরত দাও।'

'সম্ভব না, স্যর। নিইনি তো!'

দশ মিনিট পর সিকিয়োর এক ঘরে স্ক্যানার, কমপিউটার ও ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটরের সামনে বসলেন প্রফেসর। এবার অপেক্ষা করতে হবে টেলিকনফারেন্সের জন্যে। যে-কোনও সময়ে কোথাও থেকে যোগাযোগ করবে এলেনা।

উত্তেজিত বোধ করছেন প্রফেসর।

গাছের বাকলের কাগজ বা প্যাপিরাস একসময়ে গুঁড়ো হয়, এদিকে পাথরের ট্যাবলেট ভীষণ ওজনদার— কিন্তু তামার লিপি হাজার হাজার বছরের জরুরি এক সমস্যা দূর করে দিয়েছিল। হালকা জিনিস। বয়ে নিতে কষ্ট হয় না। দশ হাজার বছর ধরে এই ধাতু তোলা হচ্ছে খনি থেকে। তাম্রলিপির বুকে লিখলে রয়ে যায় সব। আগুনে পোড়ে না, সহজে ভাঙে না, খেয়ে শেষ করে না উই বা মথ। এই জিনিসই দরকার ছিল প্রাচীন আমলে।

আর্কিওলজিস্টদের অনেকে আশা করেছিল, সব জায়গায় পাবে এসব তামার লিপি। সেসবে থাকবে সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকটা তাম্রলিপি। কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে টিনের পাত। কিন্তু ডেড সি-র মত লিপি নেই বললেই চলে।

আর্কিওলজিস্টরা ধারণা করেন, ডেড সি-র তামার লিপি এসেছে অন্য এলাকার লোকের কাছ থেকে। তারা ছিল সমাজ বহির্ভূত। পরে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে প্যাপিরাস বা পার্চমেন্ট লিপিতে, সেসব থেকে অনেক আলাদা তাদের লিপি। যারা তৈরি করত, আঁচ করা হয় তারা এসব লিপিতে লিখত তাদের গুপ্তধনের খোঁজ। খুব গোপনে রাখত, ফলে পরে আর পাওয়া যেত না কিছুই। কখনও কখনও এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতো

তাম্রলিপির মালিক। কিন্তু এলেনা যে লিপির ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে, ওটার মালিক কখনও চায়নি হারিয়ে যাক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যত্ন করে রেখেছিল বলে এত হাজার বছর পরেও রয়ে গেছে। প্রফেসর ধারণা করছেন, যে-কোনও কারণেই হোক, বাধ্য হয়ে পালাতে হয়েছিল লোকটাকে।

লিপির অর্থ বুঝতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন তিনি। প্রথম অংশ প্রোটো-এলামাইট ভাষায়। আগে কাছাকাছি যেসব ভাষার লিপি পেয়েছেন, সেগুলোর সাহায্য নিয়ে এগোতে হয়েছে আন্দাজে। মৃত ভাষা প্রোটো-এলামাইট। অনুবাদ করার কাজটা ছিল কঠিন। কেউ জানে না এসব অক্ষর দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে ওরা।

শুরুতেই হাল ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা হলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন পুরো লিপি। তখনই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, ওটার ভেতর ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর চেনা দুটো ভাষা।

দ্বিতীয় ভাষাটি কিউনিফর্ম বা কীলক ভাষা। ব্যবহার করা হতো নানান আকারের কীলকের মত সিম্বল। এই তাম্রলিপিতে যে ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে, তা সুমেরিয়ান স্টাইল। খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ব্যবহৃত হতো দক্ষিণ ইরাকে।

প্রাচীন আমলের অন্যতম লিখিত ভাষা ওই সুমেরিয়ান। এ যুগে অনেকেই জানে কীভাবে অনুবাদ করতে হবে। ওই ভাষা পেয়ে যাওয়ার পর কপাল খুলল প্রফেসর বার্ডম্যানের।

তাম্রলিপির শেষাংশে যে লিখিত ভাষা, ওটা আক্কাডিয়ান বা পুবের সেমিটিক। ওটা অনুবাদ করেছে পরবর্তী সময়ের মানুষ। খ্রিস্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে ব্যবহার করা হতো মধ্য ও উত্তর ইরাকে। একই ভাষা চলত বর্তমানের সিরিয়াতে। আক্কাডিয়ান দেখলে মনে হবে নানান দিকে তাক করা হয়েছে অনেক ধরনের তীর।

প্রফেসর বুঝে গেলেন, আসলে এই তাম্রলিপিতে আছে তিনটে ভাষা। এটা করা হয়েছে বেশি মানুষকে খবর জানাতে। যে-কোনও একটা ভাষা জানলেই লিখিত বক্তব্য বুঝবে যে-কেউ। এই একই কাজ করা হয়েছিল রেসেটো স্টোনে।

কিন্তু অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন না বার্ডম্যান এই তাম্রলিপির। যে কথা লেখা হয়েছে, তা অকল্পনীয়। মানুষটা চেয়েছিল ছড়িয়ে পড়ুক তার লিখিত বক্তব্য।

মনিটরে মৃদু টিং শব্দ হতেই সচেতন হলেন প্রফেসর। এক মুহূর্ত পর দেখলেন গ্রিক দেবীর মত সুন্দরী এলেনা রবার্টসনকে।

সংক্ষেপে কুশল বিনিময় করল দু'জন, তারপর দেরি না করে মূল কথায় এলেন বার্ডম্যান।

'এ যেন জেনেসিসের কাহিনি। বললে বিশ্বাস করবে না কী হয়েছিল।'

'এসবের ভেতর অস্ত্র বা প্লেগের কথা লিখেছে?' জানতে চাইল এলেনা।

'না।' একটু অবাক হয়েছেন প্রফেসর। 'লিখেছে প্রায় স্বর্গীয় কয়েকটা বাগান ছিল সে আমলে।'

'তা-ই?'

গলা পরিষ্কার করলেন প্রফেসর। 'হ্যাঁ। এসব বাগানে ছিল অদ্ভুত এক গাছ। ওটার ফল মানুষকে দিত দীর্ঘ জীবন। এখানে লিখেছে, ওই ফল খেলে মরত না কেউ। এমন একটা বাগান ছিল মিশরের ফেরাউনের। ওটার দায়িত্বে ছিল সম্রাটের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যাজক। আরেকটা ছিল ভারতের গঙ্গার পাড়ে। ওই বাগানের মত আরও কয়েকটা ছিল ইথিয়োপিয়া আর ম্যাসেডোনিয়া বা গ্রিসেও।'

'বুঝলাম,' বলল এলেনা। 'একাধিক বাগান ছিল।'

'অদ্ভুত গাছের। আরেকটা ইরাকের সমতল এলাকায়।

ওখানে ছিল সুমেরিয়ানদের বিশাল সভ্যতা। সব এখন মরুভূমি। কিন্তু সাত হাজার বছর আগে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের মতই ইরাকের ওই এলাকা ছিল সবুজ। সভ্যতা ছিল। তারা ব্যবহার করত ঘোড়া। শিকারের অভাব ছিল না। এসব এলাকার একাংশে ছিল ওই বাগান এডিন। সুমেরিয়ান ভাষায় ওটা খোলা প্রান্তর।'

'খোলা এলাকায় বাগান, বুঝলাম,' বলল এলেনা, 'আর কিছু, প্রফেসর?'

'হাজার হাজার বছর আগে যখন লেখা হলো এই তামার লিপি, তত দিনে স্বপ্নের মত ওসব বাগানের বেশিরভাগ হয়ে গেছে বিরান এলাকা। একটার পর একটা। বীজ দিয়ে আর জন্ম হচ্ছিল না ওই গাছ। আবার গাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছিল না বিচি বা বীজ। ওই লোক যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ছিল ওই শেষ বাগান। ওখানে তখনও জন্ম নিত ফল।'

'বলে যান, প্রফেসর,' বলল এলেনা।

'সে সময়ের আগে হয়েছিল চরম দুর্ভিক্ষ,' নোট দেখলেন প্রফেসর। 'আমরা ওটাকে বলি ৫.৯ ইভেন্ট। কমবেশি ছয় হাজার বছর আগের কথা। উত্তর আফ্রিকা, মিডল ইস্ট আর এশিয়ার বড় একটা অংশ হয়ে গেল ধূসর মরুভূমি। আজও আমরা তা-ই দেখি। কেন এমন হয়েছিল, কেউ জানে না। কিন্তু এটা আমরা জানি: পরে মরুভূমিতে খুঁজে পাওয়া যেসব আধার থেকে ফসলের ফসিল পাওয়া গেছে, সে থেকে বোঝা যায়, খুব দ্রুত শুকিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকা।'

'বলুন, শুনছি,' আগ্রহ নিয়ে বলল এলেনা।

'চরম দুর্ভিক্ষের কথা থেকে আন্দাজ করছি, এই লিপি যে লিখেছে, সে বেঁচে ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০০ থেকে ৩৪০০ বছর সময়ের ভেতর।'

'আর কিছু, প্রফেসর?'

'চারপাশে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, রাজার বাগানের গাছ আর ফল দেয় না। কিন্তু কথাটা ছিল পুরো মিথ্যা। ঠিকই ফল দিত গাছ।'

'তার মানে, ওই শেষ বাগান রয়ে গিয়েছিল,' বলল এলেনা। 'তারপর কী?'

'লিপি অনুযায়ী, বালির প্রান্তরে ছিল মস্ত এক নদী। তার মাঝে ছিল একটা দ্বীপ, ওই বাগান ছিল ওখানে। শুধু রাজা, তাঁর কাছের লোক আর সেরা সৈনিকরা জানত কোথায় আছে ওটা। গোপন করা হয়েছিল সব। দিন-রাত পাহারা দেয়া হতো। দূরের সব রাজা ও বড়লোকদের কাছে প্রচুর সোনা-দানার বিনিময়ে বিক্রিও করা হতো ওই ফল। তারা ভাল করেই জানত, ফল খেলে অনেক দিন বাঁচবে। আর এ কারণেই বিত্তবান হয়ে উঠেছিল রাজা। সাধারণ মানুষ তার সুফল পায়নি।'

'চিরকাল যা হয়েছে,' বলল এলেনা, 'কিন্তু, প্রফেসর, এসব তথ্য থেকে বিশেষ কোনও লাভ হবে না আমার।'

'হয়তো সাহায্য করতে পারব, যদি তুমি বলো কী ধরনের সমস্যায় আছ,' বললেন বার্ডম্যান।

দ্বিধায় পড়ল এলেনা। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। ওই লিপি চুরি করে নিয়ে গেছে চরমপন্থী এক কাল্টের লোক। তাদের কথা, আসলে স্রষ্টা বলে কিছুই ছিল না কোনও কালে। যা খুশি করছে তারা। যাকে খুশি খুন করছে। শুধু তা-ই নয়, চাইছে বায়োলজিকাল ওয়েপন। সুযোগ পেলে সর্বনাশ করবে মানব জাতির।'

এলেনার কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেল প্রফেসর বার্ডম্যানের।

'যে জন্যেই হোক, ওই লিপি তাদের দরকার,' বলল এলেনা, 'ওই একই কারণে আমরাও ওটা ফিরে পেতে চাইছি। এখনও জানি না ওটার সঙ্গে ভাইরাসের হুমকি দেয়ার কী সম্পর্ক, কিন্তু

এটা বুঝতে পারছি, সম্পর্ক আছে।'

চুপ করে ভাবতে লাগলেন প্রফেসর।

অন্তত এক মিনিট পর বলল এলেনা, 'তামার লিপি এত মূল্যবান মনে করছে কেন? এর কোনও কারণ বলতে পারেন?'

'ওটায় লেখা আছে কীভাবে যেতে হবে ওখানে,' বললেন প্রফেসর।

'একটু খুলে বলুন।'

'ওটাই বাগানের পথ দেখিয়ে দেবে।'

অবাক চোখে প্রফেসরকে দেখল এলেনা। ওর মনে হলো ভুল শুনছে। 'সেই স্বর্গের মত বাগানে যাওয়ার পথ জানাবে?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলালেন বার্ডম্যান। 'অবশ্য, জিয়োগ্রাফিক ডেসক্রিপশন দিয়ে কিছুই বুঝবে না। আসলে এ কারণেই পরের কয়েক হাজার বছর ধরে খুঁজেও ওই বাগান পায়নি কেউ।' নিজের নোট দেখলেন বার্ডম্যান। 'ওটা ছিল পুবে। কিন্তু শুধু পুব বললে তো চলবে না। হাজার হাজার মাইল এলাকা। আরও বলেছে, এসব বাগান ছিল নদীর তীরে বা মাঝে। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস কোথায় আমরা জানি, এ ছাড়াও ওদিকে ছিল অন্য নদী। ওখানে মিলত সোনা ও অনিক্স। এসব আছে ইরাকে। ওদিকে নির্দেশ করছে তামার লিপি। বা বলতে পারো, মিডল ইস্ট। বাইবেলে আছে হাভিলা এলাকার কথা। ওটার অর্থ বিস্তৃত বালি। আবার লিপি অনুযায়ী, ইরাকের সমতল এলাকায় আছে ওই বাগান।'

'এটুকু বুঝলাম,' একটু অসহায় সুরে বলল এলেনা।

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, লিপি অনুযায়ী ওখানে আছে গিহন নামের নদী,' বললেন প্রফেসর, 'ওটা বয়ে গেছে কুশ এলাকার মাঝ দিয়ে। কিন্তু ওই নদী ইথিয়োপিয়ার কুশ এলাকার ভেতর দিয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করেন আর্কিওলজিস্টরা। কাছেই ছিল নীল নদ। বর্তমানের স্কলারদের মত নিখুঁত বর্ণনা দেয়নি ওই

লোক। আবার বাইবেলে বারবার এসেছে নীল নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল কুশ।'

চুপ করে আছে এলেনা।

'জায়গাটা খুঁজে বের করা কঠিন,' বললেন বার্ডম্যান। 'কিন্তু সত্যিই যদি থাকে মাত্র একটা বাগান, তো...' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'ওই বাগান কোথায় বলতে পারেন, প্রফেসর?'

'লিপি অনুযায়ী হয়তো খুঁজে বের করা যাবে। এখনও রয়ে যাওয়ার কথা একটা-দুটো দিক নির্দেশনা।'

'কিন্তু ওই বাগানের সঙ্গে স্রষ্টার অস্তিত্বের কী সম্পর্ক? ওই কাল্ট আসলে কী চায়? বায়োলজিকাল অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে কেন?' আরও গম্ভীর হয়ে গেল এলেনা। 'আমার মনে হচ্ছে কানা গলিতে আটকা পড়েছি।'

'তামার ওই লিপিতে অস্ত্রের কথা নেই,' বললেন বার্ডম্যান। স্ক্রিনে দেখছেন সুন্দরী মেয়েটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইলেন, 'তুমি খুঁজতে যাবে ওই বাগান?'

প্রথমবারের মত হাসল এলেনা। 'আপনার ভয়ের কিছু নেই, গেলেও আপনাকে সঙ্গে নেব না।'

মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'তা বুঝলাম। কিন্তু সত্যি যদি রানা আর তুমি যাও খুঁজতে, আমি হয়তো তোমাদেরকে জানাতে পারব কোথায় ছিল ওই বাগান। কিন্তু শর্ত থাকবে, তোমরা পচা লোকগুলোকে মেরে সাফ করার পর প্রথম সুযোগে এক্সকেভেট করতে দেবে আমাকে।'

চকচক করছে এলেনার চোখ। 'কিছু গোপন করেছেন, প্রফেসর? বোধহয় জানেন ওটা কোথায়?'

'এখনও না,' মাথা নাড়লেন বার্ডম্যান। 'কিন্তু লিপির ভেতর নানান ল্যাণ্ডমার্ক। তোমাদেরকে পাঠাতে পারব বাগানের খুবই

কাছে। ওখান থেকে খুঁজতে শুরু করলে পেয়ে যাবে।'

'আপনি পথ দেখালে পরের কাজ আমাদের,' বলল এলেনা, 'এক্সকেভেট করতে দিতে পারব কি না জানি না, কিন্তু সব কাজ শেষ হলে বড় এক বাক্স চকলেট পাঠিয়ে দেব।'

খুশি হয়ে হাসলেন মিষ্টিখোর প্রফেসর। 'কিছু না পাওয়ার চেয়ে ভাল।' আশ্বস্ত করলেন তিনি, 'আর বড়জোর কয়েক ঘণ্টা, এলেনা, তারপর যোগাযোগ করব। তোমরা স্যাটালাইট অনুসরণ করলেই তখন পাবে ওই বাগান।'

'খুঁজে বের করুন,' বলল এলেনা, 'খুব উপকৃত হব।' ওর মাথা থেকে দূর হচ্ছে না ওই বিপজ্জনক কাল্টের চিন্তা। সেই ফলের বাগান তারা খুঁজে পাওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে ওখানে।

বত্রিশ

একতলা, গোলাকার ছোট্ট বাড়িটার উঠানে চেয়ারে বসে আছে রানা। চারদিকে নানান জাতের ফল ও ফুলের বাগান। বারো কাঠা জমি নিয়ে বিসিআই-এর সেফ হাউস। চারপাশে উঁচু দেয়াল, ইলেকট্রিফায়েড। চারদিকে চোখ রাখছে গোপন ক্যামেরা। গত কয়েক মাস ধরে এখানে বাস করছে রেসিডেন্ট এজেন্ট আফরোজ আলী ও তার স্ত্রী নিনা আলী। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের নির্দেশে মিনা মোবারক, মিনতি ও মোনাকে নিয়ে এখানেই উঠেছে রানা।

ধূসর হয়ে এসেছে বিকেল। একটু পর নামবে সন্ধ্যা।

আকাশের দিকে তাকাল রানা।

গতকাল পুরো রাত ও আজ দুপুর পর্যন্ত বোটে চেপে পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে ওরা কুয়েতে। নামহীন এক ছোট্ট জেটিতে থেমেছে বোট। ওখান থেকে গাড়িতে করে ওদেরকে তুলে নিয়েছে আফরোজ, নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।

আশ্রয় পাওয়ার পর আবারও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মোনা। গত দু'ঘণ্টা ধরে ফোনে আলাপ করেছে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে, বোঝাতে চাইছে দুবাইয়ে যা ঘটে গেছে, সেটা খুব বড় কিছু নয়। এসব সমস্যা কাটিয়ে বহু পথ হাঁটবে মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশন, আবিষ্কার করবে অমৃতের মত ওষুধ। হ্যাঁ, আপাতত বাধ্য হয়ে ওকে সরে যেতে হয়েছে, কিন্তু কয়েক দিনের ভেতর নতুন করে গবেষণা এগিয়ে নেবে ও।

কিছুক্ষণ মোনার কথা শুনে উঠানে এসেছে রানা। ভাল করেই বুঝে গেছে, প্যারিসে যারা হামলা করেছিল বিজ্ঞানী বা ওদের ওপর, তাদের চেয়ে অনেক পেশাদার ছিল দুবাইয়ের ওই সন্ত্রাসী দল। স্থানীয় ছিল না, সবাই আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান লোক। অস্ত্রের অভাব ছিল না। নিয়ে এসেছিল চোরাই হেলিকপ্টার। সম্ভাবনা আছে যে ওই হামলা কাল্টের নয়, অন্য কোনও দলের।

নানান প্রশ্ন জাগছে মনে, কিন্তু একটারও জবাব নেই রানার কাছে। ওদিকে কোনওদিকে এগোতে পারেনি এলেনাও। মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে: হারিয়ে ফেলেছি তামার লিপি।

ওর কাছে কিছু ফোটো ছিল ওটার, সেগুলো দিয়েছে প্রফেসর বার্ডম্যানের কাছে। তিনি খুঁজবেন ফোটোর ভেতর জরুরি তথ্য।

যেইমাত্র এলেনার কথা ভেবেছে রানা, এমন সময় টিং শব্দ তুলল ওর ফোন। মেসেজ দিয়েছে এলেনা। ওটা পড়ল রানা: 'নতুন কিছু জানলে? বুঝতে পারলে হামলা করেছে কারা?'

না, নতুন কিছুই জানা নেই, ভাবল রানা। মনে হচ্ছে,

চারপাশে ছড়িয়ে আছে পায়লের অসংখ্য টুকরো। এসবই পায়লের কয়েকটা টুকরো, একটার সঙ্গে অন্যটা মেলে না। কোনও ছবি বা দৃশ্য তৈরি করা যাচ্ছে না।

মোনা ফোনে কথা শেষ করলে ওর সঙ্গে আলাপ করবে, ঠিক করেছে রানা। চেয়ার ছেড়ে আবারও বাড়িতে ঢুকতেই ডাইনিং রুমে দেখা হলো মিনা ফুফু ও মিনতির সঙ্গে।

টলমলে পায়ে ওর জন্যেই চা নিয়ে চলেছিল মিনতি, ওকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। পিচ্চি মেয়েটার হাত থেকে চা নিয়ে ধন্যবাদ দিল রানা। টেবিলে বসে নাস্তার সময়ে কিছুক্ষণ গল্প করল ওরা। তাতে রানা বুঝল, বাপের মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে মিনতি।

সন্ধ্যার পর সেফ হাউসের লাইব্রেরিতে ঢুকল রানা। ছোট্ট টেবিলে দেখল পরিচিত একটা বই। ওটা পড়ছিল বোধহয় মোনা। দুবাই থেকে নিয়ে এসেছে।

প্যারাডাইস লস্ট বইটার মলাট উল্টে দেখল রানা। প্রথম পাতায় সই করেছেন ডক্টর আহসান মোবারক। কিছু পাতা দেখা হয়েছে অনেক বেশিবার। প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। এসব পাতার প্রথমটা খুলল রানা। মহাকাব্যের একটা স্তবকের নিচে লাল কালিতে দাগ দেয়া। পড়ল:

The first sort by their own suggestions fell,
Self-tempted, self-depraved.

শয়তানের পতন বিষয়ে লেখা। সে সময়ে স্রষ্টার বিরোধিতা করতে গিয়েছিল সে।

রানা ভাবল, যে-কোনও কারণেই হোক, নিজেকে শয়তানের মত পরিত্যক্ত বোধ করেছেন ডক্টর মোবারক।

একেবারেই বিশ্বাস করতেন না স্রষ্টা আছে, তা হলে বারবার কেন ভাবতেন ওই বিষয়ে? তাঁর ধারণা ছিল, পাল্টে দিতে

পারবেন যে-কোনও প্রাণীর জীবন। তা-ই করতে গিয়ে পতন হয় তাঁর?

পাতা উল্টে আরেক জায়গায় লাল কালির দাগ দেখল রানা। ওই চরণ পড়তে শুরু করার আগেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল:

'"The more I see pleasures about me,
So much more I feel torment within me."'

ঘুরে তাকাল রানা।

দরজা পেরিয়ে থেমে গেছে মোনা। নিচু স্বরে বলল, 'তুমি মিল্টনের ভক্ত?'

ডক্টর মোবারক আর তুমি এই কবির ভক্ত কি না, সেটা বড় কথা, ভাবল রানা। মৃদু মাথা নাড়ল। 'একবার পড়তে চেয়েছি। এমন সব বিষয় মনে এল, বাধ্য হয়ে সরিয়ে রাখি বইটা।'

'অদ্ভুত সাহিত্য,' বলল মোনা, 'কেন মানুষের এই বর্তমান অবস্থা, চমৎকার করে বর্ণনা দিয়েছেন মিল্টন।'

'যে চরণ বললে, ওটার নিচে কালি দিয়ে দাগ দিয়েছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মোনা। 'বাবার দেয়া আণ্ডারলাইন। তবে এটাই আমার সেরা মনে হয়। বুঝতে পারোনি কী বলেছে?'

'রূঢ় বাস্তবতার কঠিন কষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই জানো, তোমার বাবা যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন, তারাও মিল্টনের ভক্ত।'

'জানি।'

একটু কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ: 'আরও অনেক কিছুই জানো, যা বলবে না।' হঠাৎ করেই অশ্রু জমল মোনার চোখে। ঘুরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাকল রানা, 'মোনা।'

থমকে গেছে মেয়েটা। গাল বেয়ে নামছে লবণ জল। হাত

দিয়ে মুছে ফেলল। 'কতটুকু পড়েছ প্যারাডাইস লস্ট, রানা?'

'যথেষ্ট নয় যে পরীক্ষার খাতায় লিখে পাশ করব।'

'জানো, কে আসলে ইউরিয়াল?'

মাথা নাড়ল রানা।

'ইউরিয়াল ছিল স্রষ্টার সবচেয়ে প্রিয় ফেরেস্তা। সূর্যদেবতাও বলতে পারো। কিন্তু স্রষ্টা ইডেন বাগান তৈরি করলে একটু বেশিক্ষণ ওদিকে চেয়েছিল সে। কোনও ক্ষতি করতে চায়নি, কিন্তু ওই যে একটু বেশিক্ষণ দেখল, সেজন্যে ওই বাগান দেখে ফেলল শয়তান। আর সেজন্যেই শুরু হলো ওই কাহিনি।'

'তার মানে, তুমিই নিয়ে গিয়েছিলে ডক্টর মোবারককে ওই লোকগুলোর কাছে?' আন্দাজ করল রানা।

'তার উল্টো,' বলল মোনা, 'তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম বাবার কাছে।'

চমকে গেছে রানা।

'কী করে, তা জানতে চাও?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোনা। 'আমি মার্ভেল ড্রাগ্‌স্‌ কর্পোরেশনে যোগ দেয়ার আগে একদম অসহায় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কোথাও চাকরি পেতেন না বাবা। আর তখনই এল এক লোক। সে আগ্রহী ছিল জেনেটিক বিষয়ে। অদ্ভুত এক লোক। টাকার অভাব ছিল না। বলেছিল, বিজ্ঞানীরা যেসব দিকে দেখছে না, তেমনই এক জেনেটিক সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চায়। খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম আমার বাবার কথা। খুব গর্বিত ছিলাম। জেনেটিকস নিয়ে গবেষণার কোনও উপায়ও ছিল না আমাদের। টাকা ছাড়া কিছুই করতে পারব না। যোগাযোগ করিয়ে দিলাম বাবার সঙ্গে তার। যখন বুঝলাম, মস্ত বিপদে পড়বেন, ততক্ষণে জালের ভেতর আটকা পড়ে গেছেন বাবা।'

'ওদের দরকার বায়োলজিকাল অস্ত্র,' বলল রানা, 'কঙ্গোর

জেনারেলদের মতই।'

মাথা দোলাল মোনা। 'আগের মতই, চাইলেও সরিয়ে নিতে পারলাম না বাবাকে। এবার বড় বেশি দেরি হয়ে গেল।'

অপরাধের কাঁটা বিঁধছে মেয়েটার বুকে, টের পেল রানা। নরম সুরে বলল, 'বুঝতে পারছি, কত কষ্ট চেপে রেখেছ মনে। আর এসব করতে হয়েছে খুব জরুরি একটা কারণে।'

'হ্যাঁ, ওষুধ আবিষ্কার করতে না পারলে মরে যাবে মিনতি,' বলল মোনা, 'ওটাই ভেবেছি তখন। এখন জানি, যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে ওই প্রাচীন বাগান। ওটার সেই গাছ বা বীজ না পেলে কিছুই সম্ভব নয়। তাই তোমার কাছে সাহায্য চাই, রানা।'

'ব্যাপারটা আরও জটিল,' বলল রানা। 'ওই কাল্টের লোকও খুঁজছে ওই বাগান। ভয়ঙ্কর কিছু করতে চাইছে। বাহন ভাইরাস এখন তাদের হাতে। এরই ভেতর ইউএন অফিসে এক মহিলার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওটার ভেতর রসদ ছিল না। তোমার বাবা তাঁর ল্যাবে বোমা রেখে দিয়েছিলেন। ৯৫২ টেস্ট রেযাল্ট আর জীবাণু আনতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে তাদের লোক। তার আগেই খুন করে ফেলেছে তোমার বাবাকে। ডক্টর ভাল করেই জানতেন, পৃথিবীর কী অবস্থা হবে ওরা জীবাণু ছড়িয়ে দিলে। নিজের জীবন দিলেন, আর নষ্ট করলেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

'অনেকে বলবে, ওটাই বাবার সবচেয়ে খারাপ কাজ,' বলল মোনা।

মেয়েটা আসলে কী বোঝাতে চাইছে, বুঝল না রানা।

'আমার বাবা খুন হয়ে যাওয়ার পর, এখন যদি নিজ চোখে আমাকে দেখতে হয়, মরে গেল আমার বোন; তো বাঁচার কোনও কারণ খুঁজে পাব না। তার চেয়েও বড় কথা, মিনতির মত কোটি

কোটি বাচ্চা যদি কষ্টে পড়ে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে?'

'অর্থাৎ, মিনতি সুস্থ হবে সেজন্যে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলে,' বলল রানা।

'এখন নিজেকে মনে হচ্ছে নরকের কীট,' বলল মোনা, 'আমার কি উচিত এরপরও বেঁচে থাকা? তবুও বেঁচে আছি শুধু একটা কারণে, যদি আবিষ্কার করতে পারি মিনতির জন্যে দরকারী ওষুধটা।'

বুক ভেঙে যাচ্ছে মেয়েটার, বুঝল রানা। দশ বছর বুকের কষ্ট নিয়ে ওষুধ খুঁজেছেন ডক্টর মোবারকও।

বিড়বিড় করল রানা: '"The more I see pleasures about me, so much more I feel torment within me."'

ওর চোখে তাকাল মোনা। '৯৫২ রেযাল্ট নষ্ট করে দেননি বাবা। ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে।'

'আর সেটা জানে ওই কাল্ট, বা সন্দেহ করছে,' বলল রানা।

'আমারও তা-ই ধারণা,' মাথা দোলাল মোনা।

'জরুরি কোনও কারণে তোমাকে তুলে নিতে চেয়েছিল, কাজেই নিরাপদ জায়গায় থাকতে হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু এই কুয়েতও নিরাপদ নয়।'

'তা ঠিক, ইউএন অফিসেও যখন হামলা করেছে,' সায় দিল মোনা।

এখন পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি কীভাবে ভাইরাস ঢুকল ওই অফিসে। কাজটা এমন কারও, যে জানে সরকারি ব্যবস্থা। উন্মাদ একদল লোক এসব পারবে, তা অকল্পনীয়। রানার বাক্সে ওটা আরেক টুকরো পাযল।

'ডক্টর মারা যাওয়ার পর উড়ে গেছে ল্যাব, কাজেই ৯৫২ টেস্ট নাগালে পেতে হলে একমাত্র উপায় তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া,' বলল রানা। 'এবার এমন কোথাও তোমাকে সরিয়ে

দিতে হবে, যেখানে হামলা করবে না তারা। নইলে হয়তো ওই ভাইরাস দিয়ে খুন করবে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ।'

ঢোক গিলল মোনা। 'তা হলে একটা কাজ করতে পারো। খুন করে ফেলো আমাকে।'

'তা সম্ভব নয়, অত বড় পশু আমি নই,' বলল রানা। 'কিন্তু যারা তোমার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি চায়, তাদেরকে খুন করতে দেরি করব না।'

থমথম করছে রানার মুখ।

পাশের চেয়ারে বসে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল মোনা। বুঝল রানা, কত বড় চাপ সহ্য করছে মেয়েটা। একবার ভেবেছিল, বিসিআই-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মোনাকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সব ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ততক্ষণ পাহারা দিতে হবে ওকে। হয়তো কয়েক মাস লাগবে ওই কাল্টের গোড়া উপড়ে ফেলতে। কিন্তু তত দিনে মরে যাবে মিনতি। ডক্টর মোবারক আর মোনার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

'তুমি জানো না,' ফিসফিস করল মোনা, 'ওদের টেস্ট ৯৫২ চাই না। দরকারই তো নেই! ওদের দরকার ওই বাগানের সেই গাছের ফল। বা জীবন-বৃক্ষের বীজ!'

অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা, 'ওটা দিয়ে কী করবে? জীবন-বৃক্ষের মাধ্যমে মানুষ খুন করবে কী করে?'

বিষণ্ন চোখে ওকে দেখল মোনা। 'ওরা ইবলিশ, রানা। ওরা খুন করবে না কাউকে। কিছুই ধ্বংস করবে না। ইডেন গার্ডেনে শয়তানও কিন্তু আদম বা হাওয়াকে খুন করেনি। চালাকি করেছে, ওই ফল খেলে যাতে ভবিষ্যতে মরতে হয় ওদেরকে।'

'একটু খুলে বলো কী ভাবছ,' বলল রানা।

মোনার দু'কাঁধে যেন চেপে বসেছে ভারী পাথর। অন্তত এক মিনিট ভেবে নিয়ে তারপর মুখ খুলল, 'ভাইরাস দিয়ে দশ লাখ বা

দু' শ' কোটি মানুষ খুন করেও পৃথিবী ধ্বংস করতে পারবে না ওরা। তাতে হয়তো এক শ' বছরের জন্যে বাধা পড়বে মানব-সভ্যতার উন্নতি। হয়তো উপকারই হবে এ গ্রহের। তা ছাড়া, যত রোগের বিরুদ্ধে লড়ছে বিজ্ঞানীরা, তাতে বেশি দিন লাগবে না ঠিক চিকিৎসা পন্থা আবিষ্কার করতে। আসলে থিয়োরেটিকালি কাউন্টার ভাইরাস তৈরি করতে পারব আমরা। বা জিন থেরাপি ব্যবহার করে মেরামত করতে পারব ডিএনএ। তখন কোনও কাজেই আসবে না প্লেগ। আর তাই এসব করবে না তারা।'

'তা হলে কী করবে?'

'ওরা চায় জীবন-বৃক্ষের ভেতরের ভাইরাসটা, ওটার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বাহক ভাইরাস; তারপর দুটোর মিশ্রণ ছড়িয়ে দেবে পুরো পৃথিবী জুড়ে।'

'তার মানে রোগের ভয় নেই, আমরা হব প্রায় অমর,' বিড়বিড় করল রানা, 'তো ক্ষতি কোথায়? ...কিন্তু জনসংখ্যা...'

'প্রথমে ক্ষতি বুঝবে না কেউ,' বলল মোনা, 'কিন্তু ভাইরাস ছড়িয়ে গেলে প্রথমে দ্বিগুণ হবে মানুষের আয়ু... বা চার-পাঁচ গুণ। তখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যু হবে না। বড় হবে না তরুণ-তরুণী। এক শ' বছর ধরে বাচ্চা নেবে। তার মানে, দু'দশকে জনসংখ্যা হবে বর্তমান পৃথিবীর কয়েক গুণ। মাত্র কয়েক বছরে মানুষের চাহিদার চাপে মৃত্যু হবে এই গ্রহের।'

এটাই ভাবতে শুরু করেছিল রানা। সমস্যার গভীর দিকটা বুঝে গলা শুকিয়ে গেছে ওর।

'এখন আমরা সাত বিলিয়ন,' বলল মোনা, 'আগামী বিশ বছরে হব পনেরো বিলিয়ন। শতাব্দীর মাঝে পৌঁছে তিরিশ বিলিয়ন মানুষ থাকব। তার মানে, নিজেদের ভেতর যুদ্ধ ও কষ্ট ছাড়া কিছুই থাকবে না। না খেয়ে মরবে কোটি কোটি মানুষ। স্বর্গ আছে কি নেই, তা বড় কথা হবে না; এ পৃথিবীই হবে সবচেয়ে

ভয়ঙ্কর নরক। সেখানে প্রায় অমর হাজার হাজার কোটি মানুষ খিদের ভেতর বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করব সবাই। ধর্মের বোল উধাও হবে সবার মুখ থেকে।'

চুপ করে থাকল রানা।

'বিজ্ঞানীরাই অ্যান্টি-ডোট আবিষ্কার করবে,' বলল মোনা। 'কিন্তু কাকে দেবে আগে? কে বেছে নেবে মৃত্যু? মানুষ চাইবে না মরণ-ওষুধ দেহে নিতে। কে চাইবে পৃথিবীর জন্যে মরতে?'

'প্রায় কেউ না,' বিড়বিড় করল রানা।

'কিন্তু ওই পিল খেলে কমবে আয়ু। ওটাকে কী বলবে সবাই? আত্মহত্যার পিল?'

রানার মনে পড়ল, এ বিষয়ে বলেছিলেন ডক্টর মোবারক। তখন তাঁকে মারতে উঠেছিল প্রায় সবাই। ওই ওষুধ দিতে গেলে সবাই বলবে, আমাকে না, অন্যকে দাও! আমি বাঁচতে চাই!

'কী, রানা, ভেবেছ, কী হতে চলেছে সামনে?' মাথা নাড়ল মোনা। 'বেশ কয়েক বছর আগে বাবা প্রচার করেছিলেন, আমাদের উচিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা। নইলে একসময়ে পৃথিবী হবে নরক। তখন তাঁকে ফ্যাসিস্ট বা ফ্যানাটিক বলেছিল সবাই। ...তা হলে কি ভবিষ্যতে ওষুধ দিয়ে জন্ম ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হবে? লটারি হবে? শ্বেতাঙ্গরা মানবে? বা কৃষ্ণাঙ্গরা? বা আমরা? ...কারা রাজি হবে বন্ধ্যা হতে? ...তার মানে, যাদের জোর বেশি, তারা যা খুশি করবে। আবারও পৃথিবী জুড়ে হবে মহাযুদ্ধ। বরাবরের মতই সুযোগ-সুবিধা পাবে বড়লোকরা। সাধারণ মানুষ হবে বঞ্চিত। ভাল খাবার পাবে না, পাবে না সুপেয় পানি, মৃত্যু আসবে খুব কষ্ট দিয়ে। সামনে এসবই আসছে, রানা। এখনই ঠেকাতে না পারলে ওই কাল্ট পৃথিবীর বুকে তৈরি করবে নরক। মাফ পাবে না কেউ।'

রানার মনে পড়ল, ওর বন্ধু গ্রাহামকে বলেছিলেন ডক্টর মোবারক, *ওরা আনফরগিভেবল*।

এখন ও বুঝতে পারছে, কী বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

'ওই দৈত্য একবার বেরিয়ে গেলে, আর কখনও বোতলে ভরতে পারবে না কেউ,' বলল মোনা, 'এর চিকিৎসা নেই। দীর্ঘজীবন নিশ্চিত করে নরকের যাতনা দেয়া হবে।'

'এখন বুঝলাম, কতটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন ডক্টর,' বলল রানা। 'এত ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবেছ তোমরা, কিন্তু তখনও যেমন কিছু করার ছিল না, এখনও নেই। আমরা বড়জোর চেষ্টা করতে পারি, যাতে ঠেকানো যায় ওই কাল্টকে।'

'আমার বাবার মতই, আমিও চাই না আমার কারণে ধ্বংস হোক পৃথিবী,' বলল মোনা। 'কিন্তু হাল ছাড়ব না, অবশ্যই চেষ্টা করব মিনতিকে বাঁচাতে। যারা ওর মত রোগে আক্রান্ত, তাদের হাতে তুলে দিতে চাই ওই ওষুধ। অথচ, ওই একই ওষুধ দিয়ে শেষ করে দেবে পৃথিবী। অদ্ভুত এই জগৎ। এই কাল্ট শেষ করে দেবে স্রষ্টার সৃষ্টি, সত্যিই হারিয়ে যাবে প্যারাডাইস।'

ওই কাল্টের আছে ভয়ঙ্কর এক পিস্তল, এখন চাই শুধু বুলেট। গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'খুঁজে বের করতে হবে ওই বাগান। যদি থাকে, ওই কাল্টের আগেই পৌঁছুতে হবে ওখানে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মোনা।

ডক্টর মোবারক বা মোনা প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী, ওরা যদি মনে করে সত্যিই কোথাও আছে ওই বাগান, সেক্ষেত্রে ওটা খুঁজতে যাওয়াই ভাল। 'দুই জায়গায় ফোন দেব,' বলে লাইব্রেরির দরজা পেরিয়ে উঠানে বেরিয়ে এল রানা। ফোন করল বিসিআই চিফের ব্যক্তিগত ল্যাণ্ড ফোনে।

'হ্যালো, রানা।'

ওদিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠ শুনে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'স্যর,

সব এখনও পরিষ্কার নয়।' পারস্য উপসাগরে বোটে করে আসার সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে রানা। নতুন তথ্যগুলো জানাল।

জবাবে বিসিআই চিফ বললেন, 'এবার খুঁজে বের করতে হবে ওই বাগান।'

'জী, স্যর।'

'দেরি করার উপায় আছে বলে মনে করি না,' বললেন রাহাত খান। 'দলে আরও কয়েকজনকে নেবে ভাবছ?'

'জী-না, স্যর। একসঙ্গে জড় হওয়ার সময় নেই।'

'ঠিক আছে, যোগাযোগ রাখবে।'

'জী।'

ওদিক থেকে রেখে দেয়া হলো রিসিভার।

এবার এলেনাকে ফোন করল রানা। ওদিক থেকে কল রিসিভ হতেই বলল, 'কী অবস্থা, এলেনা?'

'কানা গলিতে আটকে গেছি,' ক্লান্ত স্বরে বলল মেয়েটা, 'আমার মনে হচ্ছে ওই কাল্টের লোক বদ্ধ-উন্মাদ। দুনিয়া জুড়ে এখানে ওখানে না গিয়ে দেখা দরকার, ঠেকানো যায় কি না ওই ভাইরাস।'

'তা নয়, আমাদের পরের টার্গেট প্রাচীন একটা বাগান,' জোর দিয়ে বলল রানা, 'নইলে ডক্টর মোবারক সেই মিটিঙে যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই হবে— নরক হবে এ পৃথিবী। সবাইকে ওরা অতি দীর্ঘ আয়ু দেবে।'

মোনার কাছ থেকে কী জেনেছে, সংক্ষেপে জানাল রানা।

তিন মিনিট পর কথা ফুরিয়ে গেলে এলেনা বলল, 'বিশ্বাস করবে না, আমি বোধহয় জানি কোথায় খুঁজতে হবে ওই গাছ।'

'ইরাকে?' আন্দাজ করল রানা, 'টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের কাছে কোথাও?'

'সহজ হবে না পাওয়া,' বলল এলেনা, 'প্রফেসর বার্ডম্যান

ধারণা করছেন, ওই বাগান ছিল পশ্চিম ইরাকে। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে ওখানে যাওয়া খুব কঠিন কাজ।'

'সীমান্ত আমরা পেরিয়ে যাব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি পৌঁছে যাও বসরার উত্তরে আল কুয়ারনাতে। ওখানে তোমার সঙ্গে যোগ দেব আমি।'

'তোমার সঙ্গে আসছে মোনা মোবারক?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে ওর ফুফু আর ছোট বোন মিনতি।'

'ওদের জন্যে সেফ হাউস লাগবে?'

'পেলে ভাল হয়। ওখানে বিসিআই-এর সেফ হাউস নেই।'

'আলাপ করব আমার চিফের সঙ্গে, পরে দেখা হবে আল কুয়ারনাতে।'

'ঠিক আছে,' ফোন রেখে দিল রানা।

তেত্রিশ

সুযোগ থাকলে বিসিআই-এর কয়েকজন এজেন্টকে সঙ্গে নিত রানা, কিন্তু এ মুহূর্তে সে উপায় নেই। হাতে নেই পর্যাপ্ত সময়। একবার ভেবেছিল, মোনাকে ছাড়াই খুঁজতে যাবে ওই বাগান। কিন্তু স্পষ্ট মানা করে দিয়েছে মেয়েটা। সেক্ষেত্রে গোপন কোনও ইনফর্মেশন দেবে না ওকে। একমাত্র মোনা জানে জীবন-বৃক্ষের রহস্য। বাধ্য হয়েই ওকে সঙ্গে নিতে হয়েছে।

এনআরআই-এর ছোট এক সেফ হাউসে মিনা ফুফু ও মিনতিকে রেখেছে ওরা। গাড়ি করে মোনাকে নিয়ে ইরাকে

ঢুকেছে রানা, সীমান্তে সামান্য বিরতির পর রওনা হয়েছে সোজা উত্তর দিকে। গন্তব্য: আল কুয়ারনা শহর।

কিন্তু ওখানে পৌঁছবার একটু আগে নিরালা এক জায়গায় জঙ্গলের ভেতর মিলিত হয়েছে জন গ্রাহামের সঙ্গে। তার পরনে মরুভূমির ক্যামোফ্লেজ ড্রেস। এত স্বল্প সময়ে ওকে ছাড়া সশস্ত্র অন্য কাউকে জোগাড় করতে পারেনি রানা। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আবারও গাড়ি যোগে রওনা হয়েছে ওরা।

'ঠিক আগের মতই, না, রানা?' বলল গ্রাহাম, 'সামনের পথে থাকবে বড় সব ঝামেলা।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল রানা।

রাস্তা ধরে পাঁচ মাইল যাওয়ার পর একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের পাশে থামল ওরা। বড়সড় গাড়িটার পেছনে তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কী যেন। ক্যাবের পাশে সুন্দরী এক মেয়ে।

'হুরপরী কোত্থেকে?' রানার কাছে জানতে চাইল গ্রাহাম।

'বান্ধবী,' জানাল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। এলেনার সঙ্গে মোনা ও গ্রাহামের পরিচয় করিয়ে দিতে চাইল রানা, কিন্তু তার আগেই গ্রাহামকে পাত্তা না দিয়ে মোনার দিকে হাত বাড়াল এলেনা। 'এলেনা রবার্টসন, চাকরি করি ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে।'

'উনি আমেরিকান সরকারের হয়ে কাজ করেন?' দ্বিধা নিয়ে রানাকে দেখল মোনা। কণ্ঠ শুনে মনে হলো, বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ওর সঙ্গে।

'তা-ই করে, এ মিশন সফল করতে ওর সাহায্য লাগবে,' বলল রানা।

'আসলে কী চান?' সরাসরি এলেনার চোখে তাকাল মোনা।

'আপনি যা চাইছেন, ওই একই জিনিস,' বলল এলেনা, 'ওই গাছের বীজ চাই, যাতে ঠেকাতে পারি কাল্টের লোকগুলোকে।'

‘তার মানে, প্রথম সুযোগে সব কেড়ে নেবেন,’ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে মোনা।

‘তা করব না,’ সহজ স্বরে বলল এলেনা। ‘এক সঙ্গে কাজ করব আমরা। বলা যায় না, পরে আপনার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে টাকাও জোগান দিতে পারে এনআরআই। আপনার বোনের চিকিৎসার জন্যে যা করার করবেন, তাতে কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু তার আগে, নষ্ট বা পাল্টে দেবেন বাহক ভাইরাস, যাতে শুরু না হয় মহামারী।’

আশ্বস্ত করা হলেও দ্বিধার ভেতর আছে মোনা। রানাকে বলল, ‘সত্যি কি এদের দু’জনকে বিশ্বাস করতে পারি?’

‘কোনও ক্ষতি তো দেখছি না,’ বলল রানা, ‘ওরা আমার পুরনো বন্ধু।’

এলেনাকে বলল মোনা, ‘ঠিক আছে, রানা আপনাদেরকে বিশ্বাস করছে, আমারও বিশ্বাস করাই উচিত।’ রানার বাহুতে হাত রাখল ও।

রানা দেখল, ফ্যাকাসে লাগছে এলেনার মুখ। নানা অনুভূতির ঝড় এনআরআই এজেন্টের চোখে-মুখে। মিশন সফল করাই মূল কাজ, ভাবল ও।

এবার গ্রাহামের সঙ্গে হাত মেলাল এলেনা।

তাতে চওড়া হাসি দিল গ্রাহাম। ‘শুনেছি রানার খুব ভাল বন্ধু আপনি।’

চট্ করে একবার রানাকে দেখল মোনা।

‘হ্যাঁ, দু’জনেই ভাল বন্ধু।’

গম্ভীর চেহারায় ট্রাকের পেছন দিকে চলে গেল এলেনা।

মুচকি হাসল গ্রাহাম। ‘এর বুক পাথর দিয়ে তৈরি, রানা!’

‘উঠে পড়ো ট্রাকের ক্যাবে,’ দরজা খুলে বন্ধুকে তাড়া দিল রানা।

মোনা ও গ্রাহাম ক্যাবে ওঠার পর ট্রাকের পেছনে এলেনার সঙ্গে দেখা করল রানা।

'খুব সুন্দরী, তা-ই না, রানা?' গম্ভীর চোখে রানাকে দেখল এলেনা।

'তুমি, না ও? কার কথা জানতে চাও?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'সুন্দরী বলল, "ঠিক আছে, রানা আপনাদেরকে বিশ্বাস করছে, আমারও বিশ্বাস করাই উচিত।" এসব শুনে অস্বস্তি লাগছে আমার।'

'অস্বস্তিটা আপাতত সহ্য করো,' বলল রানা। উঠে পড়ল ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের পেছনে। সরিয়ে দেখল তারপুলিন। নিচে বসে আছে এয়ারবোট। এসব জিনিস ব্যবহার করা হয় এভারগ্লেড্-এ। 'জিনিসটা নতুন মনে হচ্ছে। অস্ত্র জোগাড় হয়েছে?'

মাথার ইশারা করে লকার দেখাল এলেনা। উঠে এল রানার পাশে। লকার খুলল। র‍্যাকে এআর-১৫এস, ওগুলোর দুটোর নলের নিচে গ্রেনেড লঞ্চার। রাইফেলের বামে রাখা বড় এক বাক্স ম্যাগাযিন।

'অন্য দুই রাইফেল তুলতে পারব ট্রাইপডে,' বোটের সামনের দিকে মাউন্ট দেখাল এলেনা।

'আর কিছু?'

'বডি আর্মার। রেইডার-অ্যাবসর্বেন্ট কোটিং দেয়া বোট। প্রয়োজনে তৈরি করতে পারব প্রচুর ধোঁয়া।'

যাওয়ার পথে ইরানিয়ান আর্মির সঙ্গে দেখা হলে শুধু ধোঁয়া দিয়ে কাজ হবে না। তারা ফেলবে গোলা।

'আমরা ঢুকব জলার উনিশ মাইল ভেতরে, শেষ আট মাইল ইরানের ওদিকে,' বলল এলেনা। 'ওখান থেকে শক্ত জমিতে উঠে আরও পাঁচ মাইল। ওই এলাকা পরিত্যক্ত। তিন ঘণ্টা আগে

ওদিক দিয়ে গেছে স্যাটালাইট। কেউ নেই।'

পশ্চিমে তাকাল রানা। ডুবি-ডুবি করছে সূর্য। আঁধার নামলে রওনা হবে ওরা।

'কাজটা সহজ মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল এলেনা।

'শত্রুপক্ষ না থাকলে বিপদ হবে কেন?' পাল্টা প্রশ্ন তুলল রানা।

'কিন্তু তারা যদি হাজির হয়?'

'তখন লুকিয়ে পড়ব তোমার আঁচলের আড়ালে,' হাসল রানা।

'আমার আঁচল, না মোনার?'

'কাছে যে থাকে!'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল এলেনা।

হাওইযেহ মার্শের পানির খুব কাছে ফ্ল্যাটবেড ট্রাক নিয়ে গেল রানা। ইরান-ইরাকের সীমান্ত জুড়ে বিশাল বিস্তৃত এই জলাভূমি।

আগেই বোটে উঠেছে এলেনা, পরীক্ষা করছে সব সিস্টেম। কাজ শেষ হলে হাতের ইশারা করল রানা, গ্রাহাম ও মোনার উদ্দেশে। পরের মিনিটে বোট বেঁধে রাখা সব স্ট্র্যাপ খুলে ফেলল ওরা। এয়ারবোট নামিয়ে দেয়া হলো অগভীর জলে।

ট্রাক নিয়ে জঙ্গলে রাখল গ্রাহাম।

আবার সবাই জড় হতে বলল রানা, 'সবাই তৈরি তো?'

মাথা দোলাল এলেনা, গ্রাহাম ও মোনা।

উঠে পড়ল ওরা বোটে। সেকেণ্ডারি মোটর চালু করল এলেনা। নীরবে চলবে ইলেকট্রিক ইমপেলার। বোটের সামনের ওই ইঞ্জিন পানি টেনে নিয়ে বের করে দেবে পেছনের সরু নালা দিয়ে। প্রায় নিঃশব্দ, কিন্তু গতি অনেক কম। এই মোটর ব্যবহার করে বড়জোর সাত নট বেগে চলতে পারবে ওরা। ফলে পুরো

তিন ঘণ্টা লাগবে জলাভূমি পেরোতে।

বড় কোনও বিপদে তুমুল গতি তুলে ইরাকি সীমান্তে ফিরতে হলে, ব্যবহার করবে বিশাল এয়ারফ্যান। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ওটা গতি তুলবে পঞ্চাশ নটে। একটাই সমস্যা, চট্ করে ঘুরিয়ে নেয়া যায় না বোট।

আপাতত নীরবে আঁধার ভেদ করে চলেছে ওরা। এই এলাকা একসময়ে ছিল দুই দেশের যুদ্ধক্ষেত্র।

জলাভূমি সীমান্তে, তাই একবার ইরানিয়ান ফোর্সকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সামনে বেড়ে ইরাকে হামলা করতে। আর্মির বেশিরভাগই ছিল নিরস্ত্র ভবঘুরে ধরনের লোক। তাদের ব্যবহার করা হয় কামানের গোলা ঠেকাতে। পেছনে ছিল সত্যিকারের সশস্ত্র আর্মি।

সেই সময়ে এই ধরনের হামলা হবে ধারণা করে জলাভূমির এদিকে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয় সাদ্দাম হোসেন। ফলে খুন হয়েছিল কয়েক হাজার ইরানিয়ান। এ মুহূর্তে নেই সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশ, তবুও কেমন ভারী হয়ে এল রানার বুক।

'প্রফেসর বার্ডম্যান কী ভাবছেন?' এলেনার কাছে জানতে চাইল। 'উনি খুশি যে আমাদের সঙ্গে আসতে হয়নি?'

মৃদু হেসে নিচু স্বরে জানাল এলেনা, 'ওই তাম্রলিপির ফোটোগ্রাফ দেখে প্রফেসর জেনেছেন, আগে পৃথিবীতে বেশ কয়েকটা এরকম বাগান ছিল। চারদিকে থাকত খাল, মাঝে দ্বীপ। কয়েক হাজার বছর আগে শুকিয়ে যেতে লাগল মিডল ইস্ট। তখন টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদী থেকে খাল কেটে রক্ষা করা হয়েছিল ইডিন বাগান। প্রাচীন ওই সময়ে সবাই ধারণা করত, এসব খালের কারণে বেঁচে গেছে জীবন-বৃক্ষ।'

'অসম্ভব নয়,' এলেনার কথা শুনে বলল মোনা। 'আমার বাবা

গবেষণা করে জেনেছিলেন, প্রায় প্রতিটি সভ্যতায় এমন কিছু গাছ ছিল, যেগুলো অনেক বাড়িয়ে দিত আয়ু। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানান কারণে বিলুপ্ত হয়েছে সেসব গাছ।'

'তো সাত হাজার বছর ধরে বাগান শুকিয়ে আছে, গাছ পাব কোথায়?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

স্যাটালাইট ছবি দেখছে রানা। জবাব জানা আছে ওর। কিন্তু আগে মুখ খুলল মোনা, 'ভাল পরিবেশ পেলে হাজার হাজার বছর রয়ে যায় ওসব বীজ। গরম, খরা, শীত, গ্রীষ্ম, অগ্ন্যুৎপাত সবই সহ্য করে। কমপিউটারের প্রায় ঘুমন্ত প্রোগ্রামের মত। সঠিক সময় বা পরিবেশ পেলেই জেগে ওঠে।'

'সেই পরিবেশটা কী ছিল?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

'ঠিক তাপ ও পানি পেলেই জন্ম নিত গাছ,' বলল মোনা।

'তাই বলে সাত হাজার বছর পরও?'

'হ্যাঁ, পরেও,' বলল মোনা, 'দরকার সঠিক তাপ ও পানি। আমাদের অবশ্য বীজ থেকে গাছ জন্মাতে হবে না। একটা বীজ পেলেই হবে। ওটার ভেতর রয়ে যাওয়ার কথা ভাইরাস।'

'এখনও থাকবে ভাইরাস?' জানতে চাইল এলেনা।

'নানাদিক থেকে কঠিন হয় ভাইরাসের জীবন,' বলল মোনা। 'আসলে ওটা কয়েক ধরনের মিশ্রণে তৈরি কেমিকেল ছাড়া কিছুই নয়, হঠাৎ ভাল সেল বা কোষ পেলেই বহু কালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জেগে উঠবে সঠিক সময়ে।'

'খাবার লাগে না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল গ্রাহাম। ওর আধখানা পাকস্থলিরও খাবারের ব্যাপারে আগ্রহ খুব বেশি।

'না,' মাথা নাড়ল মোনা, 'খাবার চাই না ওদের। তাপ উৎপাদন করে না, তাই থাকে না কোনও সেলিউলার প্রক্রিয়া।'

'বাঁচে কী করে?' অবাক হয়েছে গ্রাহাম। 'আমি হলে তো...'

'বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ভাবেন, ওরা বেঁচে নেই। বড়জোর

র‍্যাণ্ডম কোডিং। ঘুরে বেড়াচ্ছে দুনিয়া জুড়ে। ঠিক ধরনের কোষ পেলেই অনড় পাথরের মত চেপে বসে তার ভেতর।'

'তার মানে, ওই বীজের সেই ভাইরাস আজও থাকতে পারে, যদিও এখন নেই সেই গাছ বা ফল,' বলল এলেনা।

মৃদু মাথা দোলাল মোনা। 'একবার ওটা পেলে ডিএনএ নিয়ে ক্লোন করব। খুব সহজ জিনিস ভাইরাস। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর ক্লোন করতে পারব জীবন-বৃক্ষের ফল বা বীজ। আর লাগবে না ওই গাছ। ভেবেও রেখেছি, কী ধরনের সিরাম তৈরি করব।'

রানাকে ভালবাসে বলে এই মেয়েকে হিংসে হচ্ছে, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করল এলেনা: যা-তা কথা নয়, এ এমন কাজ জানে, যেটা বেশিরভাগ মানুষ পারবে না।

'বেশ কয়েক বছর ধরেই ফসিলাইয্‌ড্ গাছ বা জন্তু থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করছি আমরা। সঠিকভাবে কাদার ভেতর বীজ থাকলে ধরে নেয়া যায়, ওটা অক্ষতই আছে,' বলল মোনা।

'তার মানে কাদা ঘেঁটে বীজ খুঁজতে হবে?' বলল গ্রাহাম।

মোনা জবাব দেবার আগেই এলেনার মিলিটারি গ্রেড স্ক্যানারে ভেসে এল দু'জনের কথা। ভাষাটা ফার্সি।

রানা ছাড়া অন্য সবাই হয়ে গেল আড়ষ্ট, ভাবল, এবার যখন-তখন ধরা পড়বে ইরানিয়ান আর্মির হাতে। বিপদ হবে হেলিকপ্টার এলে। অনেক দূর থেকেই দেখবে, হাজির হবে এয়ারবোটের আকাশে।

এজন্যেই আনা হয়েছে স্ক্যানার। শোনা হবে রেঞ্জের ভেতরের সব এয়ার ইউনিটের কথা।

এতই অস্পষ্ট, বক্তব্য বুঝল না রানা।

ওখানে উড়ছে হেলিকপ্টার।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বামে দেখাল ও। 'ঠিক আছে, বিপদ হবে না। দূরের এয়ারলাইন ট্রাফিক।'

রানার আঙুল লক্ষ করে দূরে দেখল এলেনা। ক'মাইল দূরে অন্তত বিশ হাজার ফুট ওপরে টিপটিপ করছে এয়ারলাইনারের লাল বাতি। নীরবে আকাশ চিরে চলেছে দক্ষিণ-পুবে।

দ্বিতীয় ডিভাইস দেখছে রানা। রেইডার ওয়ার্নিং রিসিভার বা আরডাব্লিউআর-এর পর্দা একদম সবুজ। আশপাশে কেউ নেই।

এলেনার দিকে ফিরল মোনা। 'রানা থাকলে কেমন একটা নিরাপত্তার ভাব তৈরি হয় মনে, তা-ই না?'

সর্বনাশ! ভাবল এলেনা। ওর মন থেকে মুছে গেল মোনার জন্যে তৈরি শ্রদ্ধাবোধ। বিড়বিড় করল, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে!'

আরও কিছুক্ষণ পর অদ্ভুত দৃশ্য দেখল ওরা। দূরে পানির দিকে ঝুঁকে এসেছে কুয়োনসেট কুঁড়ে। জলাভূমির মাঝে একটা দ্বীপে। কিন্তু আরও কাছে যাওয়ার পর বোঝা গেল, ওই কুঁড়ে আসলে নলখাগড়া দিয়ে তৈরি।

ব্রিফিঙের সময় এসব কুঁড়ের কথা আগেই বলেছে এলেনা। বেদুঈনদের মতই, কিন্তু মরুভূমির বালিতে না থেকে এসব আস্তানা তৈরি করে বাস করত জলাভূমির আরবরা। আজকাল তাদেরকে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

'মুধিফ,' বলল রানা, 'একসময় এখানে জড় হয়ে আলাপ বা আলোচনা করত সবাই।'

'এদের কী হয়েছে যে এখন আর আসে না?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

'এরা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আবারও এসে লুকিয়ে পড়ত জলায়,' বলল রানা, 'কিন্তু জলাভূমির বেশিরভাগ এলাকা শুকিয়ে ফেলল মার্কিন মদদপুষ্ট ইরাকি সরকার। নদীর এদিকের সব খাল বন্ধ করে দেয়ায় চারপাশ হয়ে গেল মরুভূমি। এরপর আর কোথাও লুকাবার জায়গা থাকল না তাদের।'

মুধিফের দিকে তাকাল ওরা।

এইমাত্র ওটাকে পাশ কাটিয়ে এল।

মাটির দ্বীপ নয়, জলার ভেতর কাদা ও ঘাসে তৈরি মানুষের বাড়ি বা দ্বীপ। প্রচণ্ড পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করেছিল অনেকে মিলে। আকারে বড় একটা বাসের সমান। নলখাগড়া দিয়ে বুনন করা। তবে অযত্নে খসে আসছে সব। পরিত্যক্ত, কেউ আসে না এখানে।

'আজ থেকে এক শ' বছর আগে এখানে বাস করত কমপক্ষে একলাখ আরব,' বলল রানা, 'এখন আছে সবমিলে এক হাজার। ছড়িয়ে পড়েছে জলাভূমির চারপাশে।'

'আহা রে,' কেন যেন দুঃখ লাগছে গ্রাহামের।

'আসলে যুদ্ধ শেষ করে দেয় সব,' বলল রানা।

সায় দিল এলেনা, 'প্রফেসর বার্ডম্যান বলেছেন, এরা ছিল সুমেরিয়ানদের বংশধর। আজ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে তাদের সভ্যতা ছিল "আর" ও "আরাক" শহরে। তাদের ভাষা অনুযায়ী এই এলাকা খোলা প্রান্তর বা ইডিন।

'ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে: একটি বাগানে ছিল জীবন রক্ষা করে এমন এক গাছ। আবার ওই একই কাহিনি আছে অন্যান্য সভ্যতার সাহিত্যে। এসব ফল খেলে মরতে হতো না কাউকে। ইরাকে আর মিশরে ছিল এমন বেশ কয়েকটা বাগান। ওই ফল খেতেন বলে কয়েকজন ফেরাউন বেঁচে ছিলেন নব্বুই বছরেরও বেশি। অথচ, সে সময়ে মানুষের গড় আয়ু ছিল বড়জোর সাতাশ বছর। গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল, রা-র মরূদ্যানে আছে অদ্ভুত এক ফলের গাছ, ওটার ফল খেলে অমর হওয়া যেত। ওই গাছ ফেরাউনকে উপহার দিয়েছিলেন সুমার রাজা।

'ওটা ছিল তেঁতুল গাছ বা টক ধরনের ফলের গাছ। ওই জিনিস খুঁজতে গিয়েই নাকি প্রায় পুরো পৃথিবী ঢুঁড়ে ফেলেছিলেন সম্রাট আলেকযাণ্ডার। ব্যর্থ হলেন বলেই মাত্র তিরিশ বছর বয়সে

মরতে হলো তাঁকে। ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করতে গিয়ে একটা খালে ডুব দেন সুমেরিয়ান দেবতা-রাজা গিলগামেশ। অগভীর পানিতে পান অমৃত। কিন্তু কোথা থেকে এসে ওটা চুরি করে নিয়ে গেল এক সরীসৃপ।'

তিনঘণ্টায় জলাভূমি পেরিয়ে গেল ওরা। কাদার তীরে থামল ওদের এয়ারবোট।

রানা ও গ্রাহাম মিলে তীরে তুলল দুটো এটিভি (অল টেরেইন ভেহিকেল)। ওই একই সময়ে দরকারি ইকুইপমেণ্ট জড় করল এলেনা। সেগুলোর ভেতর রয়েছে প্রফেসর বার্ডম্যানের দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রোগ্রাম করা দুটো জিপিএস রিসিভার। এ ছাড়া, দুটো নাইট ভিশন গগল্স্, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট, গ্লাভ্স্, অস্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেকের জন্যে আনা হয়েছে একটা করে পিস্তল। এ ছাড়া, রানা ও এলেনা সঙ্গে নেবে রাইফেল।

এলেনা বেরেটা পিস্তল দিতে যাওয়ায় মোনা বলল, 'লাগবে না। আমার সঙ্গে আছে।'

কথাটা শুনে অবাক হলো না কেউ। কয়েক বছর ধরে বিপদে আছে মেয়েটা। নিজের সঙ্গে অস্ত্র না রাখাই অস্বাভাবিক। লকারে বেরেটা রেখে দিল এলেনা। ঘুরে দেখল গ্রাহামকে। সে আবার উঠে পড়েছে এয়ারবোটে।

'আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?'

'না, ওস্তাদের মানা আছে।' মাথা নাড়ল গ্রাহাম। 'এখানেই বসে থাকব। কেউ বোট চুরি করতে এলে তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।'

রানার হাতে দ্বিতীয় নাইট ভিশন গগল্স্ দিল এলেনা। একটু লজ্জিত সুরে বলল, 'সরি, রানা, তোমার বান্ধবীর জন্যে নেই।'

'অসুবিধে নেই,' বলল মোনা।

'রানার পেছনের সিটে বসবে,' বলল এলেনা।

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরল ওরা। এটিভিতে উঠে চালু করল ইঞ্জিন। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে দেখা গেল আবছা সবুজ আলো। প্রায় কোনও আওয়াজ তুলছে না চার হুইলের ইলেকট্রিক গাড়ি।

'হেডলাইট অফ রাখবে,' এলেনাকে বলল রানা। 'নক্ষত্রের আলোই যথেষ্ট।' পেছনের সিটে বসেছে মোনা।

রানার এটিভির পিছু নিয়ে রওনা হলো এলেনা।

আঁধার চিরে নীরবে ছুটে চলেছে গাড়ি। মরুভূমির কোনও আওয়াজ নেই। তবে খুব খেয়াল করলে শোনা যাচ্ছে ইলেকট্রিক কিরকির শব্দ। কখনও কখনও চাকা ও ঝিরঝিরে হাওয়ার কারণে আওয়াজ হচ্ছে। যে কারও মনে হবে, রাতের আঁধারে উড়ে চলেছে কোথায় যেন।

সামনে চোখ রেখেছে রানা, একটু পর পর দেখছে জিপিএস। একবার সামান্য বদলে নিল কোর্স, তারপর আবারও বাড়াল গতি। পনেরো মিনিট পর পেছনে পড়ল কাদাটে জমি। শুরু হলো বালির উঁচু-নিচু সব ঢিবি, যেন মস্ত কোনও সাগরের ঢেউ।

বালির মেঝে পাওয়ার পর মসৃণ পথে চলল ওরা, অবশ্য একটু কমে গেল স্পিড।

একের পর এক ঢিবি পেরোবার পর এল চওড়া বিস্তৃত জমিন। শুকিয়ে যাওয়া নদীর বুক চিরে চলেছে ওরা। একসময় এদিকে ছিল বেশ কয়েকটা খাল। আরও এক মাইল যাওয়ার পর একটা খাদের ভেতর থেকে উঠে এল রানা। জিপিএস অনুযায়ী যেতে হবে তিন মাইল দূরে।

এটিভির ওয়ার্নিং রিসিভার জানিয়ে চলেছে আশপাশে কেউ নেই। মনে মনে বলল রানা, 'আপাতত সব ঠিক আছে।' গাড়ির গতি আরও বাড়াল। সামনে থাকবে দ্বীপের মত এক জায়গা।

আরও কিছুক্ষণ পর বামে শুকিয়ে যাওয়া এক গাছ দেখল। নদীখাতের দেয়াল বালির, কখনও তাতে মিশে আছে পাথরকুচি।

মাঝে মাঝে বড়সব পাথর খণ্ড। সেজন্যই বোঝা গেল, একসময় এদিকে ছিল খাল, দু'পাড়ে পাথুরে দেয়াল।

বামের দেয়ালের পাশ দিয়ে গিয়ে আবারও বাঁক নিল রানা, তারপর হঠাৎ করেই পৌঁছে গেল গন্তব্যে।

চৌত্রিশ

একটু পিছিয়ে পড়েছে এলেনা, কিছুক্ষণ পর হাজারো নক্ষত্র ভরা রাতে সামনের গাড়ির পেছনে থামল ও। পাঁচতলা গভীর, খাড়া এক খাদের পাড়ে মোনা ও রানা। জায়গাটা খোলা খনির মুখের মত। অন্তত আধ মাইল দূরে ওদিকের দেয়াল। নিচে বালির মেঝে উঠে গেছে চার দেয়ালের দিকে। মাঝের অংশের উচ্চতা মরুভূমি সমতলের মতই, আকারে অন্তত বারোটা ফুটবল মাঠের সমান।

'এসো,' এলেনাকে ডাকল রানা।

এটিভি থেকে নেমে মোনা ও রানার পাশে দাঁড়াল এলেনা।

প্রাচীন দ্বীপের এদিকে পাথুরে বাড়ি দেখছে ওরা। বহু আগেই ধসে গেছে ছাত। গাড়ি থেকে নেমে নাইট ভিশন গগল্‌স্ খুলে ফেলেছিল এলেনা, রানার মতই আবারও পরে নিল।

'সত্যিই ওটা সেই দ্বীপ?' আনমনে বলল মোনা।

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল এলেনা। 'চারপাশে খাদ, মাঝে দ্বীপ। বলতে পারো এক ধরনের দুর্গ।'

'আমরা দেখছি হাভিলা, বালির প্রান্তর,' বলল মোনা, 'পিশন

নদীর মাঝে সে এলাকা, শেষ বাগান, যেখানে ছিল জীবন-বৃক্ষ।'

'কিন্তু সবুজের ছোঁয়া নেই।' চারপাশ দেখছে রানা। বড় রুক্ষ, পরিত্যক্ত এলাকা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। মাথার ওপরের আকাশে জ্বলজ্বল করছে কোটি তারা।

'অবাক লাগছে, এই এলাকা পেলেন না কেন আবু রশিদ?' বলল মোনা। 'শুনেছি, বহু বছর ধরে খুঁজেছেন।'

'পাননি, কারণ এদিকটা শুকিয়ে ফেলেছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন,' বলল এলেনা, 'আগে পানির নিচে ছিল, জলাভূমির অংশ। তখন এখানে চলছিল ইরাক-ইরানের যুদ্ধ।'

স্কার্টের পকেট থেকে কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল মোনা। কাগজে আঁকা এক সবুজ এলাকা। চারপাশে পানি, দূরে দেয়াল।

'সুমেরিয়ান বর্ণনা অনুযায়ী,' বলল মোনা, 'এখানেই ছিল জীবন-বৃক্ষ।'

বাঁকাভাবে কাগজ ধরেছে, কিন্তু সামনের ওই দ্বীপের সঙ্গে অনেক কিছুই মিলছে, ভাবল রানা। জানতে চাইল, 'এবার?'

'নিচে নেমে দ্বীপে গিয়ে উঠব,' বলল মোনা, 'সত্যি বীজ রয়ে গিয়ে থাকলে, ওসব থাকবে সবচেয়ে বড় দালানের ভেতর।'

রানার এটিভির হ্যাণ্ডেলে দড়ি বেঁধে সেটা ধরে নেমে গেল ওরা খাদের নিচে। কূপের মত জায়গাটা পেরিয়ে উঠতে লাগল দ্বীপের দিকে। কিন্তু যত সহজ মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কঠিন ওপরে ওঠা। প্রথম ধাপে উঠতে গিয়েই হাঁফ ধরে গেল ওদের। বালি-মাটিতে অসংখ্য পাথরের চাপড়া। হাজার হাজার বছর পানির ঘষায় মসৃণ। পিছলে যেতে যায় পা।

দ্বীপের প্রথম ধাপে উঠে সামনে দশ ফুট উঁচু প্রাচীর পেল। জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে পাথর। সাবধানে পা ফেলে দ্বীপে উঠল রানা, মোনা ও এলেনা।

মোনার ভাব দেখে মনে হলো, জানে ঠিক কোথায় কী

খুঁজবে। সবচেয়ে বড় দালানের দিকে চলল। পিছু নিল অন্য দু'জন।

'সেই সুমেরিয়ান আমল থেকে এখানে বাস করেছে মানুষ,' বলল মোনা। 'একদল স্কলার মনে করেন, এরা ছিল এলামাইট। তবে জানা যায়নি নিজেদেরকে কী নামে ডাকত তারা।'

চারপাশে নজর রেখেছে রানা।

আপাতত বিপদের কোনও সম্ভাবনা দেখছে না।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওরা পৌঁছল ভাঙা, বড় এক দালানের সামনে। ধসে পড়েছে এদিকের দেয়াল। একবার কাগজ দেখে নিয়ে পাথরের স্তূপ টপকে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল মোনা, পেছনে রানা ও এলেনা। পরের ঘরে পাওয়া গেল নিচে যাওয়ার সিঁড়ি।

'ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিই?' রানার কাছে জানতে চাইল মোনা।

এতক্ষণ নক্ষত্রের আলোয় চলেছে ওরা। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জ্বালতে পারো। কিন্তু ফ্ল্যাশলাইটের সামনের দিক ঘিরে রেখো, চারপাশে যেন আলো না যায়।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিচে ফেলল মোনা। ওর পিছু নিল রানা ও এলেনা।

সিঁড়ি শেষ হওয়ার পর সামনে পড়ল ছোট এক ফাঁকা ঘর। একসময় হয়তো গুদাম ছিল। মেঝে ভরে আছে বালিতে। পাশের দেয়ালে হাত রেখে কী যেন খুঁজছে মোনা।

'কী খুঁজছ?' জানতে চাইল এলেনা।

'দেয়ালে আলগা পাথরের মত ইঁট। সুমেরিয়ান কিংবদন্তী অনুযায়ী, জীবন-বৃক্ষের দুই ধরনের ফল ছিল। একটা বিচি ছাড়া, অন্যটা পাওয়া যেত খুব কম। যেটার ভেতর থাকত বিচি বা বীজ, এতই দামি ছিল, সরিয়ে ফেলে মোম দিয়ে মুড়িয়ে সোনার বলের ভেতর রাখত। জিনিসটা ঠাঁই পেত কাদামাটির ইঁটের ভেতর। স্বল্প তাপ দিয়ে শক্ত করে ফেলা হতো সেসব ট্যাবলেট। বুকে এঁকে

দেয়া হতো নির্দিষ্ট চিহ্ন।'

'তার মানে, কাদার ভেতর ছিল না,' বলল এলেনা।

'শক্ত কাদার ভেতর,' বলল মোনা। 'দেখলে মনে হবে ইঁট।'

'এরকম?' জানতে চাইল রানা।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল মোনা ও এলেনা। ছোরার ডগা দিয়ে পাথরের মাঝ থেকে বের করে এনেছে রানা পাতলা এক ইঁট। ওটার ওপর আলো ফেলল মোনা। ওই ট্যাবলেট দেখতে অনেকটা পাথরের মতই লাগল।

'এদিকে আগুন ধরেছিল,' মন্তব্য করল এলেনা। 'এত বেশি তাপ, পুড়ে গেছে দেয়াল।' পাথর চেঁছে নিয়ে রাখল ছোট এক প্লাস্টিকের ব্যাগে। রানা কৌতূহলী দেখে ব্যাখ্যা দিল, 'প্রফেসর বার্ডম্যান স্যাম্পল চেয়েছেন। কার্বন ডেট বের করবেন।'

'আরও কিছু বলেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'তামার লিপির ছবি অনুযায়ী, এ বাগান ঠিক রাখতে সবসময় দু'জন থাকত,' বলল এলেনা। 'তাদেরকে সবই দিতেন রাজা, কিন্তু নিষেধ ছিল, কখনও এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না তারা। বীজশূন্য ফল খাবে, তাতেই বাঁচবে বহুকাল। জন্মও তাদের এখানেই। বাগানের মালিরা জানত না বাইরের দুনিয়ায় কী হচ্ছে। বলে দেয়া ছিল, এটাই আসলে পুরো পৃথিবী, এর বাইরে কিছুই নেই। মৃত্যুও তাদের এখানেই। ভাল খাবার, পানীয় ও অন্যান্য সবকিছুই পেত। কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। রাজা এটা করতেন, যাতে কেউ জানতে না পারে এখানে আছে জীবন-বৃক্ষ।'

'আর্কিওলজিস্ট আবু রশিদ বাবাকে বলেছিলেন, তিনি পেয়েছিলেন মরুভূমিতে হাজার হাজার বছর আগের এক কবর,' বলল মোনা। 'ওটার ভেতর ছিল তামার ওই লিপি। যাই হোক, ওই লোক এখান থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল শত শত মাইল

দূরে।'

'লিপিতে লেখা আছে, রাজার এক প্রহরী চালাকি করে বাগান থেকে বের করে আনে দুই মালির একজনকে,' বলল এলেনা। 'চোখ খুলে যায় মালির। বুঝে ফেলে, ওই বাগান আসলে পুরো পৃথিবী নয়। অনেক দূরে চলে যায় সে। অনেক কিছু জানতে পারে। উপায় ছিল না যে আবার ফিরবে ওই বাগানে বা এই রাজ্যে। দেখলেই তাকে খুন করত রাজার প্রহরীরা। নইলে জানাজানি হবে বাগানের কথা।' কাঁধ ঝাঁকাল এলেনা। 'ওই লিপি অনুযায়ী, আবারও ফিরেছিল লোকটা। কিন্তু এসে দেখল, দাউ-দাউ আগুনে পুড়ছে গোটা বাগান। আসলে লড়াই বেধে গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক লোকটার সঙ্গে রাজার।' পাথরের পোড়া দেয়াল থেকে আরও ধুলো ও পাথরকুচি সংগ্রহ করে ব্যাগে রাখল ও। 'প্রফেসর বার্ডম্যান পোড়া কাঠের টুকরো জোগাড় করতে বলেছেন। কিন্তু এদিকে কড়িবরগা নেই। পাথর ও কাদা দিয়ে তৈরি দেয়াল, টিকে আছে এত বছর ধরে।'

'আসলে ওজনের কারণে পাথরের দেয়াল একই জায়গায় রয়ে গেছে,' বলল রানা, 'সিমেণ্ট বা চুন ব্যবহার করেনি। এই একই কারণে এত বছর পরেও আমরা দেখি পিরামিড।'

এলেনার হাতের পোড়া কাদা দেখছে মোনা। বিরক্ত হয়ে হাত থেকে ফেলে দিল রানার কাছ থেকে পাওয়া ইঁট। ওই জিনিস খুঁজছে না ও। সরে গেল আরেক দিকে, নতুন করে দেখতে লাগল দেয়াল। ওপাশের মেঝেতে বেশ কিছু ইঁট। সেসবের ভেতর ভারী, পোড়া একটা ইঁট সরিয়ে নিল মোনা। মেঝের দিকে ঝুঁকে দেখল।

ভারী, পোড়া ইঁট সরিয়ে ফেলার পর দেখা দিয়েছে আরেকটা ত্রিকোণ ইঁট। দেখতে অনেকটা জুতোর বাক্সের মত। মোনার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ইঁটের ওপর কয়েক রকমের চিহ্ন দেখল

রানা।

মেঝে খুঁচিয়ে ওই ইঁট তুলে আনতে চাইল মোনা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল। হতাশ হয়েছে। 'এটা ওই জিনিস নয়।'

'জানবে কী করে আসল জিনিস কোন্‌টা?' বলল রানা, 'পড়তে পারবে?'

'না, কিন্তু কয়েকটা চিহ্ন থাকবে।'

'চিহ্নগুলো কী?' জানতে চাইল রানা।

'এই জিনিস খুঁজছে মোনা,' ঘরের আরেক দিক থেকে বলল এলেনা।

ঘুরে ওকে দেখল রানা ও মোনা।

চ্যাপটা, ত্রিকোণ ইঁট দেখাল এলেনা। পাথরের দেয়াল থেকে টেনে বের করেছে ওটা। মাঝের বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে কমপাসের কাঁটার মত চারটে মোটা দাগ। বর্গের ভেতর ছোট আয়তক্ষেত্র। আবার ওটার ভেতর আরও ছোট একটা বৃত্ত।

এলেনার কাছে পৌঁছে গেছে মোনা ও রানা।

মাথা ঝাঁকাল মোনা। 'হ্যাঁ, এটাই খুঁজছিলাম।'

ওর দু'হাতে ত্রিকোণ, ভারী ইঁট ধরিয়ে দিল এলেনা। রানাকে বলল, 'প্রফেসর বার্ডম্যান তামার লিপি পড়ার সময় প্রতিটা কলাম শেষ হওয়ার পর একটা করে সিম্বল পেয়েছেন, ওগুলো ওই তিন ভাষায় একই রকম।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'প্রথম বর্গ এই দ্বীপ। তার বুকে আয়তক্ষেত্র এই দালান। ভেতরের বৃত্ত ওই বীজ। বৃত্ত থেকে বের হয়ে চারদিকে যাওয়া কমপাসের কাঁটার মত ওসব কী?'

'চারটে নদী,' বলল এলেনা, 'বা বলা উচিত চারটে খাল। নিয়ন্ত্রণ করত পানির উচ্চতা ও তাপমাত্রা। প্রফেসরের কথায় আর গিলগামেশের গল্পে আছে, জীবন-বৃক্ষের ফল ধরত মাটিতে নয়,

অগভীর পানির ভেতর। ...পরে সুযোগ পেলে এখান থেকে একবার ঘুরে যাবেন প্রফেসর।'

'পোড়া পাথরের কুচি জোগাড় করছ করো, কিন্তু আমার মনে হয় না এই দালানে আগুন ধরেছিল প্রাচীন আমলে,' বলল রানা, 'ওই কাজ বেদুঈনদের। কে জানে, হয়তো ছয়মাস আগে আগুনে পুড়েছে চারপাশ।'

মোনার পাশে থামল রানা। 'তুমি শিয়োর তো, ভেতরে বীজ আছে?'

'ওপরে তো সিম্বল দেখছি,' বলল মোনা। স্বস্তির হাসি মুখে।

তখনই রানা ও এলেনার কোমরের বেল্ট থেকে এল কর্কশ স্ট্যাটিক। স্ক্যানারে স্থির হলো রানার চোখ। সবুজ আলো বাড়ছে আবার কমছে। সিগনাল ধরছে যন্ত্রটা। এক সেকেণ্ড পর আবারও এল স্ট্যাটিক, তারপর কথা বলে উঠল কে যেন। এতই দুর্বল সিগনাল, পরিষ্কার বোঝা গেল না কিছুই।

'এলেনা, মোনা, এক্ষুণি ওপরে যেতে হবে!' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রানা। 'সময় নেই, কাছে চলে আসছে কারা যেন!'

পঁয়ত্রিশ

'এক মিনিট!' পেছন থেকে রানাকে ডাকল মোনা, 'এত ভারী ট্যাবলেট নিয়ে ওদিকের পাড়ে উঠতে পারব না! এটার ওজন কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউণ্ড!'

রানা ঘুরে দেখল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মেয়েটা। তুলে

নিয়েছে চোখা একটা পাথর, মেঝেতে রাখা মাটির ট্যাবলেটের ওপর গায়ের জোরে নামিয়ে আনল ওটা।

ওর পাশে পৌঁছে মোনার হাত থেকে পাথরটা নিল রানা, ওটা দিয়ে ঘাই দিল মাটির নিরেট ট্যাবলেটের বুকে।

ওদিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে এলেনা। ওখান থেকে বলল, 'দক্ষিণ দিগন্তে আলো। চাঁদ নয়। ওটা উঠতে এখনও কমপক্ষে এক ঘণ্টা বাকি।'

আবারও ট্যাবলেটের ওপর চোখা পাথর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আর কিছু দেখলে, এলেনা?'

'হ্যাঁ, দক্ষিণে হেডলাইট। কয়েকটা গাড়ি। মেঘের মত ধুলোবালি তুলছে। বড়জোর কয়েক মাইল দূরে।'

আবারও ট্র্যান্সমিট হলো। এবার ইংরেজি ভাষায়।

'আমাদেরকে খুঁজে পেল কী করে?' অবাক হয়ে বলল মোনা। 'জানল কী করে আমরা এখানে?'

'ওদের কাছে আছে আসল তাম্রলিপি,' ওপর থেকে বলল এলেনা, 'তা ছাড়া, সঙ্গে আছে আবু রশিদ।'

পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ওই লোককে। বেঁচে আছে না খুন হয়ে গেছে, কেউ জানে না।

সম্ভাবনা বেশি, জরুরি কোনও কারণে তাকে আটকে রেখেছে কাল্টের লোক, ভাবল রানা। এখন যারা আসছে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তবুও ইরানিয়ান আর্মির হামলার চেয়ে ভাল।

ওরা পেয়ে গেছে যা খুঁজতে এসেছিল, এবার দ্বীপ থেকে বেরিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে জলায় পৌঁছে গেলেই বাঁচোয়া।

'ওদের এখানে পৌঁছুতে ক'মিনিট লাগবে, এলেনা?' জানতে চাইল রানা। পাথরটা নামিয়ে আনল মাটির ট্যাবলেটের মাঝে।

'বড়জোর পাঁচ মিনিট,' জবাব দিল এলেনা। 'মনে হয় না জানে আমরা এখানে। নইলে হেডলাইট জ্বেলে আসত না।'

'ঠিক,' মাটির ট্যাবলেটের ওপর আরেক ঘাই বসাল রানা। 'আর এক মিনিট পর উঠে আসছি আমরা।'

প্রায় দৌড়ে নেমে এল এলেনা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলেছে মোনা ট্যাবলেটের ওপর। ওটা এত নিরেট যে পাথরের আঘাতেও ভাঙছে না। দু'হাতে ট্যাবলেট তুলে উঠে দাঁড়াল রানা, পরক্ষণে গায়ের জোরে আছাড় মারল মেঝের ওপর। ঠুং শব্দে তিনটে টুকরো হলো মাটির ত্রিকোণ, পুরু চাপড়া। এ ছাড়া, ছোট ছোট কয়েকটা ঢেলাও আছে।

ঝুঁকে মেঝে দেখছে মোনা। যেন ভাবছে, মাটির ঢেলা থেকে বেরিয়ে আসবে সোনার বল। কিন্তু তেমন কিছুই নেই। কোথাও নেই বিচি বা বীজ। মাটির একটা টুকরো তুলে নিল মোনা।

দক্ষিণ থেকে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

'পরে দেখো, এখন সবই নিয়ে যাব আমরা,' তাড়া দিল রানা।

ওদের পাশে হাত লাগাল এলেনা। মাঝারি এক টুকরো ঢেলা তুলে রাখল প্রফেসরের জন্যে রাখা স্যাম্পলের ভেতর। আটকে দিল প্লাস্টিকের ব্যাগের যিপার। দ্বিতীয় টুকরো মোনার হাতে, মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছে। তৃতীয় বড় টুকরো নিয়ে বলল রানা, 'চলো, এবার বেরিয়ে যেতে হবে!'

সবার আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল মোনা। মাঝে থাকল এলেনা। শেষে রানা। মাত্র পনেরো সেকেণ্ডে দালান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। ছুটে পৌঁছে গেল দ্বীপের কিনারায়। এখন আর সাবধান হওয়ার সময় নেই, প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল কূপের মত জায়গায়। বালির মেঝেতে নেমে চলল উঁচু দেয়ালের দিকে। এবার দড়ি বেয়ে উঠে যেতে হবে মরুভূমির মেঝেতে।

পরিষ্কার শুনল ভারী সব ইঞ্জিনের আওয়াজ। তার ভেতর রয়েছে অদ্ভুত এক গর্জন। ওটা কী, বুঝল না রানা। মাত্র এক

মিনিটে দড়ি বেয়ে পাড়ের কাছে পৌঁছুল এলেনা। নিচে থেকে শক্ত করে দড়ি ধরেছে রানা। মোনাকে বলল, 'এবার তুমি ওঠো!'

কথা না বলে দড়ি ধরল মোনা, উঠে যেতে লাগল মরুভূমির মেঝের দিকে। তবে গতি ওর কম। মাথা ভারী হয়ে আছে নানান চিন্তায়। দড়ি ধরে উঠতে গিয়ে ভীষণ জ্বলছে দু'হাত।

মোনা প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে যেতেই উঠতে লাগল রানা। চল্লিশ সেকেণ্ড পর শুয়ে পড়ল মরুভূমির মেঝেতে। এলেনার নির্দেশে এটিভি থেকে একটু দূরে শুয়ে আছে মোনা। চুপচাপ অপেক্ষা করল ওরা তিনজন।

খাদের দিকে আসছে শত্রুদের গাড়ি।

এবার রানা বুঝল, কেন অদ্ভুত গর্জন শুনেছিল। এসব গাড়ি স্যাণ্ড রেল বা ডিউন বাগি। কিন্তু সাইলেন্সার নেই। সবমিলে চারটে গাড়ি ও অন্য ধরনের একটা যান। ওটাকে হামভি মনে হলো ওর।

পাঁচটা গাড়ি থেমে যাওয়ার পর ওগুলো থেকে নামল কমপক্ষে আটজন লোক, প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র ও ফ্ল্যাশলাইট। খাদের পাড়ে থেমে কূপের মত জায়গাটা দেখল তারা। হামভি থেকে একজনকে নামতে দেখল রানা। কিন্তু ওখান থেকে নড়ল না লোকটা।

দূর থেকে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

কোনও শৃঙ্খলা বজায় রাখছে না তার লোক। চলছে হৈ-চৈ। কয়েকটা ফার্সি শব্দ শুনল রানা, তারপর শুনল ইংরেজি।

'স্থানীয়দের নেয়া হয়েছে দলে,' নিচু স্বরে এলেনাকে বলল রানা। 'এদেরকে ভাড়া করেছে, কাজ শেষ হলেই ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে। কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

রেডিয়ো হাতে হামভির লোকটাকে আরও মন দিয়ে দেখল রানা। বুঝে গেল, সম্ভবত হামভির ভেতরে আরও কেউ আছে। সে কাল্টের বড় কোনও নেতা। তার নির্দেশ অনুযায়ী এলেনা বা

ওকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে খুন করা হবে।

'কী করবে ভাবছ, রানা?' জানতে চাইল এলেনা।

একবার স্যাণ্ড রেলের দিকে তাকাল রানা। ওগুলো খুব জোরে চলে, দৌড়ে পারবে না এটিভি। নিজেদের ফোর হুইল ড্রাইভ দেখল রানা। 'এলেনা, এবার তোমার পেছনে চাপবে মোনা।'

দ্বিধা নিয়ে ওকে দেখল মোনা, কিন্তু কোনও প্রশ্ন তুলল না।

ভেবে দেখেছে রানা, ওর চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ পাউণ্ড কম ওজন এলেনার। তা ছাড়া, ওর কাছে রয়েছে মাটির ট্যাবলেটের সবচেয়ে বড় অংশ। ওটা অনেক বেশি ভারী। মোনাকে নিয়ে এলেনার রওনা হওয়াই ভাল। পেছন থেকে কাভার দেবে ও।

ওর এটিভির পাশের স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে নিল রানা। একবার দেখল কূপের মত জায়গাটা। দ্বীপে উঠবে বলে ওখানে নেমে পড়েছে বেশ কয়েকজন।

রানার দেখাদেখি রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল এলেনা, ঘুরিয়ে নিল এটিভি। ও সিটে বসতেই মরুভূমির মেঝে থেকে উঠল মোনা।

'তোমরা রওনা হও,' তাগাদা দিল রানা।

চোখে রাগ নিয়ে হামভির দিকে চেয়ে আছে মোনা। নিচু স্বরে বলল, 'এরাই খুন করেছে আমার বাবাকে।'

'হতে পারে,' বলল রানা, 'এ কারণেই এদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত তোমার।'

এটিভির দিকে এগোতে গিয়ে পা পিছলে গেল মোনার। পড়েই যেত, সামলে নিল শেষসময়ে। কিন্তু ওর পায়ের ধাক্কা লেগে খাদ থেকে নিচের কূপের দিকে নামল বালি ও ছোট পাথরের স্তূপ। পড়ার সময় বাড়ি খেয়ে আওয়াজ তুলল নুড়ি পাথর। নিচের বালিতে পড়ল ধুপধাপ শব্দে।

নীরব রাতে ওই আওয়াজ গোলা বর্ষণের মতই।

রানাদের দিকে ঘুরে গেল কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা।

দূর থেকে এল চিৎকার। শত্রুকে দেখে ফেলেছে লোকগুলো।

এটিভির পেছনের সিটে চেপে বসল মোনা। এক সেকেণ্ড পর প্রায় পিছলে রওনা হলো ওরা। পেছনে রয়ে গেল একাকী রানা।

তীর বেয়ে শুকনো নদীর বুকে নামল এলেনা। পেছনে শুনল গুলির আওয়াজ।

রানা!

শত্রুপক্ষকে আটকে রাখবে বলে গুলি করছে। হয়তো ঠেকাতে পারবে মাত্র কয়েক মিনিট। একবার মরুভূমির পাড়ে উঠে এলেই উল্টো রানাকে কোণঠাসা করবে লোকগুলো। ভাল কোনও আড়াল পাবে না রানা। ওদেরকে এগোবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে নিজের জীবনের মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে মানুষটা।

ঝড়ের গতি তুলে এটিভি নিয়ে জলার দিকে ফিরছে এলেনা। ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে মোনা। বিদ্যুদ্বেগে পিছনে পড়ছে নদীর মেঝে। পরের বাঁক পেরিয়ে এল ওরা। চট্ করে জিপিএস রিসিভার দেখল এলেনা। আধ মাইল এগিয়ে পশ্চিমে যাবে ওরা। সারি সারি বালির ঢিবি পেরোলে পৌঁছে যাবে এয়ারবোটের কাছে।

বুক কাঁপছে এলেনার। ভাবছে, শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে ফিরতে পারবে তো রানা?

এলেনা ও মোনা রওনা হতেই শত্রুপক্ষ লক্ষ্য করে আর্মালাইটের এক পশলা গুলি পাঠাল রানা। দেখল, পড়ে গেছে এক লোক, কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর উঠে সরে গেল। কয়েক লাফে আশপাশের বড় পাথরের আড়াল নিয়েছে অন্যরা।

এবার স্যাণ্ড রেল লক্ষ্য করে আরেক পশলা গুলি পাঠাল রানা। ভেহিকেলের গা থেকে ছিটকে উঠল আগুনের ফুলকি। কিন্তু গাড়িগুলোর ক্ষতি করতে পারার আগেই চারপাশের বালিতে এসে বিঁধল অন্তত পঞ্চাশটা বুলেট। কানের পাশ দিয়ে গেল কয়েকটা গুলি।

এটিভির আড়ালে সরল রানা, স্ক্যাবার্ডে রাখল রাইফেল। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে ইঞ্জিন চালু করেই ঘুরিয়ে নিল এটিভি, তীরের মত ছুটল সামনের নদীর খাদ লক্ষ্য করে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে অনেক পেছনে ফেলল শত্রুপক্ষকে। নেমে এল নদীর খাদে। তখনই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। ওর মাথায় হেলমেট নেই। চোখেও নেই গগল্‌স্‌। ওগুলো ঝুলছে পেছনের সিটের লক থেকে।

তুমুল বেগে বাতাস লাগছে চোখে-মুখে, কিন্তু সময় নেই যে থেমে হেলমেট ও গগল্‌স্‌ সংগ্রহ করবে। তারার মরা আলোয় এগিয়ে যেতে হবে ওকে। সামনে ধূসর বালির প্রান্তর ও দূরে উঁচু সব ঢিবি।

সামনের মোড়ে পৌঁছে গতি কমাল এলেনা, ভাবছে কোন্‌ দিকের ঢাল বেয়ে উঠবে মরুভূমির সমতলে। ভাল একটা জায়গা বেছে মোনার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'শক্ত করে ধরো!'

থ্রটল মুচড়ে খাড়া ঢাল বেয়ে রেসের গতি তুলে মরুভূমির বুকে উঠে এল এলেনা। মাত্র কয়েক মিনিট পর একের পর এক ঢিবির রাজ্যে ঢুকল ওরা। বালির স্তূপ যেন সাগরের মস্ত সব ঢেউ। ঢিবির মাঝের জায়গা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল এলেনা। নিচের দিকে রাখছে এটিভি। পেছনে ছিটকে পড়ছে মোরগের লেজের মত বালির স্রোত। শত্রুপক্ষ ওটা দেখলে পিছু নেবে।

বালির স্তূপের নিচের অংশ দিয়ে গেলে খারাপ দিকও আছে।

বারবার বাঁক নিতে হচ্ছে, একটু পর পর দেখতে হবে জিপিএস। সাধ্যমত গতি তুলছে এলেনা। কোনও দিকে দেখার সময় নেই। কিন্তু পেছনে চোখ রাখতে পারে মোনা।

'রানাকে দেখলে?' হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজের ওপর দিয়ে জানতে চাইল এলেনা। টের পেল, কোমর ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল মেয়েটা। আরও ভাল করে দেখতে দেয়ার জন্যে গতি কমিয়ে দিল এলেনা।

'না!' পাল্টা চিৎকার করল মোনা।

ক'সেকেণ্ড পর বাম চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল এলেনা। বোধহয় রানা! ওদিকে চলল। কিন্তু এক শ' ফুট যেতে না যেতেই চমকে গেল। কান ফাটিয়ে দিতে চাইছে সাইলেন্সারহীন এক গাড়ির ইঞ্জিন। উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বেলে পাশের ঢিবি থেকে নেমে আসছে স্যাণ্ড রেল!

যে-কোনও সময়ে ধরা পড়বে ওরা!

'শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরো!' বলল এলেনা।

উঁচু ঢিবি থেকে তুমুল গতি তুলে নামছে স্যাণ্ড বাগি, একটু দূর দিয়ে আসছে আরেকটা। ওটা পৌঁছুবে সামান্য পরে।

বাঁক নিয়ে সরে যেতে চাইল এলেনা। ছোট বেশ কিছু ঢিবির ভেতর দিকে চলেছে আঁধার চিরে। লাফিয়ে উঠছে এটিভি, পিছলে ছুটছে। হঠাৎ করেই ওদের ডানের মরুভূমি হয়ে গেল দিনের মত পরিষ্কার। কয়েক সেকেণ্ড পর এটিভির পিছু নিল আরেকটা বাগি।

হেডলাইট নয়, সার্চলাইট জ্বেলেছে শত্রুরা। গগল্স্ থাকা সত্ত্বেও চোখ কুঁচকে গেল এলেনার। বামহাতে খুলে ফেলল গগল্স্। দেরি করলে আছড়ে পড়ত পাথরের ছোট এক স্তূপের ওপর। আরও ডানে সরে গেল এলেনা। কাত হয়ে যেতে শুরু করেও সামলে নিল এটিভি, এড়িয়ে গেল পাথরের বাধা।

পেছনে পাথর ভাঙার কুড়মুড় আওয়াজ পেল ওরা। সেই সঙ্গে

বুক কাঁপিয়ে দেয়া ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ।

আবারও আঁধার হলো চারপাশ। এলেনা বুঝল, দু'দিক থেকে এসে মুখোমুখি গুঁতো দিয়েছে দুই স্যাণ্ড রেল পরস্পরকে। চিরকালের জন্যে বিকল হলো কি না, কে জানে!

ওদিকে মনোযোগ দিল না এলেনা। এখন ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত বহু দূরে পালিয়ে যাওয়া।

ছত্রিশ

এলেনা ও মোনার কাছে পৌঁছুতে পূর্ণ গতি তুলেছে রানা। প্রায় উড়ে চলেছে রাতের আঁধারে। তখনই টের পেল, বড় একটা সমস্যায় পড়েছে। আসলে ও জানেও না কোথায় আছে।

কেমন যেন নতুন মনে হচ্ছে নদীর বুক ও দু'পারের দেয়াল। অনেক বেশি মৃত গাছ ও সারি সারি পাথর। মসৃণ নয় মেঝে। তাড়া খেয়ে এদিকে আসার পর মনে হচ্ছে, বেশি সময় পার করে দিয়েছে নদীর খাদে। ধারণা করল, চলে এসেছে অনেক উত্তর দিকে।

এগোবার ফাঁকে দু'দিকে চোখ রাখল রানা। একটু পর এক দিকের দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে মনে হলো। এটিভির নাক জমিতে রাখার জন্যে সামনে ঝুঁকে গেল ও, ঝড়ের গতি তুলে উঠে এল মরুভূমির মেঝেতে। দূরে দেখল পশ্চিমে বালির ঢিবির ওপর কয়েকটা উজ্জ্বল আলো। তিন জোড়া বাতি সামনে, পেছনে আরও এক জোড়া গাড়ির হেডলাইট।

এলেনা ও মোনার পিছু নিয়েছে একদল হাউণ্ড, ভাবল রানা। আরও গতি বাড়াল, কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলল রাইফেল। ডানে থ্রটল, ওটা ধরে বামহাতে রাইফেল রাখল হ্যাণ্ডবারের ওপর। মনে পড়ল না, আগে কখনও বামহাতে রাইফেল ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রথম বলে একটা কথা আছে।

এঁকেবেঁকে উঁচু সব টিবির মাঝের জমি ব্যবহার করে এগিয়ে চলেছে এলেনা, মাথায় রেখেছে কোন্ দিকে আছে জলায় এয়ারবোট। বড়জোর এক মাইল দূরে ওটা, ওখানে অস্ত্র নিয়ে তৈরি আছে রানার বন্ধু গ্রাহাম। সে সাহায্য করবে।

গতি না কমিয়েই ডানে বাঁক নিল এলেনা, আরেকটু হলে কাত হয়ে পড়ে যেত এটিভি। তখনই উল্টো দিকে ঝুঁকে গেল মোনা। এক মুহূর্ত পর ওই একই ভুল করল মেয়েটা।

'বাঁক নিলে আমার মত করে ব্যালেন্স রাখবে!' চিৎকার করে জানাল এলেনা।

'আমি রানাকে খুঁজছি!' পাল্টা চেঁচাল মোনা।

'আপাতত ওর কথা ভুলে যাও! আমার মত করে কাত হও, নইলে উল্টে পড়ব!'

কথার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আরেকবার বাঁক নিতে হলো না এলেনাকে, মোনা বুঝে গেল, কী করতে হবে।

সামনের মরুভূমি দিন করে দিয়েছে এক স্যাণ্ড রেল। আসছে সোজা ওদের দিকেই। দ্রুতগামী ফাইটার পাইলটের মত সরে যেতে চাইল এলেনা। যেন ফাঁকি দেবে মিসাইলকে। এত দ্রুত বাঁক নিল যে স্যাণ্ড রেলের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল আঁধার রাতে।

কতবার এভাবে সরে যেতে পারব, ভাবতে গিয়ে হাঁফ লেগে গেল এলেনার। সত্যি বলতে, এত দূর পর্যন্ত আসতে পারবে

ভাবতেও পারেনি। মনে পড়ল রানার কথা। কোথায় গেল মানুষটা? ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু হয়ে গেল না তো?

ফুল স্পিডে পরের বালির ঢিবির দিকে চলেছে ওরা। উঁচু স্তূপে উঠে সাঁই-সাঁই করে নেমে যেতে লাগল মরুভূমির মেঝে লক্ষ্য করে। চোখের কোণে দেখল, পেছন থেকে আসছে আলোর রেখা। ছড়িয়ে পড়ছে গাড়িগুলো। প্রথম সুযোগে ঘিরে ফেলবে। কাজেই ওদের উচিত এখন আঁধারে হারিয়ে যাওয়া।

সরাসরি সামনে চোখ রাখল এলেনা। ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে জলার তীরে। সামনের বালির ঢিবির ওপর উঠে আসতেই দেখল দূরে পানির ধারে সারি সারি নলখাগড়া।

কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় ভয়টা বাস্তবে রূপ নিল এবার।

স্যাণ্ড রেলের ড্রাইভাররা তাড়া করে ওদেরকে সরিয়ে এনেছে আরেক দল লোকের দিকে। জলার তীরে অপেক্ষা করছে অন্তত ছয়জন সশস্ত্র লোক ও সেই হামভি।

কড়া ব্রেক কষে থেমে যেতে চাইল এলেনা। কিন্তু এবার তৈরি ছিল না মোনা, ওর কারণে কাত হয়ে পড়ে গেল এটিভি। ছিটকে গিয়ে দু'দিকে পড়ল ওরা দু'জন।

বালির ভেতর গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে এলেনা, থামল কয়েক সেকেণ্ড পর। চট্ করে মুখ তুলে দেখল চারপাশ। একটু দূরে উল্টো হয়ে পড়ে আছে এটিভি, বনবন করে ঘুরছে চাকা। উঠে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে ওটার পাশে পৌঁছল ও। এইমাত্র পেছনের ঢিবি পেরিয়ে নেমে আসছে তিনটে স্যাণ্ড রেল। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল নিল এলেনা, দেরি হলো না শত্রুপক্ষ লক্ষ্য করে গুলি পাঠাতে।

একটা ডিউন বাগির গায়ে লাগল ওর গুলি। পথ হারিয়ে ভুল দিকে চলল তিন চাকার গাড়ি। টিলার মত ঢিবি থেকে কাত হয়ে পড়তে লাগল সরসর করে। ওটার একটা চাকা ছিটকে বেরিয়ে

গেল ফ্রিসারির মত।

শেষ ঢিবির পায়ের কাছে আছে এলেনা ও মোনা। মাত্র পাঁচ শ' গজ গেলেই জলা। কিন্তু ওদেরকে চক্কর কাটতে শুরু করেছে অন্য দুই ডিউন বাগি। বজায় রেখেছে দূরত্ব।

এলেনা থেকে ত্রিশ ফুট দূরে হাত-পায়ে ভর করে উঠে বসেছে মোনা।

'এদিকে, মোনা!' গলা ছাড়ল এলেনা।

দেখে মনে হলো বেকায়দা পতনের ফলে মাথা কাজ করছে না মেয়েটার। টলমল করতে করতে এগোতে লাগল এলেনার দিকে।

'তোমার পিস্তল কোথায়?' আবারও চিৎকার করল এলেনা।

পোশাকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে নাড়ল মোনা। বেকায়দাভাবে ধরেছে অস্ত্রটা।

'কেউ কাছে এলেই গুলি করবে!' এলেনা স্পষ্ট দেখল, জলার তীর থেকে সরে মোনার দিকে আসছে কয়েকজন লোক। ধীর গতি তুলে সামনে বাড়ছে হামভি, উজ্জ্বল হেডলাইট পড়েছে মোনার চোখে। বার কয়েক মাথা নাড়ল মেয়েটা।

কয়েকবার গুলি করে হামভির দু'চোখ অন্ধ করে দিল এলেনা, নিজে আড়াল নিয়েছে উল্টে পড়া এটিভির পেছনে।

এখনও গুলি করছে না শত্রুপক্ষ। এলেনা ও মোনাকে ঘিরে দূর দিয়ে ঘুরছে দুই ডিউন বাগি। একটা ডান থেকে বামে; অন্যটা বাম থেকে ডানে।

ডানের ডিউন বাগি একটু দূর দিয়ে যেতেই পাগলের মত ওটার ওপর বেশিরভাগ গুলি খরচ করল মোনা।

'আরও কাছে না এলে গুলি করবে না!' ওকে বলল এলেনা।

'আমি চাই না ওরা কাছে আসুক!' আপত্তি তুলল মোনা।

মেয়েটার মন বুঝছে এলেনা। ভীষণ ভয় পেয়েছে বলে মাথায়

নেই, ওদের কাছে এত গুলি নেই যে বেশি খরচ করবে।

চট্ করে জলার দিকে তাকাল এলেনা। গলা শুকিয়ে গেল। সর্বনাশ! যেখানে নেমেছিল, সেই জায়গা ফাঁকা! কোথাও নেই এয়ারবোট! বড় ঝামেলার ভয়ে উধাও হয়েছে জন গ্রাহাম!

তীরের মত ছুটে চলেছে রানা, কিন্তু দমে যেতে চাইছে মন। যে গাড়ির পিছু নিয়েছে, ওটা ওর নিজের ভেহিকেলের চেয়ে অনেক দ্রুতগামী। ড্রাইভার জানেও না, পেছন থেকে হামলা করতে চাইছে কোন্ লোক, কিন্তু তার সাধ্য নেই যে ধাওয়া করে ধরবে। আমি যেন এক নেড়ি কুত্তা, যে কি না ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যাবে, কিন্তু ধরতে পারবে না গাড়ি, তিক্ত মনে ভাবল রানা।

বুকে অদম্য জেদ নিয়ে ফুল স্পিডে চলেছে, চোখ দূরের বাতির ওপর। ভাল করেই জানে, ওদিকেই জলা। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল আলোর এগিয়ে চলা। অদ্ভুতভাবে ঘুরে ঘুরে সরছে আলো। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রানা। নেকড়ের দল বোধহয় ঘিরে ফেলেছে এলেনা আর মোনাকে!

গতি না কমিয়ে এগোল রানা। একটু পর উঠে পড়ল শেষ টিবির ওপর। চূড়া থেকে দেখল, বালির এই স্তূপের নিচে উল্টে পড়া এটিভির পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে এলেনা ও মোনা। হায়নার মত ওদেরকে ঘিরে বৃত্ত তৈরি করছে স্যাণ্ড রেল। শুধু তা-ই নয়, মেয়েদুটোর দিকে হেঁটে যাচ্ছে বেশ ক'জন লোক।

তেড়ে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, বুঝল রানা।

গতি বাড়িয়ে সরাসরি স্যাণ্ড রেল ও এলেনা-মোনার মাঝে পৌঁছতে চাইল। বামহাতে রাইফেল বাগিয়ে গুলি ছুঁড়ল সামনের ডিউন লক্ষ্য করে। ঝড়ের গতি তুলে নেমে চলেছে বালির টিবি থেকে।

পাঁচ সেকেণ্ড লাগল না ঝাঁঝরা করে দিতে দ্বিতীয় ডিউন

বাগি। বিস্ফোরিত হলো অকটেনের ট্যাঙ্ক, গড়াতে গড়াতে দূরে গিয়ে থামল জ্বলন্ত স্যাণ্ড রেল।

বাঁকা পথ তৈরি করে ছুটতে ছুটতে লোকগুলোর ওপর গুলি চালাল রানা। যোগ দিয়েছে এলেনা ও মোনা। কারণ, রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে গেলেও আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দ শুনল ও। ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করেছে লোকগুলো, যে যার মত আড়াল খুঁজছে।

ঝোড়ো গতি এটিভি থেকে এলেনার দিকে ঘুরে তাকাল রানা। সরাসরি দুই মেয়ের দিকে চলেছে অবশিষ্ট স্যাণ্ড রেল। ওটার পেছনে চারজন লোক, একেকজন যেন মইওয়ালা ফায়ার ট্রাকের কর্মী।

এলেনা ও মোনাকে পেরিয়ে যাওয়ার আগেই স্যাণ্ড রেল থেকে নেমে পড়ল চারজন লোক, মেয়েদুটোর ওপর ঝপাৎ করে ফেলল জাল। আটকা পড়ে গেল এলেনা ও মোনা। খেপা সিংহীর মত লড়তে চাইছে এলেনা, কিন্তু তার ফলে আরও জড়িয়ে গেল জালে।

বাঁক নিয়ে ওর দিকেই চলেছে রানা, নতুন করে গতি তুলছে। এলেনার তরফ থেকে দেখল গুলির আগুনের ঝিলিক। টলমল করে চিত হয়ে বালিতে পড়ল এক লোক। দু'হাতে খামচে ধরেছে বুক। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা ল্যাং মেরে এলেনাকে ফেলে দিয়ে জাপ্টে ধরল। পিস্তলের গুলি খেয়ে কাত হয়ে বালিতে পড়ল তার লাশ। তৃতীয় লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মোনার ওপর।

ফুল স্পিডে ওখানে পৌঁছল রানা। খালি রাইফেল ব্যবহার করল ক্রিকেটের ব্যাটের মত। ওটার বাঁটের বাড়ি পড়ার আগেই সামনে বেড়ে খপ করে ধরতে গেল চতুর্থ লোকটা। চোয়ালে নিল মারাত্মক আঘাত। ছিটকে পড়ল বালির ভেতর। এদিকে ভারসাম্য হারিয়ে ছুটন্ত এটিভি থেকে কাত হয়ে বালির মেঝেতে পড়েছে রানা। এক গড়ান দিয়ে উঠেই দেখল নিজের রাইফেল বের করে

নিয়েছে এলেনা। জালের ভেতর থেকে গুলি করল তৃতীয় লোকটাকে। মোনার একটু দূরে ছিটকে পড়েছে লাশ। এলেনা যে দু'জনকে আগে গুলি করেছিল, তারাও নড়ছে না।

প্রতিপক্ষ বলতে আর বড়জোর কয়েকজন, আসছে জলার দিক থেকে। তাদেরকে এড়িয়ে পৌঁছুতে হবে পানির ধারে।

এদিকে অনেক দূরে চলে গেছে নিয়ন্ত্রণহীন এটিভি। এলেনা ও মোনার পাশে থামল রানা, টান দিয়ে এলেনার ওপর থেকে সরিয়ে দিল জাল। কিন্তু একই সময়ে বেরোতে গিয়ে আরও জড়িয়ে গেল মোনা জালের ভেতর।

'আমার একটা অস্ত্র দরকার,' বলল রানা। জালের বড় বড় ফুটো দিয়ে নিজের পিস্তলটা বের করে ওর হাতে দিল মোনা।

জলার দিক থেকে যারা আসছে, তাদের দিকে গুলি পাঠাল এলেনা। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই বলল, 'রানা, তোমার বন্ধু কোথায় গেল?'

জলার দিকে তাকাল রানা। সত্যি ওদিকে নেই এয়ারবোট। কিন্তু দমে যাওয়ার লোক নয় গ্রাহাম। 'তাড়া খেয়ে সরে গেছে, কিন্তু ঠিক সময়ে আবারও হাজির হবে।'

'দেরি করলে আমরা শেষ,' বলল এলেনা, 'আমার কাছে আর মাত্র দুটো গুলি আছে।'

ভেস্ট থেকে নতুন ম্যাগাযিন বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমার আরেকটা আছে।'

শত্রুদের দিকে শেষদুটো গুলি করে খালি ম্যাগাযিন ফেলে দিল এলেনা, ভরে নিল নতুনটা। রানার দিকে তাকাল।

ওর প্রেমিক চেয়ে আছে তীরের দিকে।

গুলির ভয়ে নষ্ট এক ভেহিকেলের পেছনে লুকিয়ে পড়েছে কয়েকজন, অন্যরা আড়াল নিয়েছে বড় সব পাথরের পেছনে। আপাতত রানার দল ও জলার তীরের মাঝে কেউ নেই।

‘এরা কয়জন?’ জানতে চাইল রানা।

‘জানি না,’ বলল এলেনা, ‘তবে কমপক্ষে সাত-আটজন। বেশিও হতে পারে।’

‘গুলি করে তোমাদেরকে খতম করে দিল না কেন?’ ঘুরে মোনাকে দেখল রানা।

‘ওরা আমাকে চায়,’ সোজাসাপ্টা বলল মোনা। ‘বাবাকে খুন করেছে, কারণ উনি সাহায্য করবেন না ঠিক করেছিলেন। এখন আমাকে দরকার, জীবিত।’

এ কারণেই তোমাকে সেফ হাউসে রাখতে চেয়েছিলাম, মনে মনে বলল রানা। চারপাশ দেখল। রাগ হচ্ছে। জোর করে মিনা মোবারক আর মিনতির সঙ্গে মোনাকে রেখে আসা ভাল ছিল।

‘আগে হোক আর পরে, তোমাকে কিডন্যাপ করতে চাইবে,’ বলল রানা। ভাবছে, হামলা করবে এলেনা আর আমার ওপর, তখন আরেক দল সরিয়ে নেবে মোনাকে। যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে তাদেরকে। কিন্তু ঠেকাবে কী করে?

আবারও চারপাশ দেখল রানা। অনেক দূরের আঁধারে হারিয়ে গেছে ওর এটিভি। ‘এলেনা, তোমার এটিভি চলবে?’

‘মনে তো হয়,’ দ্বিধা নিয়ে বলল এনআরআই এজেন্ট।

হ্যাণ্ডেল ধরে গায়ের জোরে গাড়িটা সিধে করতে চাইল রানা। ধীরে উঠল জিনিসটা, বালিতে ধুপ্ শব্দে নামল চার চাকা।

‘সোজা জলার দিকে ছুটবে,’ বলল রানা, ‘ওদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে গ্রাহাম।’

‘কিন্তু পালিয়ে গিয়ে থাকলে?’

‘পালাবে না ও,’ জোর দিয়ে বলল রানা, ‘ওকে দেখতে না পেলে দেরি না করে সোজা গাড়ি নিয়ে নামবে জলায়। লুকিয়ে পড়বে নলখাগড়ার ভেতর। পরে খুঁজে নেবে জন।’

এলেনার হাত থেকে রাইফেল নিল রানা।

ভীত চোখে ওকে দেখল মোনা।

‘তোমার কী হবে? আমাদেরকে বাঁচাতে গিয়ে...

‘মরব না, কে যেন বলেছিল, আমি যমের অরুচি,’ বলল রানা।

দুশ্চিন্তা করতে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এলেনার মুখ। ‘কিন্তু... রানা...’

‘কোনও কিন্তু নেই, তোমরা সময় নষ্ট করছ,’ মৃদু ধমক দিল রানা।

মাথা দোলাল এলেনা, অন করল এটিভির সুইচ। বাতি জ্বলে উঠল প্যানেলে। ‘এখনও পাওয়ার আছে।’ এটিভির পিঠে চেপে বসার পর ওর পেছনে বসল মোনা।

‘যাও!’ তাড়া দিল রানা।

বালিতে পিছলে ছুটল এটিভি, একগাদা বালি ছুঁড়ল রানার নাকে-মুখে।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কয়েকজন, আড়াল ছেড়ে দৌড়ে এল এলেনা ও মোনার এটিভি ঠেকাতে।

স্যাণ্ড রেলের ওপর তিন পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা। পরক্ষণে বামে-ডানের লোকগুলোর দিকে। তিন দিক দিয়ে মেয়েদুটোর পথ রুদ্ধ করতে চাইছে তারা। কিন্তু রানার গুলি খুব কাছ দিয়ে যেতেই লুকিয়ে পড়ল।

শেষপর্যন্ত হয়তো জলায় নেমে যাবে এলেনা ও মোনা, ভাবল রানা। সাহস হারিয়ে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। এখানে আসার পর বেশ কয়েকজনকে দেখেছে মরতে। বাধ্য না হলে ঝুঁকি নেবে না। পাথরের স্তূপের আড়াল নিয়েছে।

এখনও গতি বাড়াচ্ছে এলেনা, খুলে দিয়েছে থ্রটল।

ঢিবির শেষ অংশের বালি মিশেছে কাদাটে তীরে, সেদিকে ছুটছে এটিভি। জলার কিনারায় নেই এয়ারবোট সহ গ্রাহাম। বিশ

সেকেণ্ড পর পানিতে ঝপাস্ করে পড়বে এটিভি। নলখাগড়ার মাঝে লুকিয়ে পড়বে এলেনা ও মোনা। সাহস করে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে না শত্রুপক্ষ। নিজেরাও তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। গোলাগুলির আওয়াজ মরুভূমির ভেতর বহু দূরে গেছে। কী হচ্ছে জানতে হাজির হবে ইরানিয়ান আর্মি।

তাতে লাভ হবে না রানা, এলেনা বা মোনার। এখন চাই গ্রাহামের কাছ থেকে সাহায্য। তার উচিত তীরে পৌঁছে যাওয়া। ওখান থেকে গুলি করলে সেই সুযোগে রানা নিজেও যেতে পারবে এয়ারবোটের কাছে। টিবির পায়ের কাছে বেশিক্ষণ টিকবে না ও।

কাদা ভরা মাটিতে সগর্জনে ছুটে চলেছে এটিভি। একটু পর পৌঁছুবে তীরে। এলেনা ভাল করেই জানে, ওদের দিকে আসবে না মাসুদ রানার গুলি। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে, শত্রুপক্ষের কেউ মাথা তুললেই মরতে হবে তাকে।

বাধা দিতে এল না কেউ। দশ সেকেণ্ড পর নেমে পড়বে ওরা পানিতে। তখন নিশ্চিন্ত।

এমন সময় কী যেন হয়ে গেল। হঠাৎ করেই এলেনার কোমর থেকে ছুটে গেল মোনার দু'হাত। ছিটকে সামনে বাড়ল এটিভি। ওজন কমে যাওয়ায় বেড়ে গেছে গতি।

সামান্য গতি কমিয়ে ঘুরে তাকাল এলেনা।

পিছনের কাদায় বলের মত গোল হয়ে পড়েছে মোনা।

'আরে,' অবাক হয়ে এটিভি ঘুরিয়ে নিতে চাইল এলেনা। গিয়ে তুলে আনবে মোনাকে। কিন্তু তখনই ওর দিকে এল অন্তত দশটা গুলি। এ লড়াইয়ে আগে কখনও ট্রেসার দেখেনি। একদম খোলা জায়গায় পড়ে আছে মোনা। বাধ্য হয়ে এটিভি ঘুরিয়ে সরে গেল এলেনা। সামনের ডান দিকের চাকায় লাগল গুলি।

বিস্ফোরিত হলো চাকা। হাঁটু ভাঙা রেসের ঘোড়ার মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল এটিভি। ওটার পিঠ থেকে উড়াল দিল এলেনা,

ছিটকে গিয়ে পড়ল সামনে কাদার ভেতর। পাশেই জলা। কাদার ভেতর পিছলে পানিতে নেমে পড়ল এলেনা।

একদল লোক ছুটে এল ওর দিকে। দ্বিতীয় দল গেল মোনার উদ্দেশে।

অবিশ্বাস্য মনে হলো এলেনা ও রানার, উঠে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর দিকেই পা বাড়িয়েছে মোনা!

গুলি করে দুই শত্রুকে ফেলে দিল রানা।

কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে বেরেটা দিয়ে গুলি করবে এলেনা, তখনই পেছন থেকে এল জোরালো আওয়াজ। তুমুল গতি তুলে অন্ধকার চিরে ছুটে আসছে গ্রাহামের এয়ারবোট। সামনের ট্রাইপড থেকে গর্জন ছাড়ছে দুটো রাইফেল। এলেনার দিকে ছুটে আসা লোকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাতে লাগল। ট্রাইপডের রাইফেল ঘুরিয়ে নিচ্ছে গ্রাহাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেল। ঘুরে জলার দিকে রওনা হওয়ার আগেই মোনাকে খপ করে ধরেছে দুই লোক, ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে সরে গেল পাথরের এক স্তূপের ওদিকে।

মোনার গায়ে গুলি লাগবে ভেবে গুলি করেনি এলেনা। শুনল রানার আর্মালাইটের গর্জন। থেমে গেল গুলির আওয়াজ।

নতুন চাল দেয়ার উপায় নেই। তিনজন লোক মিলে মোনাকে ছেঁচড়ে নিচ্ছে হামভির দিকে। গুলি করতে পারবে না এলেনা, রানা বা গ্রাহাম। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর হামভির পেছনের সিটে তুলে দেয়া হলো মোনাকে। নিজেরাও লোকগুলো উঠে পড়ল গাড়িতে। ধুম শব্দে বন্ধ হলো দরজা। পরের সেকেণ্ডে রওনা হলো হামভি। আরও কয়েকজন চেপে বসেছে অবশিষ্ট স্যাণ্ড রেল-এ। তারাও কনভয়ের লেজের মত ছুটল হামভির পেছনে। যে পুরস্কারের জন্যে এসেছিল, তা পেয়ে গেছে। মাত্র কয়েক মুহূর্তে বালির ঢিবি পেরিয়ে চোখের আড়াল হলো তারা।

কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখল এলেনা। মরুভূমির

ভেতর এখনও জ্বলছে পোড়া স্যাণ্ড রেল। ছড়িয়ে পড়ছে কটু গন্ধী ধোঁয়া। এখানে ওখানে লাশ। টিবির পায়ের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

নিজ চোখে রানা দেখেছে, শত্রুপক্ষকে যেন সাহায্য করেছে মোনা। কোনও বাধা দেয়ার চেষ্টাই করেনি। অথচ, ওর পক্ষে সহজেই সম্ভব ছিল মুক্তি পাওয়া।

নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিল কেন মেয়েটা?

চরম বিরক্তি বোধ করছে রানা।

আসলে হলোটা কী?

এটিভি থেকে পড়ে গিয়েছিল মোনা?

গুলি লেগেছিল গায়ে?

ওদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে তুলে দিয়েছে শত্রুর হাতে?

আসলে কী হয়েছে জানার উপায় নেই, ভাবল রানা। এখন এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেই বা কী হবে? বাস্তব হচ্ছে মোনাকে নিয়ে গেছে তারা। ওর কাছে রয়ে গেছে মাটির ট্যাবলেটের একটা অংশ।

রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল এক তরুণ, এখন জ্ঞান ফিরছে তার।

কয়েক ফুট দূরে সে। মুখ নিচু করে তাকে দেখল রানা। এই তরুণের চেহারা কেমন চেনা চেনা লাগল।

হ্যাঁ, প্যারিসে দেখেছে। বিধ্বস্ত বোট থেকে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল সেইন নদীতে।

ঘোর ধরা চোখে রানাকে দেখছে। ভয় পেল শত্রুর কঠোর চোখ দেখে।

'তোমাকে বাঁচতে দেয়া হবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাল তরুণ। সুযোগ পেলে তাড়া

খাওয়া ইঁদুরের মত পালিয়ে যাবে।

'আমার দিকে তাকাও!' বলল গম্ভীর রানা।

ফুলে যাওয়া চোয়ালে হাত রাখল তরুণ। কিন্তু তার মুঠোর ভেতর ছোট কী যেন।

জলা থেকে উঠে রানার কাছে পৌঁছে গেছে এলেনা।

নড়ে উঠল তরুণের হাত।

একই সময়ে ঝট করে রাইফেল তুলল রানা।

'না!' একটু দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল এলেনা।

কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল রানার রাইফেল।

ভীষণ ব্যথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তরুণ। এক গুলিতে ফুটো করে দেয়া হয়েছে তার পাঞ্জা। সুস্থ হাতে চেপে ধরল ক্ষত। মুখ তুলে দেখল নিষ্ঠুর লোকটাকে।

'ভেবেছিলাম তুমি মেরেই ফেলবে,' রানাকে বলল এলেনা।

ঘুরে এলেনাকে দেখল রানা।

ওর কঠোর চোখ দেখে শিউরে উঠল এনআরআই এজেন্ট।

'হয়তো খুনই করব,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে জেনে নেব এর সঙ্গীরা কোথায় নিয়ে গেছে মোনাকে।'

একইসময়ে আবারও কর্কশ আওয়াজ তুলল রানা ও এলেনার বেল্টের স্ক্যানার। ফার্সি ভাষায় আলাপ করছে দু'জন।

রানার দিকে তাকাল এলেনা।

'আর্মি রওনা হয়েছে,' বলল রানা, 'একে সঙ্গে নেব। কোথাও নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেশন করব।' এলেনার রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ও। খপ করে তরুণের কাঁধ চেপে ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল।

ফুটো তালু থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে দেখে তরুণের শার্ট ছিঁড়ে নিল এলেনা। কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজের মত করে ক্ষত বেঁধে দিল। আরেক ফালি কাপড় নিয়ে বেঁধে দিল দু' কবজি।

ভেতর এখনও জ্বলছে পোড়া স্যাণ্ড রেল। ছড়িয়ে পড়ছে কটু গন্ধী ধোঁয়া। এখানে ওখানে লাশ। ঢিবির পায়ের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

নিজ চোখে রানা দেখেছে, শত্রুপক্ষকে যেন সাহায্য করেছে মোনা। কোনও বাধা দেয়ার চেষ্টাই করেনি। অথচ, ওর পক্ষে সহজেই সম্ভব ছিল মুক্তি পাওয়া।

নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিল কেন মেয়েটা?

চরম বিরক্তি বোধ করছে রানা।

আসলে হলোটা কী?

এটিভি থেকে পড়ে গিয়েছিল মোনা?

গুলি লেগেছিল গায়ে?

ওদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে তুলে দিয়েছে শত্রুর হাতে?

আসলে কী হয়েছে জানার উপায় নেই, ভাবল রানা। এখন এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেই বা কী হবে? বাস্তব হচ্ছে মোনাকে নিয়ে গেছে তারা। ওর কাছে রয়ে গেছে মাটির ট্যাবলেটের একটা অংশ।

রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল এক তরুণ, এখন জ্ঞান ফিরছে তার।

কয়েক ফুট দূরে সে। মুখ নিচু করে তাকে দেখল রানা। এই তরুণের চেহারা কেমন চেনা চেনা লাগল।

হ্যাঁ, প্যারিসে দেখেছে। বিধ্বস্ত বোট থেকে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল সেইন নদীতে।

ঘোর ধরা চোখে রানাকে দেখছে। ভয় পেল শত্রুর কঠোর চোখ দেখে।

'তোমাকে বাঁচতে দেয়া হবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাল তরুণ। সুযোগ পেলে তাড়া

খাওয়া ইঁদুরের মত পালিয়ে যাবে।

'আমার দিকে তাকাও!' বলল গম্ভীর রানা।

ফুলে যাওয়া চোয়ালে হাত রাখল তরুণ। কিন্তু তার মুঠোর ভেতর ছোট কী যেন।

জলা থেকে উঠে রানার কাছে পৌঁছে গেছে এলেনা।

নড়ে উঠল তরুণের হাত।

একই সময়ে ঝট করে রাইফেল তুলল রানা।

'না!' একটু দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল এলেনা।

কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল রানার রাইফেল।

ভীষণ ব্যথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তরুণ। এক গুলিতে ফুটো করে দেয়া হয়েছে তার পাঞ্জা। সুস্থ হাতে চেপে ধরল ক্ষত। মুখ তুলে দেখল নিষ্ঠুর লোকটাকে।

'ভেবেছিলাম তুমি মেরেই ফেলবে,' রানাকে বলল এলেনা।

ঘুরে এলেনাকে দেখল রানা।

ওর কঠোর চোখ দেখে শিউরে উঠল এনআরআই এজেন্ট।

'হয়তো খুনই করব,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে জেনে নেব এর সঙ্গীরা কোথায় নিয়ে গেছে মোনাকে।'

একইসময়ে আবারও কর্কশ আওয়াজ তুলল রানা ও এলেনার বেল্টের স্ক্যানার। ফার্সি ভাষায় আলাপ করছে দু'জন।

রানার দিকে তাকাল এলেনা।

'আর্মি রওনা হয়েছে,' বলল রানা, 'একে সঙ্গে নেব। কোথাও নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেশন করব।' এলেনার রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ও। খপ করে তরুণের কাঁধ চেপে ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল।

ফুটো তালু থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে দেখে তরুণের শার্ট ছিঁড়ে নিল এলেনা। কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজের মত করে ক্ষত বেঁধে দিল। আরেক ফালি কাপড় নিয়ে বেঁধে দিল দু' কবজি।

অনায়াসে হালকা তরুণকে ডান কাঁধে তুলল রানা, চলল জলার দিকে। ওর সঙ্গে রয়েছে এলেনা।

কিছুক্ষণ পর এয়ারবোটে উঠল ওরা। ময়দার বস্তার মত মেঝেতে তরুণকে ধুপ করে ফেলল রানা। 'জন, রওনা হও।'

এয়ারবোট ঘুরিয়ে নিল গ্রাহাম, পরক্ষণে ঝড়ের গতি তুলে ছুটল ইরাকি এলাকা লক্ষ্য করে।

সাঁইত্রিশ

আল কুয়ারনা শহরের একটি পরিত্যক্ত এলাকায় এনআরআই-এর ছোট এক বাড়ির কিচেনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। বালি দূর করছে গা থেকে। কাজটা শেষ হলে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল হাত-মুখ।

ঝোড়ো বালির কারণে এখনও জ্বলছে দু'চোখ। রাগ হচ্ছে, ব্যর্থ হয়েছে মিশন। মোনাকে হারিয়ে বসেছে ওরা।

পাশের ঘরে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছে এলেনা।

কিচেনে ঢুকে রানার কাঁধে হাত রাখল গ্রাহাম। 'বিশ্রাম নাও, ওই ছোকরাকে পাহারা দিচ্ছি। পালাতে পারবে না। এমনিতেই হাত-পা বেঁধে মুখে গুঁজে রেখেছ রুমাল। তুমি বললে ওর মাথাও ফাটিয়ে দিতে পারি।'

কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ঠিক করেছে রানা। শুকনো গলায় বলল, 'দরকার হলে ঠিক তা-ই করব।'

মৃদু নড করে কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে গেল গ্রাহাম।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘরে ঢুকল এলেনা। 'সরি, দেখো, ঠিকই মোনাকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'বলেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'ওকে পেতেই হবে, নইলে সর্বনাশ হবে।' চুলোর পাশের কাউন্টারে চোখ গেল ওর। ওখানে দুটো হোলস্টার ও পিস্তল। একটা ওর। অন্যটা এলেনার ৯ এমএম বেরেটা নয়। অনেক ছোট। 'ওই পিস্তলটা আমাকে দিয়েছিলে। কোথা থেকে পেলে?'

'মোনার,' বলল এলেনা, 'গুলির সময় হাত বদল হয়েছে।'

'তুমিই দিয়েছিলে ওকে?'

'না। ওর কাছে আগেই ছিল।'

অস্ত্রটা পরীক্ষা করল রানা।

.২৫ ক্যালিবারের অটোমেটিক।

হঠাৎ একটা চিন্তা আসতেই গম্ভীর হয়ে গেল ও।

না, এমন হওয়ার কথা নয়!

এলেনার হাতে তোয়ালে দিয়ে মোবাইল ফোন তুলে নিল রানা, টেক্সট্ মেসেজ লিখে পাঠিয়ে দিল ফ্রান্সের এক ফোন নম্বরে।

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর ভিডিয়ো-কনফারেন্সের জন্যে যোগাযোগ করলেন এনআরআই চিফ। মনিটরে দেখা দিয়ে সরাসরি জরুরি কথায় এলেন, 'ইনফেকশন রেট ও ভিরুলেন্স কনফার্ম করেছে সিডিসি। সর্বোচ্চ সতর্ক হতে বলেছে।'

'একটু খুলে বলুন,' বলল এলেনা।

'নানান অ্যান্টিভাইরাস জড় করছি আমরা। জোরেশোরে তদন্তে নেমেছে ইন্টারপোল। ঠিক হয়েছে, আগামী ভোরে ন্যাটো দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে ওই ভাইরাস নিয়ে আলাপ করবেন

আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'ওসব তো রাজনৈতিক বোলচাল,' বলল রানা। 'এখন এমন কিছু দরকার, যেটা দিয়ে ঠেকানো যাবে জীবন-বৃক্ষের বীজ।'

'জানি, কিন্তু কী করব?' কাঁধ ঝাঁকালেন ব্রায়ান। 'জরুরি কিছু ভেবে থাকলে পরামর্শ দিতে পারেন।'

'প্রথম সুযোগে হামলা করতে হবে ওই কাল্টের ওপর,' বলল রানা। 'ইরাকে আপনাদের সৈনিক আছে। বা সৌদি আরব থেকেও সরিয়ে আনতে পারবেন। চোখ খোলা রাখুক তারা। আশা করি, স্ট্রাইক টিম পাঠানো হচ্ছে? উপকূল পাহারা দেবে হেলিকপ্টার প্যাট্রল, গোপনে চোখ রাখবে পারস্য সাগরে। বোটে করে ওদিকে যেতে পারে ওই কাল্টের লোক। তাদের কাছে রয়ে গেছে ভাইরাস আর ওই বীজ। যদিও মনে করি না ইরানে থাকবে তারা।'

'যা বলেছেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছেন?' বললেন ব্রায়ান, 'গোপনে ইরানে ঢুকলে মস্ত বিপদে পড়ব আমরা আমেরিকানরা।'

'সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে এলেনা আর আমি যেতে পারি,' বলল রানা। 'এরা মোনাকে তুলে নেয়ার পর ভাইরাস ছড়াতে বাধা থাকল না। কোনও ধরনের চালাকি করেছিলেন ডক্টর মোবারক, তাদের হাতে তুলে দেননি সঠিক জিনিস। কিন্তু মেয়েটা ভাইরাস তৈরি করবে। এ ছাড়া উপায় থাকবে না ওর। বাবার রেখে যাওয়া কাজ শেষ করবে।'

'আমরাও তা বুঝতে পারছি,' ভুরু কুঁচকে গেছে ব্রায়ানের।

'মোনা বলেছে কাজটা করতে লাগবে বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা।'

'লাউ আনও বলেছে, ওটা সহজ কাজ।'

'কতক্ষণ নির্যাতন সহ্য করতে পারবে মোনা?' রানার দিকে তাকাল এলেনা।

‘বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর এক বা দু’দিন,’ বলল রানা। ‘এরা কী করবে তার ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া, নিজে থেকেই কাজে নামতে পারে। ওর বোন অসুস্থ।’

কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেলেন ব্রায়ান, কপাল চুলকাতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, ‘এদিকে বাজে দুটো ঘটনা ঘটেছে। মার্ভেল ড্রাগ্স্ কর্পোরেশনের ল্যাবের নানান কমপিউটার রেকর্ড চুরি হয়ে গেছে। আমরা ধারণা করছি, সেসবের ভেতর ছিল টেস্ট রেযাল্টের ভাইরাস ৯৫২।’

কথা শুনে একটা কথাও বলল না রানা বা এলেনা।

আবারও শুরু করলেন ব্রায়ান, ‘এদিকে আমাদের আল কুয়ারনার সেফ হাউসে হামলা করেছিল কারা যেন। তিনজন গার্ডকে খুন করে নিয়ে গেছে ডক্টর মোবারকের বোন ও মেয়েকে।’

আরও তিক্ত হলো রানার মন। অসুস্থ, ছোট্ট একটা মেয়েকে জিম্মি করেছে একদল পশু। যা খুশি করবে, অথচ কিছুই করতে পারবে না ও নিজে!

‘সতর্ক ছিল না আমাদের লোক?’ বিস্ময় প্রকাশ করল এলেনা।

‘ছিল। কিন্তু আগে থেকেই চোখ রেখেছিল ওরা ওখানে।’

এই মিশনের প্রথম থেকেই ওর প্রতিটা পদক্ষেপের আগেই কয়েক পা সামনে থেকেছে ওই কাল্টের নেতা, ভাবল রানা। এরপর ও নিজে কী করবে সবই যেন জানা ছিল। এটা সম্ভব কী করে?

সম্ভব, যদি...

অস্বস্তির ভেতর পড়ল রানা।

কারা জানত ওরা ইরাক বা ইরানে যাচ্ছে?

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান,

এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান, এলেনা ও মোনা।

এলেনা আর ও ছাড়া কে জানত কোন্ এলাকায় থাকবে এনআরআই-এর সেফ হাউস?

আবারও মাত্র কয়েকজন।

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান, এলেনা আর মোনা।

ওর মনে হয়েছে, এটিভি থেকে ইচ্ছে করেই পড়ে গেছে মোনা। এরপর প্রায় ঘোরের ভেতর এগিয়ে গেছে শত্রুদের দিকে। সেক্ষেত্রে কি সম্ভব, কোনওভাবে ওই কাল্টের সঙ্গে জড়িত মোনা? ডক্টর মোবারকের কথা মনে পড়ল ওর। তিনি বলেছিলেন, ভুলেও কাউকে বিশ্বাস করবেন না। তাই বলে তাঁর নিজের মেয়েকেও বিশ্বাস করতে পারেননি? আরও জটিল কোনও কারণে বাবার কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল মোনা? এতটাই, বাবা খুন হয়ে গেলেও কিছুই যায় আসেনি?

এসব ভাবতে গিয়ে আরও তিক্ত হলো রানার মন। চাপা স্বরে বলল, 'কাল্টের হাতে মোনার বোন। কাজেই কোনও বাধা দেবে না ও। তা ছাড়া, ৯৫২ রেযাল্ট পেয়ে গিয়ে থাকলে, হয়তো ওকে লাগবেই না তাদের। ধরে নিতে পারেন, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তৈরি হয়ে যাবে প্রাচীন আমলের অমৃত। ছড়িয়ে দেয়া হবে দুনিয়া জুড়ে। লুকিয়ে পড়েছে তারা। এখানে আসতে আমাদের লেগেছে একঘণ্টা। তার মানে, উপকূলে পৌঁছুতে তাদের লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা। কাজেই আপনাদের দেখতে হবে, উপকূল দিয়ে যেন বেরিয়ে যেতে না পারে তারা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রায়ান। 'এত জলদি কিছুই করতে পারব না। প্রথমে রাজি করাতে হবে প্রেসিডেন্টকে। তিনি নির্দেশ দেবেন। সঠিক জায়গায় অবস্থান নেবে ফোর্স। তাতেও লাগবে অনেক সময়। আপনি যা বলেছেন, তা করতে গেলেও চাই বেশ

কয়েক ঘণ্টা। আমরা হয়তো আপনাকে হেলিকপ্টার জোগাড় করে দিতে পারতাম। কিন্তু ওটাতে করে খুঁজতে গেলে ইরানিয়ান মিসাইলের আঘাতে খুন হবেন। তাই বলছি, আপাতত অপেক্ষা করুন। নতুন কিছু জানলে যোগাযোগ করব আমি।'

'এদিকে আমরা কিছুই করতে পারব না?' বিরক্ত হয়ে চিফকে বলল এলেনা।

'আপাতত কিছুই করার নেই,' বললেন গম্ভীর ব্রায়ান।

'আমরা যে তরুণ ছেলেটাকে সঙ্গে এনেছি, তার কাছ থেকে জরুরি তথ্য পেতে পারি,' বলল রানা।

'নির্যাতন করতে চাও?' আপত্তির সুরে বলল এলেনা।

'কী করব তা পরে ভেবে বের করব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'কিন্তু ওর পেট থেকে কী বেরোবে? আরব তরুণ। স্থানীয়।'

'স্থানীয় নয়,' বলল রানা, 'ফ্রান্স থেকে এসেছে। ওর বুকে ডক্টর মোবারকের মতই পুড়িয়ে লেখা ভার্স। কাল্টের লোক।'

'হয়তো অনেক নির্যাতন করলে, কিন্তু কিছুই জানলে না—হতে পারে না? হয়তো জানেই না তেমন কিছু।'

'যা জানে, সেটা হয়তো কাজে আসবে,' বলল রানা। 'এক পর্যায়ে সবাই মুখ খোলে, নির্যাতনের মাত্রা সবার আলাদা।'

'আমি নির্যাতনের পক্ষে নই,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল এলেনা। 'ডক্টর মোবারকের কথাই ভাব। কম অত্যাচার করেনি তারা ওঁকে। জরুরি কিছু বের করতে পারেনি মুখ থেকে।'

নিষ্ঠুর শোনাল রানার কণ্ঠ: 'কিন্তু এই ছেলে ডক্টর মোবারক নয়, তাঁর যোগ্যতার সঙ্গে একে তুলনা করলে ভুল করবে।'

চুপ করে এলেনা ও রানাকে দেখছেন ব্রায়ান।

'কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ হবে, সেটা হতে দেব না,' বলল রানা।

'আমি একমত।' নড করল এলেনা। 'কিন্তু কাউকে নির্যাতন করে সত্যিকার তথ্য কখনও পাওয়া যায় না।'

'যা করার ভেবেচিন্তে করুন দু'জন, পরে যোগাযোগ করব, আমেরিকার সব অ্যাসেট কাজে লাগাব আমরা।' বিসিআই এজেন্ট ও এনআরআই এজেন্টের তর্ক বা বিরোধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ব্রায়ান। কালো হয়ে গেল মনিটরের পর্দা।

এলেনার দিকে তাকাল রানা। 'আমার দেশ বা আমার নিজের অত অ্যাসেট নেই। একা মানুষ আমি, অ্যাসেট বলতে শুধু মাথা আর এই শরীর, আর ওই একই জিনিস আছে ছোকরার। এসো, ইন্টারোগেশনের জন্যে তৈরি হই। ওর পেট থেকে বের করতে হবে সব। নইলে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা পেরোবার আগেই হয়তো পৃথিবী হয়ে উঠবে নরক।'

আটত্রিশ

অনেকক্ষণ হলো দু'হাতে কপাল টিপে ধরে নিজের অফিসে বিলাসবহুল চেয়ারে বসে আছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। ওই কাল্ট বা ভয়ঙ্কর ভাইরাসের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কখন সিদ্ধান্ত নেবেন, সেজন্যে বসে থাকলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু নিজে তিনি কিছু করবেন এনআরআই চিফ হিসেবে, সেই ক্ষমতাও তাঁর নেই। জানেনই তো না কী করা উচিত। জরুরি নতুন কোনও তথ্য পেলে তা জানাবেন প্রেসিডেন্টকে, কিন্তু তেমন কোনও রিপোর্ট জমা দেয়নি কেউ।

ব্রা-ব্রা আওয়াজ তুলে ইন্টারকম বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে

কানে ঠেকালেন ব্রায়ান। 'বলছি।'

'স্যর, লাউ আন,' ওদিক থেকে বলল বিজ্ঞানী, 'ওই ভাইরাসের কোড সম্পর্কে অদ্ভুত একটা দিক জেনেছি। আরও কিছু কথা জানতে চাই ফিল্ড অপারেটিভদের কাছ থেকে।'

লাউ আনকে কথা দিয়েছিলেন ব্রায়ান, মোনার কর্পোরেশন থেকে জোগাড় করে দেবেন তথ্য। নতুন সব রিপোর্টও আসছিল, কিন্তু ওখানে চুরি বা ডাকাতি হয়ে যেতে এখন আর কোনও তথ্য পাচার করতে পারছে না এনআরআই-এর লোকটা।

'আপাতত তা সম্ভব নয়,' বললেন ব্রায়ান, 'নতুন কিছু?'

'ওই ভাইরাসের ভেতরের অংশ খুব অদ্ভুত।'

'বিপজ্জনক?'

'না, কিন্তু জড়।' একবার কেশে নিল আন। 'এলোমেলো নয়। আমার অন্তত তা-ই ধারণা।'

'এসব থেকে কী বুঝছ?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান। তাঁর এখনও ধারণা, ওই কোডের ভেতর জরুরি কিছু থাকবে।

'তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'এদিকে সময় ফুরিয়ে আসছে।'

ব্রায়ানের বামদিকের ইন্টারকম বাজল। তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, 'প্রেসিডেন্টের চিফ অভ স্টাফ, স্যর। দু' নম্বর লাইনে।'

'এমন কিছু বের করো, যা দেখাতে পারি প্রেসিডেন্টকে,' লাউ আনকে বললেন ব্রায়ান।

'সাধ্যমত করব, স্যর।'

ইন্টারকম রেখে দিলেন ব্রায়ান। বড় করে দম নিলেন, তারপর টিপে দিলেন দু' নম্বর লাইনের বাটন।

কঙ্গোয় মোনা আর ওর সম্পর্ক নিয়ে অতীত রোমন্থন করছে রানা। আপাতত কোনও কাজ নেই ওর।

সেই বর্ষার রাতে গুড়-গুড় শব্দে মেঘ ডাকছিল। হারিয়ে গিয়েছিল ঝিঁঝি ও হাজারো পোকার ডাক।

পুরনো, রং-চটা সবুজ স্ক্রিন-ডোর ঠিকভাবে বন্ধ হতো না, যদিও ঠেকিয়ে দিত বেশিরভাগ পোকাকে। দূর থেকে দরজার সরু ফাঁক দিয়ে কালো, ঘন জঙ্গল দেখছিল উদাস রানা।

আঁধার রাতে আরম্ভ হলো ঝমঝম বৃষ্টি। করাগেটেড ছাতে এত জোরে পড়ছে, যেন হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিচ্ছে অসংখ্য পেরেক। একটু পর দক্ষিণ-পশ্চিমে নামতে লাগল একের পর এক বাজ। ঝলসে উঠছে উজ্জ্বল সাদা-নীলচে আলো, প্রতিটা ঝিলিকের কয়েক সেকেণ্ড পর প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠছে ছোট্ট বাড়ি।

তখনই হঠাৎ বেডরুম থেকে ছিটকে এল মোনা মোবারক, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল উঠানে। বিদ্যুতের ঝিলিকে রানা দেখল, মেয়েটার চোখ বিস্ফারিত। থমকে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। যে-কোনও সময়ে দৌড়ে ঢুকবে গহীন জঙ্গলে।

যখন-তখন মস্ত বিপদে পড়বে মেয়েটা। আঁধার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। দ্রুত পায়ে গিয়ে থামল মোনার সামনে।

'স্বপ্নে দেখলাম তুমি চলে গেছ,' কাঁপা গলায় বলল মোনা। দু'হাত তুলে খোঁপা করছে, মুখে স্বস্তি।

'তোমাদের না নিয়ে কোথাও যাব না,' বলল রানা। 'আগেও তোমাকে বলেছি।'

'জানি। বলেছ। কিন্তু ওরা আটকে রাখছে বাবাকে।'

রানা কিছু বলার আগেই বাড়ির ভেতর ঝনঝন শব্দে বাজল পুরনো টেলিফোন। মোনার হাত ধরে ঘরে ফিরল ও, তুলে নিল তারযন্ত্রের রিসিভার। ওদিকের কথা শুনে মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।'

হতাশ হয়ে ছাত দেখল মোনা। বুঝে গেছে, কী হয়েছে। আজকেও বাবাকে ল্যাব থেকে বেরোতে দেবে না কঙ্গো আর্মির

জেনারেলরা।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'বাবা আজও আসবেন না, তা-ই না?' বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল মোনা।

'আপাতত তা-ই,' বলল গম্ভীর রানা।

'বাবা বুঝতেও পারছেন না এরা কী করছে,' নালিশ করল মোনা। আবারও দেখল কালো আঁধার জঙ্গল। ওদিকে আছে ভয়ঙ্কর সব বিপদ। আবার ওদিক দিয়ে হয়তো পালাতে পারবে ওরা, পাবে মুক্তি।

ওই মুক্তি মোনার চাই-ই চাই। যে কারণেই হোক, বাবার সঙ্গে আফ্রিকায় এসেছিল মেয়েটা, কিন্তু দিনের পর দিন বন্দিনীর মত সময় কাটিয়ে হয়ে উঠেছে প্রায় উন্মাদিনী। পরিষ্কার বুঝে গেছে, দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মুক্তির স্বপ্ন। কয়েক মাস ধরেই মনোমালিন্য হচ্ছে তিন জেনারেলের ভেতর, কে আগে নিজের বিছানায় তুলবে মোনাকে। আপাতত একজন করে লোক রেখে পাহারার ব্যবস্থা করেছে তিন জেনারেল।

লোভী হবে না কেন তারা? অপূর্ব সুন্দরী মোনা, ম্যাডোনার রূপ তো পেয়েইছে, বাঙালি মেয়েদের সহজ-সুন্দর কমনীয়তাও। তরুণী, স্বাস্থ্যবতী। পুরো আফ্রিকা চুঁড়েও তো ওর মত কাউকে পাবে না জেনারেলরা! কাজেই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করবে না কেন? তাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করবে কে, কার এত সাহস!

এখানে এসে গত কয়েক দিনে রানা বুঝেছে, যে-কোনও সময়ে সশস্ত্র লোক এসে কিডন্যাপ করবে মোনাকে। প্রথমে পালা করে ধর্ষণ করবে, এরপর একসময় মেরে ফেলবে। একা কিছুই করতে পারবে না রানা, শত্রুদের ঠেকাতে গিয়ে মরতে হবে ওকে।

চুপ করে মোনাকে দেখছে রানা।

বড় করে দম নিচ্ছে বলে ফুলে উঠছে মেয়েটার সুডৌল বুক। বেচারি দমাতে চাইছে আতঙ্ক।

ছোট্ট কিচেনের সিঙ্কের সামনে থেমে কল খুলল মোনা। 'চারপাশে বন্যা, কাদাটে হয়ে গেছে খাবার পানি। সেদ্ধ করে বোতলে জমিয়ে রাখা উচিত। পালাবার সময় কাজে লাগবে। রানা, কালকে পালাতে পারব না আমরা?'

ওর পাশে থেমে কল বন্ধ করল রানা। নরম সুরে বলল, 'পরেও যথেষ্ট পানি পাব।' মোনার হাত ধরে সরিয়ে নিল ও।

অশ্রুভরা চোখে ওকে দেখল মোনা। গলা ভেঙে গেল, 'পালাতে পারব না, রানা। মেরে ফেলবে ওরা। তার আগে...'

ওর কণ্ঠে ভীষণ ভয় টের পাচ্ছে রানা। গত বেশ কয়েক দিন ধরে সুযোগ খুঁজছে ও, ডক্টর মোবারক আর মোনাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে কঙ্গো ছেড়ে। কিন্তু কাজটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। নানান কাজে ডক্টরকে আটকে রাখছে জেনারেলরা। একটু দূরের জঙ্গল থেকে চোখ রাখছে তাদের সশস্ত্র লোক।

মোনা ও ডক্টর মোবারক ভয় পেতে শুরু করেছেন, জেনারেলরা বুঝে যাবে, ওরা পালাতে চাইছে। তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অনেক বেশি খাটছেন বিজ্ঞানী। কোনও কাজ নেই বলে ছোট্ট এই বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছে রানা ও মোনা। বেশ কয়েকবার দেখেছে, ওদেরকে লক্ষ করছে একাধিক গার্ড।

গত কয়েক দিন বৃষ্টি ভেতর বাইরে বেরিয়ে রানা দেখেছে, জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মিলিটারি জিপ। নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে ওদের ওপর। কিন্তু যে-কোনও দিন ধৈর্য হারিয়ে বসবে জেনারেলরা। তখন আর বাঁচার উপায় থাকবে না ওদের।

আজ বিকেলে কাউকে দেখেনি রানা, হতে পারে পাহারা দিচ্ছে না কেউ। ল্যাবে কাজ করছেন ডক্টর। জেনারেলরা জানে,

আজ রাতেও তুমুল বৃষ্টি হবে। পালাতে পারবে না কেউ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ধুলোর পথ ভিজে হয়েছে পিচ্ছিল কাদার নালা। বাড়ি থেকে পানি সরাতে গভীর ড্রেন কেটেছে রানা, নইলে এতক্ষণে তলিয়ে যেত মেঝে।

'আজ কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়,' বলল রানা।

'কবে চলে যাব আমরা?'

'এখনও জানি না। বেশি দিন নেই। তবে আজ নয়।'

চোখ সরিয়ে একবার শিউরে উঠল মোনা। গাল বেয়ে দরদর করে পড়তে লাগল অশ্রু। আবারও হাঁপিয়ে উঠছে। ফুলে গেল বুক। ভীষণ ভয় লাগছে ওর। যে-কোনও সময়ে কেঁদে ফেলবে হু-হু করে। চেহারা দেখে মনে হলো কিছু বলবে, কিন্তু তা না করে কাউন্টার থেকে খপ করে তুলে নিল ওদের ফোর-হুইল-ড্রাইভের চাবি। ঘুরেই এক দৌড়ে স্ক্রিন-ডোর খুলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঝমঝম বৃষ্টির ভেতর নতুন করে ভিজে গেল মেয়েটা। ছুটে গিয়ে থামল জিপের ড্রাইভিং দরজার পাশে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির আওয়াজের ওপর দিয়ে বলল রানা, 'রাস্তা কর্দমাক্ত, মোনা। কোথাও যেতে পারব না আমরা।'

'ওরাও পারবে না!' পাল্টা চেঁচাল মোনা।

'বন্যার নদী পেরোতে পারব না,' বোঝাতে চাইল রানা। 'বড়জোর যেতে পারব অ্যাডজাণ্টার সেতু পর্যন্ত। ওরা ওখানে রেখেছে অন্তত এক শ'জন সৈনিক। পাগলামি কোরো না। অপেক্ষা করো। এই দফার বৃষ্টি থামলে তখন এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাব।'

'নিশ্চয়ই অন্য কোনও পথ থাকবে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'বলো, অন্য কোনও পথ থাকবে, রানা!' আবারও কেঁদে

ফেলল মোনা। যেন রানা চাইলেই তৈরি হবে পথ।

মোনা জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করার আগেই ওর কবজি ধরে ফেলল রানা। ঝটকা দিয়ে কবজি ছুটিয়ে নিল মোনা, ধুপ্ করে বসে পড়ল কাদার ভেতর। পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে জিপের গায়ে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ক্লান্ত, পুরোপুরি অসহায়।

'এভাবে বাঁচতে চাই না, রানা! দয়া করে মেরে ফেল! দয়া করো!'

'আর কয়েকটা দিন সহ্য করো,' মোনার পাশে বসল রানা।

'পারছি না, আর পারছি না।' বাচ্চা মেয়ের মত পিঠ দুলিয়ে কাঁদছে মোনা। 'বাবাকে ছাড়বে না ওরা। শেষে মেরেই ফেলবে আমাদের তিনজনকে। বাঁচব না কেউ।' দু'হাত কোলে রেখেছে মোনা। কাদার ভেতর পড়ে গেল জিপের চাবি।

মেয়েটার কথা খুব মিথ্যা নয়, ভাবল রানা। গত চারবার গোপনে চলে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফিরতে হয়েছে ঝড়-বৃষ্টির ভেতর। দু'বার ল্যাবে আটকা পড়েন ডক্টর মোবারক। তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেয়া হয়নি।

হাত ধরে মোনাকে দাঁড় করাল রানা, বুকে তুলে নিয়ে ফিরল বাড়ির ভেতর। ছেঁড়া পুতুলের মত নেতিয়ে গেছে মেয়েটা। একেবারেই জীবনী-শক্তিহীন। হারিয়ে ফেলেছে বাঁচার অর্থ।

'আমার চোখে তাকাও,' বলল রানা। বুকের সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে মোনাকে।

চোখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটা।

'প্রমিয করছি,' নরম সুরে বলল রানা। 'তোমার কোনও ক্ষতি হতে দেব না। বৃষ্টি থামলে ডক্টরকে ল্যাব থেকে তুলে নিয়ে চলে যাব বহু দূরে।'

রানার বুকে মাথা রেখে দুর্বল হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মোনা। শীত ও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে বেচারি। নীরবে কাঁদতে

লাগল।

কিচেনের কাউন্টারে ওকে নামাল রানা। সুন্দর মুখ থেকে সরিয়ে দিল ভেজা, কালো চুল। কয়েক ফুট দূরের দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে তোয়ালে, ওটা আনতে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। মৃদু হাসল। 'শুকনো তোয়ালে চাইলে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'আমি ছেড়ে দিতে চাই না,' সরাসরি রানার চোখে তাকাল মোনা, চোখে এখন ভয় নেই। রানাকে খুব কাছে পেয়ে নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করছে।

একটু থমকে গেল রানা।

ঝুঁকে এসে ওর ঠোঁটে চুমু দিল মোনা। রানা পিছিয়ে গেল না বলে দু'হাতে ওকে আরও কাছে টানল মেয়েটা। এবারের চুমু অনেক গাঢ় ও গভীর। কয়েক সেকেণ্ড পর সাড়া দিল রানাও। ভেজা পোশাকে তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ওদের দেহ।

মোনা সুন্দরী তরুণী, মানসিকভাবে পরিণত। ওর আগ্রহ দেখে কেটে গেল রানার সব দ্বিধা। মেয়েটাকে কাউন্টার থেকে মেঝেতে নামাল রানা। পরস্পরকে নিয়ে মগ্ন হয়ে উঠল ওরা। কোথায় উড়ে গেল সব ভয় ও দুশ্চিন্তা। ব্যস্ত হয়ে একে অপরের পোশাক খুলছে ওরা। রানার কানে ছোট্ট কামড় দিয়ে ফিসফিস করল মোনা, 'বাকি জীবন পাশে চাই তোমাকে।'

একটু চমকে গিয়ে বলল রানা, 'সম্ভব নয়। তাতে ক্ষতি হবে তোমার।'

'কীসের ক্ষতি?'

'আমি ভবঘুরে মানুষ।'

'আমিও তা-ই হব, অসুবিধে কী?'

'এখন যে আবেগ নিয়ে ভাবছ, পরে সেটা কষ্ট দেবে।'

'আমার মনে হয় না যে...' চুপ হয়ে গেল মোনা।

রানার নিষ্ঠুর ঠোঁট নামল তরুণীর লোভনীয় ঠোঁটে।

অনেকক্ষণের জন্যে থেমে গেল সময়। তারপর স্থির হয়ে গেল ওরা। তৃপ্তি নিয়ে রানার বুকে শুয়ে থাকল মোনা। তখনই ছড়াৎ শব্দে খুলল পুরনো স্ক্রিন-ডোর।

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা।

ঘরে এসে ঢুকেছে দু'জন লোক। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ। তাদের পরনে ফ্যাটিগ। সাদা লোকটার হাতে জিপের চাবি। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠে বলল সে, 'কিছু হারিয়ে ফেলেছ নাকি?'

উঠে কাউন্টারে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। একবার উলঙ্গ রানাকে আরেকবার মোনাকে কুঁতকুঁতে চোখে দেখছে দু'সৈনিক।

সামনে মস্ত বড় বিপদ, টের পেল রানা। মোনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাউন্টারে হাত রাখল। ওর আঙুল স্পর্শ করল ধারালো ছুরির বাঁট।

'অপরূপা, তোমার ওই ফর্সা পাছা সত্যিই দারুণ,' বলল শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকের দিকে ঘুরল। 'তুমিও ভাগ চাও?'

'তা আর বলতে?' খল-খল করে হাসল কালো লোকটা।

ওই একই সময়ে ছোরা হাতে লাফিয়ে সামনে বাড়ল রানা। রাইফেল হাতে ওর দিকে ঘুরছে শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু তখনই পাঁজরের হাড়ের মাঝ দিয়ে গিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করল ছুরির ফলা। রাইফেলের ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়তেই মেঝেতে বিঁধল বুলেট।

শ্বেতাঙ্গকে ঠেলে নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকের ওপর ফেলল রানা। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল ওরা তিনজন। মারাত্মক আহত লোকটার বুক থেকে ছুরি খুলেই কালো সৈনিকের ঘাড়ে কোপ বসাল রানা। কেটে গেছে মোটা শিরা, ছিটকে বেরোল রক্ত। কাত হয়ে গেছে কৃষ্ণাঙ্গের ঘাড়, উল্টে গেল চোখের মণি।

মারাত্মক আহত দু'শত্রুর ঘাড় মেঝেতে চেপে ধরেছে রানা। মাত্র দু'মিনিটে লাশ হয়ে গেল তারা। তখনই গর্জে উঠল পিস্তল।

ঘুরে দেখল রানা, এইমাত্র স্ক্রিন-ডোর পেরিয়ে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এক লোক, মৃত!

উঠে দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে তাকাল রানা। ওর পিস্তল এখন মোনার হাতে। থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি। কয়েক দিন আগে ডক্টর মোবারক আর মোনার সঙ্গে আলাপের সময় ওরা বলেছিল, মরে গেলেও কখনও কাউকে খুন করতে পারবে না। কিন্তু আজ উল্টো কাজই করেছে মোনা। প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে রানাকে।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের রাইফেল তুলে নিয়ে বাইরে উঁকি দিল উলঙ্গ রানা। উঠানের ওদিকে একটা হার্ডটপ জিপ। মনে হলো খালি।

আবারও কিচেনে এসে রানা দেখল, খুব কাঁপছে মোনা। হাতের পিস্তল এখনও তাক করে রেখেছে মৃত লোকটার দিকে।

'ঠিক আছে, আর ভয় নেই,' আস্তে করে মোনার হাত থেকে পিস্তল নিল রানা।

বার কয়েক চোখ পিটপিট করে রানাকে দেখল মোনা। তখনই গুড়-গুড়-কড়াৎ শব্দে খুব কাছেই পড়ল বাজ।

'পোশাক পরে নাও,' মেঝে থেকে তুলে মোনার হাতে ব্লাউয ও স্কার্ট ধরিয়ে দিল রানা।

নীরবে পোশাক পরতে লাগল মেয়েটা।

দ্রুত হাতে শার্ট ও প্যান্ট পরছে রানা। 'এবার আমাদেরকে চলে যেতেই হবে।'

বোকার মত জিজ্ঞেস করল মোনা, 'কেন? কোথায় যাব?'

'এই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল রানা

ভয়ের বদলে মোনার চোখে স্বস্তি। খুশি, ভয়ঙ্কর এ কারাগার থেকে মুক্তি পাবে। জীবনে আর কখনও ফিরবে না এখানে।

'যাওয়ার পথে ল্যাব থেকে তুলে নেব তোমার বাবাকে।'

ঊনচল্লিশ

ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল পরিশ্রান্ত এলেনা। আরব তরুণকে পালা করে চার ঘণ্টা করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে রানা আর ও। এবার আবারও রানার পালা। এদিকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে জন গ্রাহাম। তাকে দায়িত্ব দিয়েছে রানা, পরিচিতদের কাছ থেকে জরুরি তথ্য জোগাড় করতে। এমন কোনও খবর, যেটা এখনও জানে না বিসিআই বা এনআরআই।

মুখ খোলাবার জন্যে বন্দির মাথার একটু ওপরে শক্তিশালী, জ্বলন্ত বাল্ব্ রেখেছে ওরা। দু'হাত পেছনে বেঁধে কাঠের চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে তরুণকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তার ফাঁকে কামানের গোলার মত ছোঁড়া হচ্ছে নতুন সব প্রশ্ন। রানা বা এলেনা যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছে না, বন্দির কানে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে ভারী হেডফোন। তুমুল জোরে চলছে পশ্চিমা রক মিউযিক। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তরুণের মুখ থেকে বের করা যায়নি নতুন কোনও তথ্য। শুধু বারবার বলেছে একটাই নাম: মার্ডক। সে কাল্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা।

ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে দরজা না ভিড়িয়ে, তরুণকে দেখা যাবে এমন এক জায়গায় চেয়ারে বসল এলেনা। যে কাল্টের সঙ্গে জড়িত, সুযোগ পেলে আত্মহত্যা করবে এই ছেলে। হাত-পা

বেঁধে রেখেও উচিত হবে না ঝুঁকি নেয়া।

এলেনার জিজ্ঞাসাবাদের সময় কথা ছিল ঘুমিয়ে নেবে রানা কিন্তু এদিকের ঘরে এসে এলেনা দেখেছে, কিচেন টেবিলের ওপর ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তল রেখে চুপ করে বসে আছে রানা। এইমাত্র তুলে নিয়ে পিস্তলে ম্যাগাযিন ভরল। স্লাইড টেনে কক করল অস্ত্র। থমথম করছে বাঙালি গুপ্তচরের মুখ।

'আর দেরি করব না, টর্চার না করে উপায় নেই,' এলেনাকে বলল রানা।

পেরিয়ে গেছে পুরো ষোলো ঘণ্টা। কোনও কাজে আসেনি চার দফা জিজ্ঞাসাবাদ। পারতপক্ষে এলেনার সঙ্গে কথা বলছে না রানা। নিজেও ঘুমাতে যায়নি, ঘুমাতেও দেয়নি আরব বন্দিকে। নিজে দু'দফা ঘুমিয়ে নিয়েছে এলেনা। তবে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ভয় লাগছিল, যখন-তখন নির্যাতন করবে রানা ওই ছেলেকে।

এরপর কী করবে, তা নিয়ে আলাপ করেছে ওরা। শেষবার আলাপের পর থেকে প্রায় নীরব হয়ে গেছে বিসিআই এজেন্ট।

'আমি তো আর তোমার শত্রু নই,' বলল এলেনা।

মুখ তুলে ওকে দেখল রানা। 'তা জানি।' আরেকবার দেখে নিল ওয়ালথার।

একাকী বোধ করছে রানা, ভাবল এলেনা। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে যে-মেয়েকে উদ্ধার করল, সে-ই করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ-অফিসারের কাছে মেসেজ দিয়েছিলে,' বলল এলেনা।

'ও, তার মানে আমার ফোনে আড়ি পেতেছে এনআরআই?'

'এনআরআই চিফের উপায় ছিল না।'

বিরক্ত হলো রানা। 'জানতে চেয়েছি, কী ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার হয়েছে রুই দে জাখদান্সে। পুলিশ অফিসার বলেছিল, ছোট ক্যালিবারের। হতে পারে .২৫ বুলেট।'

'তাতে কী?'

'পার্শিয়ান উপসাগরে মিনা মোবারকের কেবিন ক্রুযারে মোনা বলেছিল, যেদিন কিডন্যাপ হলেন ওর বাবা, সেদিন ও প্যারিসেই ছিল। বাবাকে খুঁজছিল। কিন্তু তা না-ও হতে পারে।'

অবাক হয়ে রানাকে দেখল এলেনা। 'ভাবছ, ওই কাল্টের সঙ্গে মোনা জড়িত?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কে জানে? হয়তো আইফেল টাওয়ারে যে চারজন পুলিশের ডিউটি ছিল তাদের খুন করার জন্যে এই পিস্তলটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। তোমার মনে নেই, থানা থেকে কী বলেছিল? খুব ছোট ক্যালিবারের পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছিল ওদের।'

'কিন্তু...'

'বাপ-মেয়ের ঝগড়া চলছিল,' বলল রানা। 'মোনা বলেছিল, ওই কাল্টের লোকগুলোকে পথ দেখিয়ে ও-ই নেয় ওর বাবার কাছে। এসব করেছিল মিনতিকে সুস্থ করতে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ হবে ভেবেই হয়তো ভাইরাস বা রেযাল্ট ৯৫২ দিতে আপত্তি তোলেন ডক্টর মোবারক। তাঁর মেসেজে লিখেছিলেন: ভুলেও কাউকে বিশ্বাস করবেন না।'

'কিন্তু দুবাইয়ে মোনার ওপর ওই হামলা, ওটা তো সেক্ষেত্রে মিলছে না,' বলল এলেনা।

ইন্টারনেট বাটন টিপে টেবিলের ওদিকে মোবাইল ফোন ঠেলে দিল রানা। ঝুঁকে ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখল এলেনা।

ড্রাগস্ কর্পোরেশনের এমডি খুন হয়ে গেছেন। তাঁর খুনের সঙ্গে দুবাইয়ের গোলাগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে কর্তৃপক্ষ।

পোড়া এক গাড়ির ছবি দেখল এলেনা। ইনসেটে এমডির হাসিমুখ। ওই ছবি এসেছে মুর কর্পোরেশনের ফাইল থেকে।

'তো কী বুঝব?' বলল এলেনা, 'মোনাকে কিডন্যাপ করতে

চেয়েছিল ওই লোক। আর তাই তাকে মেরে ফেলেছে কাল্ট?'

'দুবাইয়ের লোকগুলো স্থানীয় ছিল না, ইকুইপমেন্ট অনেক আধুনিক, এসেছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলারের হেলিকপ্টারে করে,' মন্তব্য করল রানা।

'কামান ছিল না বটে, কিন্তু আউমেরও হেলিকপ্টার ছিল,' বলল এলেনা, 'রাশান গানশিপ। কাল্টের লোক বড়লোকও হতে পারে।'

'ফ্রান্সের কথা মনে আছে? লোকগুলোর একজনের কাছে ছিল ছোরা। আর দুবাইয়ের ওদের কাছে অটোমেটিক অস্ত্র।'

পোড়া গাড়ি দেখা শেষ, ওকে ফোন ফিরিয়ে দিল এলেনা।

'আমাদের কাছে মাটির ট্যাবলেটের পঁচাত্তর ভাগ রয়ে গেছে,' বলল রানা। 'আমাদের অংশে সোনার বল পেয়েছ?'

দু'টুকরো শুকিয়ে যাওয়া মাটি আবারও দেখল এলেনা।

ডানের ঢেলায় গোলাকার একটা অংশ। একসময় কিছু ছিল ওখানে। ওর মনে পড়ল মোনার কথা: 'এতই দামি ছিল, সরিয়ে ফেলে মোম দিয়ে মুড়িয়ে সোনার বলের ভেতর রাখত।' এলেনার অন্তর বলল, মাটির ট্যাবলেটের আসল অংশ সরিয়ে ফেলেছিল মোনা। মুখে বলল, 'তাড়া ছিল বলে চট্ করে একটা টুকরো তুলে নেয় মেয়েটা।'

'প্রথম সুযোগ নিয়েছে,' বলল রানা, 'পরে আমরা দু'জন।'

'তাতে প্রমাণ হবে না যে জেনেবুঝে সরিয়ে নিয়েছে।'

'তর্ক করে লাভ কী, আসল কথা ওটা এখন ওর কাছে,' বলল রানা, 'মাটির ট্যাবলেট ভালভাবেই দেখার সুযোগ পেয়েছিল।'

এলেনার মনে পড়ল, ট্যাবলেট ভাঙার পর এক মুহূর্ত অবাক হয়ে ভাঙা তিন টুকরোর একটি দেখেছিল মোনা। 'অন্ধকারে অত বুঝতে পারার কথা নয় মেয়েটার,' বলল এলেনা।

'এটিভির দিকে যাওয়ার সময় ধীর পায়ে হেঁটেছে,' বলল

রানা, 'মরুভূমিতে ওঠার পর পা দিয়ে ফেলে দিয়েছে খাদের নিচে নুড়ি পাথরের স্তূপ।'

এলেনার মনে হলো, ঘুমের অভাবে রেগে গিয়ে এসব বলছে রানা। অবশ্য, চুপ করে থাকল ও।

'আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম,' তিক্ত সুরে বলল রানা।

'ফ্রেঞ্চ পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী বুলেট .২৫ হলেও প্রমাণ হবে না যে মোনাই খুন করেছে,' বলল এলেনা।

আনমনে এক এক করে ওয়ালথারের ম্যাগাযিন খালি করেছে রানা, আবারও ক্লিপে বুলেট ভরল। সরাসরি ওর চোখ স্থির হলো এলেনার চোখে। 'বুঝতে পারছ কী করতে হবে? ওই আরব তরুণের কাছ থেকে বের করতে হবে, মোনা এখন কোথায় এবং কী করছে। সে আছে এখন ওই কাল্টের সঙ্গেই।'

'ওই মেয়ে এখনও ভালবাসে তোমাকে,' বলল এলেনা, 'তুমি নিজেও জীবনের ঝুঁকি নিতে দেরি করোনি।'

'ও জানত, ওকে ভুলেও গুলি করবে না কাল্টের লোক,' বলল রানা। আলোকিত হয়ে উঠেছে ওর মোবাইল ফোনের স্ক্রিন। কল নয়, টেক্সট্ মেসেজ।

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ অফিসার?' জানতে চাইল এলেনা।

'হুঁ।' মেসেজ পড়ল রানা। আরও গম্ভীর হয়ে গেল। '.২২ ক্যালিবারের। খুন করেনি মোনা। তার মানে, চাপের মুখে কাল্টের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে।' পাশের ঘরের দরজা দেখাল রানা। 'ওই ছোকরা জানে কোথায় আছে মোনা।'

এলেনা কিছু বলার আগেই পিস্তল তুলে নিল রানা, চেয়ার ছেড়ে চলল ইন্টারোগেশন রুমে।

এতক্ষণ সরাসরি রানাকে দেখতে পেয়েছে চেয়ারে বসা আরব তরুণ। বাঙালি যুবকের অগ্নিদৃষ্টি ভীষণ আতঙ্কিত করল তাকে। হয়তো এভাবেই মরণ হাতে এগিয়ে আসে যম!

চল্লিশ

অত্যাধুনিক জেনেটিক ল্যাবোরেটরির প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে মোনা। ঝকঝকে পরিষ্কার নতুন সব ইকুইপমেন্ট। এরচেয়ে বেশি কিছু কখনোই চাইনি, ভাবল ও।

কিন্তু এসব যন্ত্রপাতি দেখে মনে পড়ে গেল ওর বাবার স্মৃতি।

মোনার পিঠে রাইফেলের নলের খোঁচা দিল কাল্টের এক সদস্য। 'সামনে এগোও!'

হোঁচট খেয়ে ল্যাবে ঢুকল মোনা।

ঘরের মাঝে চেয়ারে বসে আছে এক লোক, মুখে হাসি। ঘাড়ে উলকি। বোধহয় ওটা দিয়ে ঢেকে নেয়া হয়েছে কোনও ক্ষত। উজ্জ্বল আলোয় চোখ যেন তার কালো বরফের মত শীতল।

'আমাদেরকে আপাতত বিরক্ত করবে না,' গার্ডকে বলল সে।

'কে আপনি?' জানতে চাইল মোনা।

'চিনলে না তোমার প্রভু বা কাউন্টকে?'

ও, এই লোকই কাল্টের নেতা, ভাবল মোনা। ফোনে কথা হয়েছে, কিন্তু আগে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ হয়নি।

'তুমি কারও প্রভু বা কোনও কাউন্ট নও,' বলল মোনা। 'তুমি উন্মাদ এক সাইকোপ্যাথ খুনি। তোমাকে বিশ্বাস করে এমন একদল বোকা লোকের জীবন নষ্ট করছ।' চেহারা দেখে ওর মনে হলো, লাফ দিয়ে উঠে গলা টিপে ধরবে লোকটা। কিন্তু সামান্য নড়ল না চেয়ারে।

'সবই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, তা-ই না?'

জবাব দিল না মোনা।

'তুমিই আসল বোকা,' বিরক্তি নিয়ে বলল লোকটা। 'তুমি বা তোমার মত মানুষই মস্তবড় ভুলের ভেতর আছ। রানা... এলেনা... রাহাত খান... জেমস ব্রায়ান... এরা সবাই।'

শেষ মানুষটার নাম কখনও শোনেনি মোনা। কিন্তু রানা আর এলেনার নাম শুনে কেঁপে উঠল ও। এই লোকের জানার কথা নয় যে ওই দু'জন অনেক সাহায্য করেছে ওকে। এসব কী করে জানল এই লোক?

চুপ করে থাকল মোনা।

'তুমি ভাবছ এসব করছি শুধু নিজের জন্যে?' বলল কাউন্ট। 'তা হলে ভুল ভাবছ।'

কথা বলতেও ভয় লাগছে মোনার। অন্তর বলছে, এসবের ভেতরে আরও গূঢ় কিছু আছে।

প্রসঙ্গ পাল্টাল প্রভু: 'তোমার বাবা ছিল আমার পায়ের নিচে। ওই একই কাজ করবে তুমি। এরপর একসময় তা-ই করবে পুরো পৃথিবীর সবাই।'

এ ধরনের বিপদ হবে ভেবেই সরে যাই বাবার কাছ থেকে, ভাবল মোনা। বাবা গোপনে লুকিয়ে পড়েছিলেন, আর মার্ভেল ড্রাগ্‌স্ কর্পোরেশনে ঠাঁই করে নেয় ও। ওর ধারণা ছিল, সবার সামনে হামলা করতে পারবে না কেউ। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ওকে ধরে এনে এখন বাঁকা হাসছে এই লোক। খুন করবে যখন-তখন।

হঠাৎ রাগ হলো মোনার। চারপাশ দেখল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই বেঞ্চি। ওটার ওপর পড়ে আছে হাতুড়ি।

ঝট্ করে হাতুড়ি তুলে নিল মোনা, সামনে বেড়ে লোকটার মাথার তালুর ওপর নামিয়ে আনতে গেল ওটা। কিন্তু তৈরি ছিল

লোকটা, খপ্ করে ধরে ফেলল ওর কবজি, জোরে একটা মোচড় দিতেই মেঝেতে পড়ল হাতুড়ি। কবজি ধরা অবস্থাতেই ওর বাহু নিয়ে গেল পিঠের ওপর।

ভীষণ ব্যথায় মোনার মনে হলো, ভেঙে যাচ্ছে হাড়। বেকায়দাভাবে বাঁকা হয়ে গেছে কনুই। কাঁধ থেকে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে হাত।

'উহ্!' অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল মোনা। এবার কাঁধ থেকে হাত ভেঙে ফেলবে ওই লোক। কিন্তু তা না করে উঠে দাঁড়াল সে, ঠেলে পিছিয়ে দিল মোনাকে, বাধ্য করল হাঁটুতে ভর করে মেঝেতে বসে পড়তে, তারপর এক ধাক্কায় চিত করে ফেলে দিল ওকে।

ভীষণ ভয় পেল মোনা। রেপ করতে চাইছে? ধড়মড় করে উঠে বসে পিছিয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু উপায় নেই। পেছনে টেবিলের দেয়াল।

এক পা সামনে বেড়ে মেঝে থেকে হাতুড়ি নিল কাউন্ট। অন্য হাতে টেনে তুলল মোনাকে। চাপা স্বরে বলল, 'এসো, দেখাই হাতুড়ি দিয়ে আরও ভাল কাজ করা যায়।'

মোনার হাত মুচড়ে ধরে আরেকটা টেবিলের সামনে নিল সে। টেবিলের ওপর মোনার ব্যাগ। ওটা থেকে বের করে রাখা হয়েছে মাটির ট্যাবলেটের অংশ। মোনা বুঝে গেল, কী চায় লোকটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। মনে মনে প্রার্থনা করল, ওর ধারণা যেন ভুল হয়।

কিন্তু ওকে ছেড়ে দিয়ে ভাঙা ট্যাবলেটের বুকে কার্বন স্টিলের বাটালি ধরল লোকটা। বাটালির মাথার ওপর নামল হাতুড়ি। মাত্র একবার, তাতেই শোনা গেল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আওয়াজ। দু'টুকরো হয়ে গেল মাটির ট্যাবলেট। লাফিয়ে উঠে টেবিলে স্থির হলো গলফ বলের অর্ধেক আকারের সোনার এক

বল। গায়ে পোড়া মাটি। তবুও দেখা গেল বলের ওপর কারুকাজ করা সোনার পাতা।

ওই বলের ভেতর রয়েছে জীবন-বৃক্ষের বীজ!

'যা খুশি করবে আর ওরা বসে থাকবে?' মোনা ভাবছে রানা ও এলেনার কথা। 'তোমার মতই ওই বীজ খুঁজছে ওরা।'

'আমার চেয়েও অনেক বেশি করে খুঁজছে,' হাসল কাউন্ট।

'তোমাকে খুঁজে বের করবে,' জোর দিয়ে বলল মোনা, 'আমাকে মেরে ফেললেও রক্ষা পাবে না।'

'তোমার কথা ঠিক,' ঠাট্টার সুরে বলল লোকটা। 'আমিও সেজন্যে অপেক্ষা করছি। বিশেষ করে রানার জন্যে।'

রানার নাম শুনে অস্বস্তির ভেতর পড়েছে মোনা। খুন করে ফেলার আগে ওকে দিয়ে কী করাবে এই লোক, সেটা ভাবতে গিয়ে কেন যেন ভীষণ ভয় লাগছে।

'তোমার কারণে সত্যিকারের বড়লোক হব,' মোনার চোখে তাকাল কাউন্ট। 'সত্যি বলতে, তোমার জন্যেই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী রাজা হয়ে উঠব পৃথিবীর বুকে। তার চেয়েও বড় কথা, তোমার জন্যেই ছুটে আসবে মাসুদ রানা। তখন আর রক্ষা নেই তার। আমার সর্বনাশের পেছনে রয়েছে ওই বাঙালি গুপ্তচর।'

দুর্বল বোধ করছে মোনা। মন বলছে, মস্তবড় পাপ করেছে। উচিত ছিল না রানাকে ফাঁকি দিয়ে বন্দি হওয়া।

আফ্রিকা থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল রানা। পরে ইরানের বালির ঢিবিতেও। অথচ, মানুষটার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও। আর এই লোক, ভয়ঙ্কর কিছু চেয়ে না পেয়ে খুন করেছে বাবাকে। এখন দাবি করছে ওর কাছে। নিজেকে দাবার ঘুঁটি মনে হচ্ছে মোনার। নিচু স্বরে বলল, 'জাহান্নামে যান!'

'নরক বলে কিছুই নেই,' বলল কাউন্ট, 'মানুষই তৈরি করে নরক।'

'ভাববেন না যা খুশি করবেন,' শক্ত হতে চাইল মোনা। 'আমাকে দিয়ে কিছুই আবিষ্কার করাতে পারবেন না। পৃথিবীর ক্ষতি করার আগে নিজেকে শেষ করে দেব আমি।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল কাউন্ট। তাতে প্রকট টিটকারি। 'তোমাকে কিছুই করব না। মরতেও দেব না। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থেকে সব দেখবে। সেটাই তো মজা।' বেল্টে গোঁজা রেডিয়ো নিয়ে শান্ত স্বরে বলল সে, 'ওদের নিয়ে এসো।'

মাত্র এক মিনিট পর খুলে গেল দরজা। দু'জনকে ঠেলে নিয়ে এল দু'জন সশস্ত্র লোক। সামনের দু'জনের একজন আকারে ছোট, অন্যজন স্বাভাবিক এবং বয়স্কা।

'হায়, আল্লা...' মাথা ঘুরে উঠতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে গেল মোনা। যদিও শেষ পর্যন্ত টেবিলের কিনারা ধরে সামলে নিল নিজেকে। তাকাল কাউন্টের দিকে। এই লোকই খুন করেছে ওর বাবাকে। এখন ধরে এনেছে মিনা ফুফু আর মিনতিকে।

বাচ্চা মেয়েটাকে কাউন্টের দিকে ঠেলে দিল নিষ্ঠুর চেহারার এক লোক। এখন মিনতির চোখে চশমা নেই। মনে হলো না ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছে বেচারি।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে বোনকে জড়িয়ে ধরল মোনা। মিনতির চোখ থেকে দরদর করে পড়ছে অশ্রু। গালে চড়ের লাল দাগ। মচকে গেছে ছোট্ট নাক। বুক ফেটে যেতে চাইল মোনার। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আপু, ঠিক আছে, কিচ্ছু হয়নি। কিচ্ছু হয়নি! একটু পর চলে যাব এখান থেকে!' ফুফুর দিকে তাকাল মোনা। কপাল কেটে গেছে মিনার, রক্ত পড়ছে। ফুলে উঠেছে থ্যাঁতলানো ঠোঁট। কাঁদতে শুরু করে কাউন্টের দিকে ফিরল মোনা। 'প্লিয... ওদেরকে কষ্ট দেবেন না!'

থরথর করে কাঁপছে ও, চোখ থেকে নামছে অশ্রু। ওর দু'হাতের মাঝে কাঁদছে ছোট্ট বোন মিনতিও। ফুঁপিয়ে উঠে অস্ফুট

স্বরে বলল, 'ওরা খুব মেরেছে ফুফুকে।'

'জানি, আপু, জানি। দেখো, আর মারবে না।' কাউন্টের দিকে তাকাল মোনা। লোকটা নিজেকে বলে প্রভু। সত্যিই এখন মনে হচ্ছে সে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী কোনও জমিদার। বুকের ভেতর মোনা বুঝে গেল, মিনতি আর ফুফুর জন্যে সব করতে পারে ও। কখনও ক্ষতি হতে দেবে না ওদের। দুর্বল স্বরে বলল ও, 'দয়া করে ছেড়ে দিন ওদেরকে। আপনি যা বলবেন, তা-ই করব। যা চাইবেন, তা-ই দেব।'

'তা জানি,' বলল কাউন্ট। 'আগেই বুঝিয়ে দিলাম, বাড়াবাড়ি করলে কী হবে। তবুও আরেকটু দেখিয়ে রাখি।' বেল্ট থেকে এক টানে পিস্তল বের করেই মিনা ফুফুর বুকের দিকে নল তাক করল সে।

'না!' আঁৎকে উঠল মোনা। বুকে জড়িয়ে ধরেছে মিনতিকে। দেখতে দেবে না কিছুই।

কামানের মত আওয়াজ তুলল শক্তিশালী পিস্তল। চোখ বুজে ফেলেছে মোনা। শুনল মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ল কেউ। আর কোনও আওয়াজ নেই।

'সিরামটা তৈরি করো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্রভু, 'তোমার বাবা যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেটা পূরণ করো। সেক্ষেত্রে ছেড়ে দেব তোমাদের দু'জনকে।'

অন্তরে মোনা জেনে গেল, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে লোকটা। কিন্তু কিছু বলবে, সে সাধ্য ওর নেই। কিশোরী বয়স থেকেই দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, আর পারছে না।

'কোনও চালাকির চেষ্টা করলে ভুল করবে,' বলল কাউন্ট। 'সেক্ষেত্রে বাঁচবে না তোমার বোন। মনে রেখো, সবার আগে তোমার বোনকে সিরাম দেব।'

মস্ত ভুল করেছে, বুঝতে পারছে মোনা। ওর কারণেই খুন

হবে রানাও। ওর উচিত ছিল না ইরানের বালির ঢিবিতে এটিভি থেকে নেমে যাওয়া। ভাল করেই জানত, ওকে গুলি করবে না লোকগুলো। ধরে নিয়ে যাবে কাল্টের নেতার কাছে। মনে একটু ভয় ছিল, কাজ শেষ হলে মেরে ফেলবে ওকে। কিন্তু তাতেই বা কী? নিজের বাবার খুনের দায় এড়াতে পারবে ও? তার চেয়ে সিরাম আবিষ্কার করতে গিয়ে মরে যাওয়াও মন্দ নয়। বোনের জন্যে গবেষণা করতে গিয়ে মরতে হচ্ছে ওকে।

বাবাকে খুন হতে দিয়ে যে ভুল করেছে, সেজন্যে এবার সঠিক কাজ করবে ভেবেছিল, ধ্বংস হতে দেবে না পৃথিবী। কিন্তু সব কেমন উল্টেপাল্টে গেল। এরা ফুফু আর মিনতিকে ধরে এনেছে, তাদের হাতে ৯৫২ টেস্টের রেযাল্ট। এদিকে ওর হাতে ভাল কোনও তাস নেই। তবুও জিজ্ঞেস করল, 'যদি আপনার হয়ে কাজ করতে না চাই?'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে আর তোমার বোনকে কষ্ট দিয়ে মারব, এরপর দেরি করব না ৯৫২ ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে।'

কথাটা শুনে মোনার মনে হলো, অনেক আগেই উচিত ছিল ওর মরে যাওয়া। মানুষ অদ্ভুত, কেন যেন অভিশাপ এল মনে রানার জন্যে। দুঃসাহসী বাঙালি গুপ্তচর, বাঁচিয়ে দিলে, তাই আজ সহ্য করতে হচ্ছে এই নরক যন্ত্রণা!

একচল্লিশ

কঠোর চেহারার লোকটাকে আসতে দেখছে জুবায়ের।

ঝড়ের বেগে ওর সামনে পৌঁছে গেল মাসুদ রানা, ঘাড় ধরে একটানে তুলে নিল চেয়ার থেকে। ছিটকে ফেলে দিল দেয়ালে। ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল জুবায়ের। পরের সেকেণ্ডে ওর পাশে বসে মুখ থেকে চড়াৎ শব্দে টেপ খুলল রানা। সিংহের গর্জনের মত গুড়গুড় করে উঠল ওর কণ্ঠ: 'হারামজাদা, বল মেয়েটাকে কোথায় নিয়েছে!' হ্যাঁচকা টানে জুবায়েরকে বসিয়ে দিল, পরক্ষণে তরুণের পেটে গেঁথে গেল ডানহাঁটু। বামহাতের ঘুষি ফাটিয়ে দিল ওপরের ঠোঁট। ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত।

'রানা! এসব বন্ধ করো!' দরজা থেকে ধমকে উঠল এলেনা। 'ঠিক হচ্ছে না এসব!'

মনে হলো না কিছু শুনতে পেয়েছে রানা। ঘাড় ধরে তরুণকে ফেলে দিল মেঝের ওপর। উঠে দাঁড়িয়েই কষে লাথি দিল পেটে। এক পায়ে ভর করে দাঁড়াল বুকের ওপর।

''রানা!' চেঁচিয়ে উঠল এলেনা। 'সরে এসো!'

'তুমি এখান থেকে যাও!' ধমক দিল রানা। দেয়ালের তাক থেকে প্লায়ার্স নিয়ে বসে পড়ল জুবায়েরের পাশে। এবার বুঝি এক এক করে ছিঁড়ে নেবে হাতের আঙুলগুলো।

ভয়ে পিরিচের আকার ধারণ করেছে জুবায়েরের চোখ।

না, পাশের দেয়ালের প্লাস্টিকের বোর্ডে প্লায়ার্স নামাল রানা। ভাঙা বোর্ড খসে পড়তেই সকেট থেকে এক টানে ছিঁড়ল মোটা দুটো বৈদ্যুতিক তার।

'রানা! তোমার ফোনে মেসেজ এসেছে! ওটা দেয়া হয়েছে আমার ফোন থেকে! কিন্তু আমি ওটা পাঠাইনি!'

শুনছে না রানা। গর্জে উঠল, 'তুই খুন করেছিস ওই মেয়ের বাবাকে!'

প্রথমবারের মত ইংরেজিতে জবাব দিল জুবায়ের। চোখে ভীষণ ভয়। 'আমি খুন করিনি!'

'মিথ্যা বলছিস!' গর্জে উঠল রানা। টান দিয়ে আরও বের করে নিল বৈদ্যুতিক তার।

'মিথ্যা বলিনি!' ভেঙে গেল জুবায়েরের কণ্ঠ: 'খুন করিনি, আমি তাকে দেখিইনি!'

উঠে দাঁড়াল রানা, বেল্ট থেকে পিস্তল নিয়ে রাখল পেছনের টেবিলে। চাপা স্বরে বলল, 'ওকে কোথায় নিচ্ছে তারা?'

চুপ করে থাকল জুবায়ের।

'কোথায়!'

জবাব দিচ্ছে না আরব তরুণ। কয়েক ইঞ্চি সামনে বেড়ে তামার তার দুটো ছোঁয়াল রানা তার দেহে। ফুলকি জ্বলে উঠতেই নিভু নিভু হলো ঘরের বাতি, আবারও জ্বলে উঠল। বিকট আর্তনাদ ছাড়ছে জুবায়ের।

নির্যাতনের ভয়ানক দৃশ্যটা দেখে গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে এলেনার। বুঝে গেছে, এরপর কী করবে রানা। কোনওভাবেই ওকে ঠেকাতে পারবে না।

'বল, কোথায় নিয়েছে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'এসব বন্ধ করো, রানা!' চিৎকার করে উঠল এলেনা।

'বল্, হারামজাদা!'

চুপ করে থাকল জুবায়ের। তখনই নতুন করে শক দিল রানা।

নিভু নিভু হয়ে আবারও জ্বলল ঘরের বাতি। করুণ আর্তনাদ বেরোল জুবায়েরের মুখ থেকে। বিদ্যুতের কারণে পুড়ে যাচ্ছে তার ত্বক। রোম ও চামড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

'খবরদার, রানা! এসব বন্ধ করো!' ধমক দিল এলেনা।

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' পাল্টা চেঁচাল রানা।

'রানা! প্লিয!' অনুরোধের সুরে বলল এলেনা।

পাত্তাও দিল না রানা, নতুন করে শক দিল জুবায়েরকে।

থরথর করে কাঁপছে তরুণ।

কয়েক পা সামনে বেড়ে টেবিল থেকে পিস্তল তুলে নিল এলেনা, হ্যামার কক করেই তাক করল রানার দিকে।

ধাতব ক্লিক আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল রানা।

ওর মতই এলেনার দিকে চেয়ে আছে জুবায়ের।

এলেনার দু'চোখ থেকে নামছে অশ্রু। চাপা স্বরে বলল, 'ওর কাছ থেকে সরে যাও, রানা!'

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পাগল হলে, এলেনা?'

'রানা, এভাবে কাউকে খুন করতে দেব না আমি,' বলল এলেনা। 'এভাবে কিছুই সম্ভব নয়!'

'তুমি জানো না এই ছোকরা...'

'কাউকে নির্যাতন করতে দেব না, ব্যস!' নিষ্কম্প হাতে রানার বুকে পিস্তল তাক করেছে এলেনা।

কালো হয়ে গেল রানার মুখ। বুঝে গেছে, এই মেয়েও গাদ্দারি করেছে। 'পারলে ঠেকাও আমাকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। ঘুরেই নতুন করে শক দিল জুবায়েরকে। ব্যথায় ছটফট করছে আরব তরুণ। মাথা ঠুকছে দেয়ালে।

'রানা!'

'যা জানিস বল্, হারামজাদা!' উন্মাদের মত চিৎকার করল রানা।

'রানা! খবরদার!'

আবারও জুবায়েরকে বৈদ্যুতিক শক দিল রানা। কিন্তু তখনই বদ্ধ ঘরের ভেতর তরুণের আর্তনাদকে চাপা দিল পিস্তলের বিকট আওয়াজ। ঝটকা খেয়ে কয়েক পা সামনে বেড়ে ধাতব চেয়ারে পড়ল রানা। হাত থেকে খসে গেছে দুই তার।

চেয়ার ভেঙে ধাতব আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে মেঝেতে

চিত হলো রানা। চোখে গভীর বিস্ময়, চেপে ধরেছে বুক। শার্ট ভিজে গেল লাল রক্তে। 'পাগল হলে, এলেনা?' ফিসফিস করে বলল মারাত্মক আহত রানা।

ওদিকে তাকাল না এলেনা, ইশারা করল জুবায়েরকে। 'উঠে বসো। আমার সঙ্গে না গেলে খুন হয়ে যাবে। যখন-তখন ফিরে আসবে ওর বন্ধু।'

রানার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছে জুবায়ের।

'জলদি!'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল জুবায়ের। পায়ের শেকলের জন্যে চট করে হাঁটতে পারবে না। এখনও বৈদ্যুতিক শকের কারণে বুকের ত্বক থেকে উঠছে কটু গন্ধী ধোঁয়া।

ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে রানার চেহারা। কনুইয়ে ভর করে উঠে বসতে গিয়েও আবার পড়ে গেল মেঝেতে। গলা থেকে বেরোল ঘড়ঘড়ে শব্দ। 'তুমি আমাকে গুলি করলে, এলেনা...'

দরজার দিকে পিছিয়ে গেল এলেনা। হাতের ইশারায় ডাকল জুবায়েরকে। তরুণ ঘর থেকে বেরোতেই দড়াম করে দরজা আটকে লক করে দিল এনআরআই এজেন্ট। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'এসো।' ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার দরজার পাশ থেকে কোট নিল, চাপিয়ে দিল জুবায়েরের হ্যাণ্ডকাফ পরা হাতের ওপর। ওরা চলে এল ল্যাণ্ডিঙে। 'এবার নামতে শুরু করো!'

আপত্তি তুলল না জুবায়ের, ধীর পায়ে নামছে। একবার শুনল, ভেতরের দরজায় আছড়ে পড়ল আহত গুপ্তচর।

'জলদি! ওর বন্ধু এলে খুন হয়ে যাব!' তাড়া দিল এলেনা।

পা টেনে নামতে লাগল জুবায়ের, পিছনে এলেনা। এখন রানার কথা ভাবার সময় নেই ওর। সামনে জরুরি অনেক কাজ!

বিয়াল্লিশ

এনআরআই সেফ হাউস থেকে পুরো দু'মাইল দূরে পরিত্যক্ত এক দালানে জুবায়ের প.শাকে নিয়ে এসেছে এলেনা রবার্টসন। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, একসময় মিলিটারির বড় গাড়ির জন্যে ডিপো ছিল এই দালান। কিন্তু ওপর থেকে গোলার আঘাতে ধসে গেছে ছাত। বালিতে জন্ম নিয়েছে মরুর কাঁটাগাছ।

সবচেয়ে নীরব জায়গা বেছে গাড়ি রেখেছে এলেনা। তার নির্দেশ শুনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল আরব তরুণ। তাকে ভাঙা এক অফিসে নিয়ে এল এনআরআই এজেন্ট। দেয়ালের পাশে পুড়ে যাওয়া এক কেবিনেট। বোঝার উপায় নেই, ওটা বোমার কারণে এমন হয়েছে, না আগুনের তাপে। বালিভরা মেঝেতে জুবায়েরকে বসতে ইশারা করল এলেনা।

রানা এক হাতের তালু ফুটো করে দিয়েছে বলে খুব সাবধানে মেঝেতে বসল জুবায়ের। প্রথমবারের মত মুখ খুলল, 'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ধন্যবাদ।'

'চুপ করো!' ধমক দিল এলেনা। তরুণের বুকে তাক করল ওয়ালথার। 'যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাজে কাজ করছ, তারা সবাই খুনি। ডক্টর মোবারক বা ফ্রেঞ্চ পুলিশদেরকে খুন না করে থাকলেও, যারা এসব করেছে, তাদের সঙ্গে ছিলে তুমি।'

'তা হলে আমাকে বাঁচালেন কেন?' মৃদু বিস্ময় নিয়ে বলল জুবায়ের।

'রানা তোমাকে খুন করলে নতুন কোনও তথ্য পেতাম না,' সরাসরি বলল এলেনা।

চুপ করে থাকল জুবায়ের।

'ওদেরকে আড়াল করছ কেন?' জানতে চাইল এলেনা।

'ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে,' বলল তরুণ, 'আমি এখন তাদের একজন।'

ভালভাবেই ইংরেজি বলতে পারে সে, তবে ফ্রেঞ্চ টানে।

'তুমি ওদের একজন হলে তোমাকে নিয়ে যেত,' মন্তব্য করল এলেনা।

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছে।'

'তেমন কিছু দেখিনি,' বলল এনআরআই এজেন্ট। 'সত্যি তারা এলে, তোমার মগজে একটা বুলেট গেঁথেই দায়িত্ব শেষ করবে। ওই একই কাজ করেছে তোমার বন্ধুদের বেলায়। ফ্রান্সে।'

যেন ঝাঁকি খেল তরুণ। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'ওদেরকে গুলি করেছেন আপনি!'

মাথা নাড়ল এলেনা। 'কথা ঠিক নয়। সুযোগ পেলেও তোমাকে খুন করিনি। বন্দি করে এনে ইন্টারোগেট করেছি। আমরা ওই খুনে কাল্টের লোকদের মত খুনি নই।'

কড়া চোখে এলেনাকে দেখল জুবায়ের। অবিশ্বাস করেছে প্রতিটা কথা।

'যারা তথ্য দিতে পারে, তাদেরকে কেন খুন করব?' মাথা নাড়ল এলেনা। 'তোমার বন্ধুদেরকে খুন করিনি। তবে সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। ওই একই কাজ করত ফ্রেঞ্চ পুলিশ। কিন্তু কাল্টের কেউ তাদেরকে মেরে ফেলেছে, যাতে মুখ খুলতে না পারে তারা।'

এলেনার চোখে চোখ রেখে রেগে উঠল তরুণ। বুঝতে

পারছে না মেয়েটা সত্যি না মিথ্যা বলছে। তবে ওর মন বলল, বোধহয় সত্য। চোখ সরিয়ে নিল সে।

'উদ্ধার করতে কেউ আসবে না,' বলল এলেনা, 'পরিত্যাগ করেছে ওরা তোমাকে। তুমি বাঁচলে না মরলে, তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। তোমাকে খরচের খাতায় তুলে দিয়েছে। ...নাম কী তোমার?'

'মামবা।'

মাথা নাড়ল এলেনা।

'নিশ্চয়ই ওরা ভেবেছিল আমি মরে গেছি,' বলল জুবায়ের।

'হাতে সময় ছিল, তুমি বেঁচে আছ না মরে গেছ, দেখতে পারত,' বলল এলেনা, 'চাইলে রানা, গ্রাহাম বা আমাকে খুনও করতে পারত, তারপর তোমাকে খুঁজে নিয়ে সরে যেতে পারত—তা করেনি। কোনও খোঁজ রাখেনি। বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা: ওরা ভুলে গেছে তোমাকে। সত্যিকার অর্থে আবারও একা হয়ে গেছ তুমি।'

আরও বেশি দ্বিধায় পড়ল জুবায়ের। 'আপনি নিজের বন্ধুকে গুলি করেছেন, আপনি নিজেও তো একা হয়ে গেলেন।'

ম্লান হাসল এলেনা। কখনও খুব কঠিন হয় পৃথিবী। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'যা করা উচিত ভেবেছি, তা-ই করেছি। তুমি জরুরি তথ্য না দিলে ওর বন্ধু গ্রাহামের হাতে তুলে দেব। তার মানেই, খুন হবে তুমি।'

কোনও জবাব দিল না জুবায়ের, দেখছে এলেনাকে। বুঝতে চাইছে, মেয়েটা কেমন ধরনের। আর যাই হোক, আবারও ওই অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চায় না ও। মাসুদ রানার ইংরেজ বন্ধু লাশটা পাওয়ার পর, ওকে পেলে জানে বাঁচতে দেবে না।

'আমি যদি মুখ খুলি, আমাকে কী করবেন আপনি?'

'ছেড়ে দেব। চলে যেতে পারবে নিজের পথে।' কিছুক্ষণ চুপ

করে থেকে জানতে চাইল এলেনা, 'পুলিশের লোকগুলোকে খুন করেছিলে?'

'না,' গর্বিত চেহারায় মাথা নাড়ল জুবায়ের, 'খুনি নই।'

'অথচ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে খুন করতে চাইছে, এমন একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছ— এর কী ব্যাখ্যা?'

চিন্তায় ডুবে গেল জুবায়ের। মনে হলো এলেনার কথাটা স্পর্শ করেছে ওর হৃদয়। একটু পর বলল, 'আমার ধারণা, আপনি চালাকি করে আমার কাছ থেকে সব জেনে নিতে চাইছেন।'

কথাটা পাত্তা না দিয়ে সহজ সুরে বলল এলেনা, 'ওরা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে ভয়ঙ্কর একটা ভাইরাস। কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরবে। দেশে দেশে হবে যুদ্ধ। ঘৃণা ও হিংসা থাকবে চারপাশে। ইচ্ছে করলে তুমি এসব ঠেকাতে পারো।'

'আমি? কী করে? সামান্য মানুষ। আজ আছি তো কাল নেই।'

'তুমি বলতে পারো, ওরা কোথায় নিয়েছে ওই মেয়েকে।'

চুপ করে থাকল জুবায়ের।

'ওই মেয়ে জানে কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই ভয়ঙ্কর ভাইরাস।'

দূরে চেয়ে রইল জুবায়ের।

'তোমার আসল নাম কী?' জানতে চাইল এলেনা। 'আসল নাম কারও মামবা হতে পারে না। তুমি আরব।'

'কী যায় আসে নাম দিয়ে?' বলল জুবায়ের। 'ফ্রান্সের লোক আমাদের বলে নোংরা আরব। থুতু ফেলে মুখে। নাগরিক হিসেবে আমি ফ্রেঞ্চ, কিন্তু ওরা দেখতে পারে না দু'চোখে। মাজা সোজা করে দাঁড়াতে গেলে দল বেঁধে বুক-পিঠ ভেঙে দেয়। মানুষ বলেই মনে করে না, আমরা মরে গেলেই যেন খুশি হবে।'

'আমরা বলতে কারা?' জানতে চাইল এলেনা।

'যারা আমার মত,' তিক্ত সুরে বলল জুবায়ের।

'তোমার বন্ধুদের কথা বলছ, যাদেরকে মেরে ফেলেছে কাল্টের লোক?'

'আমি আসলে... জানি না...' হ্যাণ্ডকাফ ধরে নাড়তে লাগল জুবায়ের। ফুলে গেছে নাকের পাটা। রাগ হচ্ছে ওর। 'ওরা খুন করবে কেন?'

'জানি না, কিন্তু তা-ই করেছে,' নরম সুরে বলল এলেনা। 'বলো, তুমি কোথা থেকে এসেছ? বললে তো ক্ষতি নেই।' এর আগে অন্তত এক শ'বার এই প্রশ্ন করেছে। জবাবও ওর জানা, কিন্তু তরুণের মুখ থেকে শুনতে চাইছে। একবার সত্য বললে সেই সুযোগ নিয়ে আরও তথ্য আদায় করবে। ব্যাপারটা নদীর বাঁধের মত। একবার ফাটল ধরলে হুড়মুড় করে ভাঙবে সব।

'লে কুখনেইভ,' একটু পর বলল মামবা ওরফে জুবায়ের।

'তোমার নাম?' নরম সুরে বলল এলেনা, 'সত্যিকারের?'

চোখ সরিয়ে দূরে তাকাল তরুণ।

'সত্যি বললে ভাল কোনও দেশে তোমাকে পাঠিয়ে দেব,' বলল এলেনা। 'নামটা কী তোমার?'

'জানতে চাইছেন কেন?'

'কারণ, আমার লোক আসার আগেই তোমার লোক এলে খুন হবে, তখন আর কাউকে কিছু জানাতে পারবে না।'

'প্রভু আমার নাম দিয়েছেন মামবা।'

'মা আমার নাম রেখেছে এলেনা। তোমার নাম কে রেখেছিল— বাবা না মা?'

বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে আছে তরুণ। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর আবারও মেঝে দেখল। 'আমার নাম বাবা-মা রেখেছিলেন জুবায়ের পাশা। আমার নানার নামে।'

'তোমার বাবা-মা আদর করতেন না?' জানতে চাইল

এলেনা।

'নিশ্চয়ই,' গলা সামান্য চড়ে গেল জুবায়েরের। 'আমিও ভালবাসি তাঁদেরকে। আমার বাবা আর নেই, মা আছেন। আমি আমার পরিবারের সবাইকে ভালবাসি।'

এবার আলাপের সুযোগ হয়েছে, বুঝল এলেনা। 'তুমি কি জানো না কাল্টের লোক কী করছে? কীভাবে সর্বনাশ করবে পৃথিবীর? আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। যাদেরকে ভালবাসো, সবার সর্বনাশ হবে। সবাই মিলে কষ্টের ভেতর পড়ব।'

'আমাদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার জবাব দেব আমরা,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল জুবায়ের।

'অন্যায় ঠেকানো, আর নিজেরা অন্যায় করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা,' বলল এলেনা, 'আসলে বিশ্বে সত্যি বিচার নেই। বরাবরের মতই, ধনী হবে আরও বড়লোক, সাধারণ মানুষ হবে আরও গরীব। অনেক বেশি কষ্টে পড়বে তারা। পেট পুরে খেতে পাবে না। থাকবে না মাথার ওপর ছাত। চারপাশে শুরু হবে যুদ্ধ ও ধ্বংসের মাতম। সেসবই ডেকে আনছে তোমার ওই কাল্ট।'

মাথা নাড়ল জুবায়ের। 'না, আমাদেরকে ভয় পাবে ধনীরা।'

'হ্যাঁ, ভয় পাবে,' সায় দিল এলেনা, 'তাই হামলার জন্যে আর্মিকে টাকা দেবে ওরা। তোমার পরিবার পড়বে কঠিন কষ্টের ভেতর। পৃথিবী জুড়ে মানুষ দেখবে সত্যিকারের দুঃস্বপ্ন। চাকরি হারাবে পরিবারের সবাই। লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। এসবই হবে তোমার কারণে। তাদের কপাল পুড়িয়ে দিচ্ছ তুমি।'

'এসব কিছুই হবে না,' রেগে গিয়ে বলল জুবায়ের।

'তা-ই হবে,' নরম সুরে বলল এলেনা, 'তুমিও জানো।'

'আর আপনাকে সাহায্য করলে ভবিষ্যতে কী পরিবর্তন হবে এই দুনিয়ার?' জুবায়েরের কথা থেকে ঝরল তিক্ত বিষ।

ছেলেটা মিথ্যা বলছে না, ভাবল এলেনা। সত্যিই তো, কী

পাবে গরীব মানুষ! 'অন্তত কোটি কোটি মানুষ খুন হবে না,' বলল ও।

'ভালভাবে বাঁচার অধিকার পাবে আমার পরিবার?'

'সে-কথা দিতে পারব না,' বলল এলেনা, 'কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে না, এটা জানি। নিজের ছেলেকে ফিরে পাবে তোমার মা।'

'আপনাকে কিছুই বলব না,' বলল জুবায়ের।

'অন্যায় গোপন করে কিছুই লাভ হবে না তোমার,' বলল এলেনা। বিরক্ত হয়ে গেছে। 'বড়লোক বা অমর হবে না, পাবে না খ্যাতি। আসলে পাবে চরম শাস্তি।'

'স্রষ্টা নেই যে শাস্তি দেবে,' বলল জুবায়ের।

'তুমি না মানলেও অনেকে বিশ্বাস করে তিনি আছেন,' বলল এলেনা, 'তাঁর ওপর রাগতে গেলেও অলৌকিক অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্রষ্টাকে ঘৃণা করো, কারণ তোমাকে তেমন কিছুই দেননি। তার মানেই মেনে নিয়েছ, তিনি আছেন।'

'আমার রাগ নেই তার ওপর, কারণ সে তো নেই,' বলল জুবায়ের। চোখ সরিয়ে নিল।

এলেনা বুঝল, নীরব থাকলে আবারও শামুকের খোলসের ভেতর ঢুকে পড়বে তরুণ। মামবা নামের আড়াল নিয়ে রক্ষা করবে নিজেকে। হাতে সময় নেই, অথচ এর মুখ থেকে জরুরি তথ্য জোগাড় করা খুবই জরুরি।

'স্রষ্টা থাকুক বা না থাকুক, তুমি পৌঁছে গেছ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে,' বলল এলেনা। 'আমাদেরকে খুঁজে নেবে আমার বন্ধুরা। তখন শেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলবে গভীর অন্ধকার কূপে। ওখানে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। ওটাই হয়তো সত্যিকারের নরক। মিথ্যা বলব না, সে সময়ে যে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হবে, তার তুলনা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। এক এক করে পেট থেকে বের

করে নেয়া হবে সব তথ্য। শেষে মেরে ফেলা হবে।'

'কিন্তু একটা কথাও বেরোবে না আমার মুখ থেকে।'

'ভুল বললে,' বলল এলেনা। 'আমাকে না বললেও ওদেরকে সবই বলবে। একটা একটা করে হাত-পায়ের হাড় ভাঙবে ওরা। শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে চিরকালের জন্যে পঙ্গু। হয়তো তখন খুন করবে না তোমাকে। মরে যেতে চাইলেও মরতে পারবে না। ওটাই হবে সত্যিকারের কষ্টের জীবন।'

মুখ তুলে এলেনাকে দেখল জুবায়ের। বিষণ্ন সুরে বলল, 'আর কিছু বলবেন?'

'মিথ্যা বলছি না, আমি চাই তুমি রক্ষা পাও,' বলল এলেনা।

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিল জুবায়ের। ঘুমের অভাবে ও মারধর খেয়ে খুব দুর্বল বোধ করছে সে।

এবার বুঝি মুখ খুলবে ছেলেটা, ভাবল এলেনা। আস্তে করে বলল, 'প্রিয়, জুবায়ের।'

মেঝে থেকে চোখ তুলল না তরুণ।

'প্রিয়, জুবায়ের।'

জুবায়েরের চোখ মেঝেতে। মনে হলো একটা ঘোরের ভেতর আছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ওখানে একটা দ্বীপ আছে।'

'কোথায় সেই দ্বীপ?'

'ইরান উপসাগরে,' মেঝে দেখছে জুবায়ের। মাথা কাত করে দেখিয়ে দিল পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ দিক। 'কয়েকটা দালানে বোমা পড়েছিল। তীরের কাছে মালটানা জাহাজও আছে। পাথরে আটকা পড়েছে। ওই মেয়েকে ওখানে নিয়ে গেছে ওরা।' মুখ না তুলে দুলছে জুবায়ের। 'ওখানে নিয়েছে আপনাদের বান্ধবীকে।'

'ওই দ্বীপের নাম বলতে পারো?'

'নাম জানি না।'

'নামটা মনে করার চেষ্টা করো, জুবায়ের,' বলল এলেনা।

'আমরা হয়তো তাদেরকে ঠেকিয়ে দিতে পারব।'

'হয়তো পারবেন,' বিড়বিড় করল জুবায়ের, 'বোটে গেলে ওখানে যেতে লাগে বড়জোর এক ঘণ্টা। কিন্তু কোনও নাম শুনিনি ওই দ্বীপের। অনেক পাখি আছে ওখানে।'

বড় করে শ্বাস নিল এলেনা, ওর অন্তর বলল, সত্যি কথাই বলেছে জুবায়ের। বোমা পড়া এক দ্বীপ। পারস্য উপসাগরে। ওখানে পাথরে আটকা পড়েছে ফ্রেইটার। স্যাটালাইট ওদিক দিয়ে গেলেই চোখে পড়বে ওই দ্বীপ। জায়গাটা খুঁজে পেলেই হামলা করবে ওরা, ঠেকিয়ে দেবে ওই কাল্টকে।

'ওদের কাছে মিসাইল আছে,' বলল জুবায়ের, 'নিজ চোখে দেখেছি। ওগুলো দিয়ে ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে।'

শীতল স্রোত নামল এলেনার মেরুদণ্ড বেয়ে। মিসাইল পেলে আর কী চাই কাল্টের! এরই ভেতর পেরিয়ে গেছে সতেরো ঘণ্টা। এখনও হয়তো ঠেকিয়ে দেয়ার সামান্য সুযোগ আছে। 'অনেক ধন্যবাদ, জুবায়ের,' বলল এলেনা।

জবাব দিল না তরুণ। চুপ করে দেখছে মেঝে। গাল বেয়ে টপটপ করে পড়ছে অশ্রু। 'অনেক খারাপ কাজ করে ফেলেছি,' ভাঙা গলায় বলল।

'আমরা তো মানুষ, ভুল তো করিই,' বলল এলেনা।

মুখ তুলে তাকাল জুবায়ের। 'আমি তাদের ভেতর সবচেয়ে খারাপ শ্রেণীর— গাদ্দার। দয়া করে আমাকে খুন করে রেখে যান।'

বিশ বছর বয়স হয়নি জুবায়েরের, যত খারাপ কাজই করুক, ওর জন্যে বুকে কষ্ট লাগছে এলেনার। যারা ধর্মের নামে মানুষকে খুন করছে বা যা খুশি করে বেড়াচ্ছে, তাদের মতই ওই কাল্টের নেতারা, তাদের শিকার হয়েছে বেচারা জুবায়ের।

'মৃত্যু চাওয়া উচিত নয় তোমার,' বলল এলেনা।

‘খুন করার আগে টিটকারি দেবে, অনেক অত্যাচার করবে,’ দুর্বল স্বরে বলল জুবায়ের।

হাত বাড়িয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিল এলেনা।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তরুণ। ভেঙে গেছে বুক। মুখ তুলে দেখল এলেনাকে। গাল ভেসে যাচ্ছে অশ্রুর স্রোতে। বিড়বিড় করে বলল, ‘ওরা বলবে, আমি গাদ্দার। সত্যিই তা-ই। সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে ওদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলাম, আবার ওদের সঙ্গেও গাদ্দারি করেছি।’

‘এসব ভুল কথা,’ বলল এলেনা।

‘তা-ই বলবে ওরা,’ জোর দিয়ে বলল জুবায়ের।

‘না,’ মাথা নাড়ল এলেনা, ‘ভালরা বলবে, ওই যে দেখো জুবায়ের পাশাকে। সে সবচেয়ে কালো আঁধারে ইবলিশকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, নইলে আজ ধ্বংস হতো পৃথিবী। নইলে আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম না।’

বিস্ফারিত চোখে এলেনাকে দেখল জুবায়ের, চোখে সামান্য আশার আলো। এখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কিন্তু থেমে গেছে প্রলাপ।

পেরিয়ে গেল মিনিট দশেক। বন্ধ হলো কান্না। জুবায়েরের হাতে এখনও হ্যাণ্ডকাফ, কিন্তু ওকে আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিল এলেনা। হাত বুলিয়ে দিল ওর কপালে। একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত তরুণ।

ছোট্ট ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এলেনা। পরে এনআরআই-এর এজেন্টরা এসে সরিয়ে নেবে জুবায়েরকে। বসের সঙ্গে আলাপ করবে ও, যেন ছেলেটাকে ছোটখাটো কোনও চাকরি দেয়া হয় আমেরিকায়।

নিজের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল এলেনা।

গাড়ির পাশে আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।

'বলল কিছু?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল এলেনা, খুব ক্লান্ত। 'তোমাকে গুলি করতে হয়েছে ভাবতে গেলে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কাজ তো হলো?' হাসল রানা। 'কিন্তু কখনও রায়ট পুলিশ বলতে এলে যে রাবারের বুলেটে তেমন ব্যথা লাগে না, দেরি না করে ছিঁড়ে নেব তার কান!'

'লাল রঙের কমবিনেশন দারুণ ছিল।'

'ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারীর রোল করতে গিয়ে আরেকটু হলে বুক থেকে ব্যাগটাই পড়ে যেত,' বলল রানা।

'যার শেষ ভাল, তার সবই ঠিক,' মৃদু হাসল এলেনা। 'এবার এনআরআই এজেন্ট সরিয়ে নেবে জুবায়েরকে। পরে পাঠিয়ে দেবে ওকে আমেরিকায়। ওর মাকেও। যার ভেতর দিয়ে গেল, চাই না এরপর ওদের কষ্ট আরও বাড়ুক।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'আমারও মনে হয়েছে, ছেলে হিসেবে খারাপ নয় ও। সবারই ভুল হয়। কম আর বেশি।'

রানার চোখে চোখ রাখল এলেনা। বাঙালি গুপ্তচরের অদ্ভুত গুণ, কাউকে ছোট করে দেখে না। প্রয়োজনে যেমন কঠোর হতে জানে, তেমনি মানুষের উপকারে লাগতেও দেরি করে না। ফিসফিস করে বলল এলেনা, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, রানা!'

তেতাল্লিশ

শেষ বিকেলের লালচে আলোয় পারস্য উপসাগরের বুক চিরে ছুটে

চলেছে খয়েরি পাওয়ার বোট। পেছনে বসে আছে রানা, কোলে ল্যাপটপ কমপিউটার। ওটার ভেতর ডাউনলোড করা হয়েছে এনআরআই মেইনফ্রেম কমপিউটার থেকে জরুরি সব তথ্য। দ্রুতগামী নৌযান নিয়ন্ত্রণ করছে গ্রাহাম। বামের সিটে এলেনা। ওদের পরনে এখন বডি আর্মার, পাশে এআর-১৫এস রাইফেল।

কমপিউটার থেকে চোখ তুলে আবছাভাবে এক মাইল দূরে ক্রুড ক্যারিয়ার শিপ দেখল রানা, ওদের দিকেই আসছে ওটা। পানির ওপরে অনেক উঁচু লাগল, তার মানে পেটের ট্যাঙ্ক খালি।

'চ্যানেল থেকে দূরে থেকো, জন,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল গ্রাহাম।

'কী বুঝছ, রানা?' জানতে চাইল এলেনা।

ওর দিকে ল্যাপটপ এগিয়ে দিল রানা। স্ক্রিনে এবড়োখেবড়ো এক পাথুরে দ্বীপ।

'নাসা স্যাটালাইট ইমেজ?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

মাথা দোলাল রানা। 'সকালে ওই দ্বীপের ওপর দিয়ে গেছে। ভাল ছবি নয়। যেসব তথ্য চেয়েছি, একটাও দিতে পারেনি।'

দ্বীপের দিকে যুম করল এলেনা।

পাথরের ওই টুকরো দৈর্ঘ্যে ও প্রশস্তে বড়জোর আট মাইল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাইপ ও পাম্পিং ইকুইপমেণ্ট। দূরে কয়েকটা কণ্ট্রোল বিল্ডিং ও হেলিকপ্টার ল্যাণ্ডিং প্ল্যাটফর্ম। ছবিতে মনে হচ্ছে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে সব। দ্বীপের পশ্চিমে চার শ' ফুটি এক ফ্রেইটার, নোঙর করেছে না বালি-পাথরে আটকা পড়েছে, বোঝা গেল না।

'জুবায়েরের বলা সেই দ্বীপই,' মন্তব্য করল এলেনা।

'পরিত্যক্ত,' বলল রানা।

'জুবায়েরও তাই বলেছিল,' বলল এলেনা, 'কিন্তু এমন হতে পারে, মোনাকে নিয়ে ওখান থেকে সরে গেছে তারা।'

‘ইনফ্রারেড স্ক্যান করতে বলেছ?’ জানতে চাইল রানা।

‘এবার সুযোগ ছিল না,’ চট্ করে হাতঘড়ি দেখল এলেনা। ‘পরেরবার যাওয়ার সময় স্ক্যান করবে। ধরো দু’ মিনিট পর। তখন কেউ আছে কি না জেনে যাব।’

তিরিশ সেকেণ্ড পর স্যাটালাইট ফোনের বাতি জ্বলে উঠতেই স্পিকার চালু করে জবাব দিল ও: ‘হ্যালো?’

হাওয়ার দমকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনল না। মুখ সরিয়ে নেয়ার পর কানে এল কণ্ঠ: ‘এলেনা?’

‘বলুন, চিফ।’

‘তোমরা এখন কোথায়?’

‘উপসাগরে, দক্ষিণে চলেছি। নতুন কোনও ইনফর্মেশন পেয়েছেন?’

‘হ্যাঁ,’ বললেন ব্রায়ান। ‘এনএসএ থেকে বলেছে, ওই আটকা পড়া জাহাজ বা আশপাশের দালানে তাপ ও বৈদ্যুতিক বাতি আছে, কেউ না কেউ আছে ওই দ্বীপে।’

তাই তো থাকার কথা, ভাবল রানা। এটা দুঃসংবাদ নয়।

‘তার মানে আমরা ঠিক জায়গায় যাচ্ছি,’ বলল এলেনা।

‘তাই তো মনে হচ্ছে,’ বললেন ব্রায়ান। চুপ হয়ে গেলেন।

রানা আর এলেনা পরস্পরকে দেখল। এবার বোধহয় খারাপ কোনও সংবাদ দেবেন এনআরআই চিফ।

‘অ্যাসল্ট টিমের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে আমাদের?’ জানতে চাইল এলেনা।

‘ইয়ে... এলেনা...’ আবারও চুপ হয়ে গেলেন ব্রায়ান।

‘তারা পরে পৌঁছলেও আমাদের ক্ষতি নেই,’ বলল এলেনা, ‘নাকি একই সঙ্গে হামলা করব আমরা? তা-ই ভাল হতো না? ওদেরকে বলে দিতে পারতাম...’

‘এলেনা।’ কাশলেন ব্রায়ান। ‘ওখানে কোনও অ্যাসল্ট টিম

যাচ্ছে না।'

অদ্ভুত কথা! এক ঘণ্টা আগে প্রস্তুতি নিচ্ছিল অ্যাসল্ট টিম।

'কী বলছেন, স্যর?'

'আমরা ওখানে কোনও দলকে পাঠাব না।'

'কেন?' গলা চড়ে গেল এলেনার।

'ভুলে গেলে? ওই পাথুরে দ্বীপ ইরানের জলসীমায়,' বললেন ব্রায়ান। 'অনেক দিন ধরেই ওটা নিয়ে বিরোধ চলছে ইরাক ও ইরানের ভেতর। ওখানে যে ক্ষতি দেখছ, সেটা হয়েছে উনিশ শ' ছিয়াশি সালে। তারপর থেকে ওখানে আর পা রাখেনি কেউ।'

'তাতে কী? আমাদের কাজ কাল্টের ওপর হামলা করা।'

'ইরান সরকারকে জানাতে পারব না, তাদের নাগালের ভেতর আছে ম্যাস ডেস্ট্রাকশন ওয়েপন। ওটা আছে ওদের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।'

'তা হলে কী করব?' অসহায় সুরে জানতে চাইল এলেনা। 'অ্যাসল্ট টিম না পাঠালে...'

'আমেরিকান নেভি ওখানে টমাহক মিসাইল ফেলবে,' অস্বস্তি নিয়ে বললেন ব্রায়ান। 'এটাই প্রেসিডেন্টের নির্দেশ।'

বড় করে দম নিল এলেনা। 'কিন্তু যারা জিম্মি? তাদের কী হবে?'

'সরি,' বললেন ব্রায়ান, 'আর সব কিছুর সঙ্গে হারিয়ে যাবে তারাও। আমার কিছু করার নেই, এলেনা। সত্যিই দুঃখিত।'

থমথম করছে রানার মুখ, ওর দিকে তাকাল এলেনা। প্রতিটা কথা শুনেছে রানা। রেগে ওঠেনি, যেন এমনটাই ভেবেছিল।

মন খারাপ হয়ে গেল এলেনার।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মানুষের জীবনের মূল্য দিচ্ছেন না। যুক্তি সহজ, মাত্র ক'জনের জন্যে কোটি কোটি মানুষের বিপদ ডেকে আনা ঠিক নয়। ওই দ্বীপ উড়িয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

'চিফ, ওই কাল্টের লোক ওখানে না থাকলে?' জানতে চাইল এলেনা। 'যদি সাধারণ মানুষ থাকে? আমরা ধরে নেব পৃথিবী রক্ষা করেছি মিসাইল মেরে, কিন্তু কয়েক দিন পর যদি বুঝি বিরাট ভুল করেছি— তখন?'

'পরেরটা পরে দেখবেন প্রেসিডেন্ট।'

'দ্বীপ উড়িয়ে দেয়ার পর? যখন থাকবে না কোনও প্রমাণ?' রেগে গেল এলেনা। 'আমরা চাইলেও পরে ইরানিয়ানদের দ্বীপে পা রাখতে পারব না।'

'ছয় মাস ধরে ওখানে আছে ওই ফ্রেইটার,' বললেন ব্রায়ান। 'ট্র্যাক করে দেখা গেছে, বাতিল মাল হিসেবে ওটা কেনা হয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে। এত দিনে গলিয়ে ফেলার কথা। হয়তো শীঘ্রিই কাজে হাত দেবে। জাহাজটা গেঁথে রয়েছে ওই দ্বীপের পাথুরে তীরে। ওখানেই আস্তানা গেড়েছে ওই কাল্ট। তাই প্রেসিডেন্ট কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি।'

একবার রানাকে দেখে নিয়ে ফোনে বলল এলেনা, 'অনেক ভাল কাজে আসবে ডক্টর মোবারকের ওই ভাইরাস। ট্রিটমেন্ট করা যাবে নানান অসুখের। অথচ থিয়োরেটিকালি সেসব এখনও সম্ভব নয়। আমরা যদি ধ্বংস করে দিই ওই জাহাজ, এত গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ হারাব চিরতরে।'

'দুনিয়া জুড়ে বিশৃঙ্খলা হওয়ার চেয়ে ভাল,' বললেন ব্রায়ান।

'সত্যি যদি অন্য কোনও বেস থাকে কাল্টের?' জানতে চাইল এলেনা।

চুপ করে থাকলেন এনআরআই চিফ।

'কোনও না কোনও কারণ আছে বলেই আজও নিজেদের হাতে অ্যানথ্রাক্স, স্মলপক্স বা এ ধরনের ভাইরাস রেখে দিচ্ছে সিডিসি,' যুক্তি দিল এলেনা, 'সেভাবেই ওই জাহাজ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত ৯৫২ ভাইরাস আর জীবন-বৃক্ষের বীজ। পরে

গবেষণার সুযোগ পাব আমরা। নইলে ভবিষ্যতে ওই ধরনের ভাইরাসের হামলা হলে মোটেও তৈরি থাকবে না বিজ্ঞানীরা।'

'জানি, এলেনা,' ক্লান্ত সুরে বললেন ব্রায়ান। 'গত এক ঘণ্টা ধরে বোঝাতে চেয়েছি প্রেসিডেন্টকে। কিন্তু একটা কারণে তাঁকে বা তাঁর স্টাফদেরকে ফেরাতে পারিনি— কাল্টের হাতে আছে মিসাইল। শর্ট রেঞ্জ হলেও ওগুলো পড়বে কুয়েত, দক্ষিণ ইরাক বা উপসাগরের রেড যোন-এ। মাত্র একটা মিসাইল ছড়িয়ে দিতে পারে ভাইরাস।'

চুপ করে থাকল এলেনা। রানার গম্ভীর মুখ দেখে মায়া হলো ওর। আসলে কিছুই করার নেই! মিসাইলের হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারবে না ওরা।

'মিস্টার রানা আর তুমি অনেক করলে,' বললেন ব্রায়ান, 'তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিতে বলেছেন প্রেসিডেন্ট। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের কিছুই করার নেই। এবার সরে চলে এসো তোমরা নিরাপদ এলাকায়।'

'আর কিছু বলবেন?' জানতে চাইল এলেনা।

'মিস্টার রানাকে বলো, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'জানিয়ে দেব,' মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল এলেনা। রানার দিকে তাকাল। 'আমার কিছু করার নেই, রানা।'

'আমাকে দ্বীপের কাছে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেয়ো,' সহজ সুরে বলল রানা।

'তুমি যাবেই?' মন দমে গেল এলেনার।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'তা হলে আমিও যাব,' জানিয়ে দিল এলেনা।

'উচিত হবে না,' বলল রানা, 'এবারের লড়াই তোমার নয়।'

'তোমার লড়াই তো আমারও,' আপত্তি তুলল এলেনা।

'অনেক বেশি ঝুঁকি, এলেনা।' গ্রাহামের দিকে ফিরল রানা।

'তীরের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে সরে যাবে এলেনাকে নিয়ে।'

'আমি যাচ্ছি,' রেগে গেল এলেনা। 'পাশে থেকে লড়ব।'

'অর্ধেক পাকস্থলি নেই, বলতে পারো আধ পেটা লোক, তাই বলে বাদ পড়ব কেন, আমিও যাব,' বলল গ্রাহাম, 'বন্ধুর পাশে লড়ে মরলে নির্ঘাৎ স্বর্গ!'

মৃদু হাসল রানা। 'লণ্ডনের অর্ধেক মেয়ের অভিশাপে তোমার কপালে নিশ্চিত নরক! তাও যদি যেতে চাও, আপত্তি তুলব না। বোটে থাকবে, আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলে লেজ তুলে ভাগব যত দূরে সম্ভব। ঠিক আছে?'

'তোমরা যে লড়বে, ওরা ক'জন?' জানতে চাইল গ্রাহাম।

'এখনও জানি না,' বলল রানা।

'এক শ'জনও হতে পারে,' মন্তব্য করল এলেনা। 'এর চেয়ে কম হওয়ার কথা নয়।'

'আহা রে, বেচারারা,' বলল গ্রাহাম, 'রানা একাই তো দেড় শ'জন!'

'চাপা একটু বেশি হয়ে গেল না?' গম্ভীর হলো রানা।

'মাত্র অর্ধেক পাকস্থলি বলেই তো গ্যাসের মত বেরোয় এত কথা,' নালিশ করল গ্রাহাম। 'ভাগ্যিস দুর্গন্ধ নেই।'

'আছে কি নেই, তুমি কি জানো?' মনে মনে বলল এলেনা।

দূরের পাথুরে দ্বীপ লক্ষ্য করে সাগর চিরে ছুটে চলল বোট।

চুয়াল্লিশ

চুপ করে চেয়ারে বসে আছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। গলা থেকে খুলে ফেলেছেন টাই। যখন-তখন আসবে নতুন সব তথ্য, অথচ মানসিকভাবে তিনি তৈরি নন। দেয়াল ঘড়ির ওপর চোখ স্থির তাঁর। মাত্র আধঘণ্টা পর ওই দ্বীপে এয়ার স্ট্রাইক করবে আমেরিকান নেভি। একেকটা সেকেণ্ড যেন চিরকাল।

চমকে গেলেন ফোনের রিং শুনে। কিপ্যাডের সংখ্যা দেখে বুঝলেন, ফোন করেছে এলেনা রবার্টসন। স্পিকার বাটন টিপে দিলেন তিনি।

'আমরা এখন দ্বীপ থেকে মাত্র এক মাইল দূরে,' রিপোর্ট করল এলেনা। 'কোথাও কোনও অ্যাকটিভিটি নেই।'

সামনে ঝুঁকে বসলেন ব্রায়ান। 'তোমরা ওখানে কী করছ?'

'সরি, চিফ,' বলল এলেনা। 'আমরা হামলা করছি।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না ব্রায়ান। 'কিন্তু...'

'বড়জোর এক মিনিট, তারপর পৌঁছব,' বলল এলেনা, 'আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।'

'ও, গড!' গলা চড়ে গেল ব্রায়ানের। 'তুমি পাগল নাকি! আত্মহত্যা করবে কেন? আমাদের সংস্থার আইন অনুযায়ী...'

'সবসময় আইন মেনে চললে আপনি নিজেও এত দিনে খুন হয়ে যেতেন, চিফ,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল এলেনা। 'অতীতের কথা ভাবুন। আমাকে বাঁচাতে ওপরওয়ালার নির্দেশ উপেক্ষা করে

মাসুদ রানার দ্বারস্থ হননি আপনি? নিজের কথা না ভেবে জীবনের মস্ত ঝুঁকি নিয়ে সেদিন উদ্ধার করেছিল ও আমাকে। আমার কি কিছুই করণীয় নেই, স্যর? আপনিই বলেছেন: কখনও কখনও নিজের মন বুঝে চলতে হয়। তাই করছি। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। গোপনে হামলা করব। তারপর...'

'তারপর কী করবে?'

'রানার কাছ থেকে শুনে নিন,' বলল এলেনা, 'ওর হাতে মোবাইল ফোন দিচ্ছি।'

'মিস্টার রানা...'

'প্রতিটা পদক্ষেপে ওর চেয়ে পিছিয়ে ছিলাম,' বলল রানা, 'এবার তা না-ও হতে পারে। যাক গে, যে কারণে এলেনাকে ফোন করতে বলেছি— আমরা যা-ই করি, দেরি করবেন না, সঠিক সময়ে উড়িয়ে দেবেন ওই দ্বীপ। এর বেশি কিছু বলার নেই আমাদের।'

আরও বিষণ্ণ হয়ে গেলেন এনআরআই চিফ। কয়েক বছর ধরে চেনেন এলেনাকে। একসময় এত দৃঢ়চিত্ত ছিল না মেয়েটা। মাসুদ রানার সঙ্গে মিশে হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ আর সত্যবাদী। ওকে ঠেকাতে পারবেন না, যে পুরুষকে ভালবাসে, তাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না এলেনা। ব্রায়ান ঠিক করলেন, ওকে ফিরতে বলবেন না। কয়েক সেকেণ্ড পর জানালেন, 'মিস্টার রানা, এলেনাকে দিন।' চাপা বাতাসের আওয়াজ শুনলেন। ফোন দেয়া হয়েছে এলেনার হাতে। 'তোমরা পাবে আটাশ মিনিট, এলেনা। গুডলাক!'

ওদিক থেকে কেটে দেয়া হলো কল।

খুব ক্লান্ত বোধ করলেন ব্রায়ান। চুপ করে চেয়ে রইলেন দেয়াল ঘড়ির দিকে। কিছুক্ষণ পর টোকার আওয়াজ শুনে সোজা হয়ে বসলেন। খুলে গেছে কবাট, তাঁর ডেস্কের সামনে এসে

দাঁড়াল বিজ্ঞানী লাউ আন।

'এখন বিরক্ত কোরো না, আন,' বিমর্ষ মুখে বললেন ব্রায়ান।

'জরুরি তথ্য, স্যর,' বলল লাউ আন। 'ওটা ওই ভাইরাসের ব্যাপারে।'

পঁয়তাল্লিশ

পারস্য উপসাগরে আঁধারে ছুটে চলেছে ছোট্ট পাওয়ার বোট, লক্ষ্য দ্বীপের উত্তর তীর। ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছে রানা, এলেনা ও গ্রাহাম। দক্ষিণ থেকে আসছে হাওয়া। পিছিয়ে পড়ছে ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ। তার ওপর, আজ রাত নিকষ কালো। যদিও একটু পর উঠবে চাঁদ।

আপাতত অন্ধকারে নিচু বোট দেখা খুব কঠিন। সরাসরি তীরের মত চলেছে ছোট্ট জলযান।

কালো ওয়েট সুট পরে অপেক্ষা করছে রানা ও এলেনা। একবার থারমাল স্কোপ দেখে নিল রানা। আশপাশে কেউ নেই। ওদের বোটের ইঞ্জিন ছাড়া চলছে না কোনও যন্ত্র। তীরে ছোট ছোট চিহ্ন। ওগুলো বোধহয় পানকৌড়ির নীড়। বছরের এ সময়ে এই দ্বীপ ভরে যায় ওদের ভিড়ে।

থারমাল স্কোপ রেখে এলেনার পাশে হাত লাগাল রানা, গুছিয়ে নিল অস্ত্র। স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল পরস্পরের বডি আর্মার।

'ঠিক কতটা কাছে যাব?' প্রায় ফিসফিস করে বলল গ্রাহাম।

ধীর গতি তুলে বোট চলেছে, প্রায় কোনও ঢেউ উঠছে না।

রানার দিকে তাকাল এলেনা। বুঝতে পারছে, খুব গম্ভীর হয়ে গেছে বিসিআই এজেন্ট। তুমুল লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। কে জানে, এখন হয়তো ভাবছে মোনার কথা। ওই মেয়ে কাল্টের বিরুদ্ধে গেলে, এতক্ষণে তার সর্বনাশ করে দিয়েছে তারা। বেঁচে আছে কি না, কে জানে! হয়তো ওর সামনেই পেটাচ্ছে ওর ফুফু আর বাচ্চা মেয়েটাকে। আর কাল্টের হাতে গবেষণার ফসল তুলে দিয়ে থাকলে হয়তো খুন হয়ে গেছে এতক্ষণে!

সচেতন হলো এলেনা। 'কোনও গার্ড দেখছ, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। ঘুরে দেখল গ্রাহামকে। 'একটু পর ইঞ্জিন বন্ধ করবে। যতটা পারো তীরের কাছে গিয়ে থামবে।'

'আমিও যেতাম?' নিচু স্বরে বলল প্রাক্তন ব্রিটিশ এজেন্ট।

'না, বোটে কারও থাকা দরকার। মিসাইল পড়ার পাঁচ মিনিট আগে সরে যাবে।'

'তীরের ওরা গুলি শুরু করলে?'

'সেক্ষেত্রে তীরে ওঠার আগেই লড়তে হবে। তখন বাড়তি সময় পাব না।'

থ্রটল ঠেলে সামান্য গতি তুলল গ্রাহাম। দ্বীপের বন্দরের দিকে চলেছে। শান্ত পানি। পালকের মত ভেসে চলেছে সরু বোট। সামনে, দূরে কটা রঙের পাথুরে জেটি।

আবারও থারমাল স্কোপ ব্যবহার করল রানা। এরপর দেখল রাইফেলের ব্যারেলের ওপরের নাইট ভিশন স্কোপ দিয়ে। জেটির অনেক কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এখনও ওদিক থেকে এল না গুলি। চিৎকার করল না কেউ। ইঞ্জিনের মৃদু বিটবিট ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই।

আরও কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল গ্রাহাম।

'কপাল এত ভাল হওয়ার কথা নয়,' নিচু স্বরে বলল রানা।

জেটি থেকে এক শ' গজ দূরে বোট থেকে নেমে পড়ল ওরা, জেটির দিকে না গিয়ে সাঁতরে চলল সৈকত লক্ষ্য করে। রানা খেয়াল করেছে, বৈঠা মেরে আবারও সাগরে ফিরছে জন গ্রাহাম। দূরে গিয়ে অপেক্ষা করবে। রেডিয়ো করলেই তুমুল গতি তুলে হাজির হবে বিধ্বস্ত ফ্রেইটারের কাছে।

দু'মিনিট পর সৈকতে উঠল রানা ও এলেনা। সামনেই নাক-বোঁচা ফোক্সভাগেন গাড়ির মত এক বোল্ডার, ওখানে আড়াল নিল ওরা।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখছ?' ফিসফিস করল এলেনা।

'এখনও না,' বলল রানা।

ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরে নিয়ে খাড়া এক রিজে উঠল ওরা। থেমে গেল ওখানেই। আবারও স্ক্যান করার পর বোঝা গেল, ওরা ছাড়া আশপাশে কেউ নেই।

ডানদিকে উঁচু এক খোঁড়লের ভেতর বাসা করেছে দু'জোড়া পানকৌড়ি। তাদের মলে ভরে গেছে নিচের পাথর।

'ভুলেও ওদেরকে বিরক্ত কোরো না,' ফিসফিস করল রানা।

মাথা দোলাল এলেনা। হঠাৎ করেই এক শ'টা পানকৌড়ি আকাশে উড়াল দিলে সর্বনাশ হতে বাকি থাকবে না।

রানা রওনা হতেই পেছন থেকে কাভার করল এলেনা।

পরিত্যক্ত, পাথুরে দ্বীপের মেঝে এবড়োখেবড়ো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ করেই থেমে গেল রানা। বসে পড়ল। আগের জায়গায় থাকার জন্যে ইশারা করল এলেনাকে।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ডানে সরে বড় এক বোল্ডারের আড়ালে থামল রানা। হাতে তৈরি রাইফেল। কয়েক সেকেণ্ড পর সামনে বাড়ল। থেমে গেল আবারও। ঝুঁকে পড়ে খোঁচা দিল মাটিতে কিছুর গায়ে। এলেনা যেদিকে আছে, ওদিকে তাকাল। অন্ধকারে কালো পোশাকে আস্ত এক ভূত। সরে গিয়ে বসে পড়ে হাতের

ইশারায় ডাকল।

এক ছুটে রানার পাশে পৌঁছল এলেনা। চাপা স্বরে বলল, 'কী হয়েছে, রানা?'

'কোথাও মস্ত গণ্ডগোল আছে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'কী ধরনের?'

বোল্ডারের ওদিকে হাত তাক করল রানা।

সামনে বাড়ল এলেনা। অবাক হওয়ার মত কিছু দেখছে না। দ্বীপ জুড়ে নানান দিকে গেছে পাইপ। যেন একগাদা শেকড়। এবার বুঝল। কয়েকটা পাইপের পাশে পড়ে আছে দু'জন সশস্ত্র লোক। মারা গেছে গুলি বিদ্ধ হয়ে।

'খেয়াল করো,' বলল রানা। রাইফেলের নল দিয়ে সরিয়ে দিল একজনের শার্টের ওপরের অংশ। লাশের বুকে ব্র্যাণ্ডিং। GEN 2:17. ডক্টর মোবারক বা জুবায়েরের বুকে এভাবেই আগুনে পুড়িয়ে লেখা হয়েছে অক্ষর ও সংখ্যা।

'কাল্টের সদস্য এরা,' বিড়বিড় করে বলল এলেনা।

'গুলি খেয়েছে মাথায়,' জানাল রানা।

ঝুঁকে ক্ষত দেখল এলেনা। ছোট ক্যালিবারের গুলি। একই অস্ত্র দিয়ে হয়তো খুন করা হয়েছে ফ্রান্সের পুলিশদেরকে। লাশ স্পর্শ করল এলেনা। 'শরীর এখনও গরম।'

'বেশিক্ষণ হয়নি খুন হয়েছে,' বলল রানা।

'আসলে হচ্ছে কী এখানে?' ওর দিকে তাকাল এলেনা।

'খেলা শেষ করছে,' মন্তব্য করল রানা। 'আর সব জায়গার মতই। জোন্সটাউন, ওয়াকো, আইয়ুআম শিনরিকয়ো।'

'কিন্তু নিজেদের লোককে খুন করছে কেন?'

'অন্যসব কাল্টের সদস্যরাও কিন্তু নিজেদের লোক খুন করেনি,' বলল রানা, 'দলের বড় পদের লোকরা কাজটা করেছে।'

'কিন্তু... ওরা বিজয়ী হবে, এমন সময় এ কাজ করবে কেন?'

'এদের কাল্ট অ্যাপোক্যালিপটিক, যা খুশি করতে পারে,' বলল রানা। 'আরও বড় কোনও গোলমাল আছে। আমরা ওটা বুঝতে পারছি না।'

'শেষ করছে খেলা?' আনমনে বলল এলেনা।

'এদিকে মিসাইল আসতে বড়জোর বিশ মিনিট,' বলল রানা।

এইমাত্র নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন গাল্‌ফ্ ফোর্সের কমাণ্ডার। গাইডেড মিসাইল ক্রুযার ইউএসএস লিংকনের ব্রিজে দাঁড়িয়ে ওটা পড়ছেন ক্যাপ্টেন লরি ক্যাণ্ডেল। তাঁর আদেশের জন্যে অ্যাটেনশন হয়ে অপেক্ষা করছে কমিউনিকেশন অফিসার ও ডেক অফিসার।

নির্দেশ অনুযায়ী মাত্র একটা টার্গেটে পাঠাতে হবে পুরো আটটি টমাহক মিসাইল। সত্যিই অদ্ভুত কাণ্ড! প্রচণ্ড শক্তিশালী এসব মিসাইল বহন করবে এক হাজার পাউণ্ড হাই-এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেড, অথবা নেভির ব্যবহৃত কমবাইণ্ড বম। শেষের ওটার ভেতর থাকবে অন্তত এক শ'টা ছোট ওয়ারহেড। সেক্ষেত্রে একই সময়ে বিশাল এলাকা জুড়ে হবে বোমাবর্ষণ। চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে লক্ষ শ্র্যাপনেল মারাত্মক এক্সপ্লোসিভ কনকাশন ওয়েভ তো আছেই, তার সঙ্গে কোরের চার্জ ছাই করবে নির্দিষ্ট এলাকা। তখন তাপ হবে কমপক্ষে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মাত্র একটা টার্গেটে এত মিসাইল ফেলতে হবে, তাই অবাক হয়েছেন ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডেল। ইরাক, আফগানিস্তান বা লিবিয়ায় তারা এসব ক্ষেপণাস্ত্র ফেলেছেন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, শক্তপোক্ত কমাণ্ড স্টেশন বা কণ্ট্রোল বাঙ্কারে। প্রতিটি মিসাইলের ছিল একেকটা করে টার্গেট। কাজেই ক্যাপ্টেনের মনে হচ্ছে, একটা মশা মারতে গিয়ে হাঁকা হচ্ছে আট কোটি হাতুড়ি।

আরও কথা আছে, টার্গেট পরিত্যক্ত ছোট্ট এক দ্বীপ

অদ্ভুত নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে!

'অর্ডার কনফার্ম করেছ, লেফটেন্যান্ট?'

'ইয়েস, স্যর,' জানাল কমিউনিকেশন অফিসার, 'প্রতিটি কমিউনিকেশন প্রোটোকল ব্যবহার করার পর ভেরিফাই করা হয়েছে, স্যর। অথেনটিক অর্ডার।'

'অথেনটিসিটি নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'মনেও করি না কেউ হ্যাক করেছে আমাদেরকে। আমি আসলে জানতে চাই, টার্গেট ঠিক আছে কি না। একবার আটখানা মিসাইল পাঠিয়ে দেয়ার পর যদি জানতে পারি, ভুল জায়গায় ফেলেছি, তখন কী হবে? একেকটা মিসাইলের দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার!'

ডেক অফিসার বলল, 'স্যর, অর্ডার থেকে জেনেছি, এটা জয়েন্ট অপারেশন। স্যান ফ্রান্সিসকো আর ক্যালিফোর্নিয়া থেকেও একই পরিমাণের মিসাইল ফেলবে ওই দ্বীপে। ওদিকে স্ট্যাণ্ডবাই করা হয়েছে গাইডেড মিসাইল ক্রুযার ওয়াশিংটনকেও। এদিকে আমাদেরকে বলা হয়েছে, সঠিক সময়ে মিসাইল ফেলতে।'

অর্ডার ফর্মে আবারও চোখ নামালেন ক্যাপ্টেন।

'চব্বিশটি মিসাইল ফেলা হবে নির্দিষ্ট টার্গেটে!'

আগে কখনও এমন নির্দেশ পাননি তিনি।

'ওই দ্বীপে যা-ই থাকুক, কমাণ্ড চাইছে ওটা বাতাসে মিলিয়ে যাক,' বলল ডেক অফিসার।

নীরবে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডেল, অর্ডার শিট মুড়িয়ে অফিসারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'ঠিক আছে, মিসাইল লঞ্চ করার জন্যে তৈরি হও।'

'জী, স্যর,' সায় দিল ডেক অফিসার।

একটু পর বিকট শব্দে বাজবে জেনারেল কোয়ার্টারে অ্যালার্ম, বারবার প্রচার করা হবে: এটা কোনও ড্রিল নয়!

ছেচল্লিশ

চারপাশে চোখ রেখে বিধ্বস্ত দালান, পাম্প হাউস ও ভাঙা এক হেলিপ্যাড পেরিয়ে এসেছে রানা ও এলেনা। পরের দালান ছোট। ওটার ভেতর জ্বলছে বাতি। ওই দালান পেরিয়ে গেলে সামনে পড়বে অন্ধকার ফ্রেইটার, বো উঠে এসেছে আরেক হেলিপ্যাডের দিকে।

ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত, নিস্প্রাণ চারপাশ। যেন ধ্বংসের খুব কাছে পৌঁছে গেছে পৃথিবী। দূরের ওই ছোট্ট বাতি ছাড়া কোথাও কোনও আলো নেই। থমথম করছে সব।

কিন্তু ফ্রেইটারের দিকে কিছু দূর যেতেই আওয়াজ পেল ওরা। যন্ত্রের শব্দ। ওটাই বলে দিল, দ্বীপে এখনও জীবিত মানুষ আছে।

যন্ত্র দেখতে না পেলেও নাইট ভিশন স্কোপ দিয়ে একটু দূরে একটা পানকৌড়ি দেখল রানা। দীর্ঘ ডানা মেলে নীড়ের কাছে কী যেন করছে ওটা। আরও মনোযোগ দিল রানা। মনে হলো একটা পাওয়ার কর্ড বা ড্রিপ লাইন থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে পাখিটা।

'একটু দূরের ছোট দালানে তাপ,' জানাল এলেনা।

'ওদিকে কোনও মুভমেন্ট নেই,' বলল রানা, 'গিয়ে দেখা উচিত।' রাইফেলের নলে সাইলেন্সার আটকে নিল। আঙুলের স্পর্শে চালু করল লেসার সাইট। খুদে দালানের দেয়ালে দেখা দিল রক্তিম ছোট এক বিন্দু।

'বামে চার ফুট দূরে,' নিচু স্বরে বলল এলেনা। মন দিয়ে

দেখছে লেসার বিন্দু।

তাক ঠিক করল রানা।

'আরও এক ফুট নিচে,' বলল এলেনা।

রাইফেলের নল সামান্য নামাল রানা।

'ফায়ার!'

থিউট! থিউট!

রানার রাইফেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে দুটো বুলেট।

'আর কিছুই দেখছি না,' ফিসফিস করে বলল এলেনা।

'ওটা যাই হোক, বুলেট লেগেছে,' জানাল রানা। স্কোপের ভেতর দিয়ে দেখল। 'কিন্তু একটুও নড়েনি।'

এক দৌড়ে দালানের সামনে পৌঁছল রানা। এই বাড়ি পুরো স্টিলের। অনেক আগেই উপড়ে গেছে জানালা। একপাশ থেকে উঁকি দিল। ভেতরে কাজ করছে নতুন পাম্প। অন্যগুলো পুরনো, জং ধরা। চলছে না। নতুন মেশিনের সামনে পড়ে আছে কাল্টের এক সদস্য। গুলি খেয়ে মারা গেছে।

রানার রাইফেলের বুলেট লেগেছে, কিন্তু ক্ষত থেকে বেরোচ্ছে খুব কম রক্ত।

রানার পাশে পৌঁছল এলেনা। 'মারা গেছে?'

'আমি গুলি করার আগেই,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'দলের লোকই শেষ করছে এদেরকে।'

'অস্বাভাবিক ব্যাপার,' বিড়বিড় করল এলেনা।

রানার মনে পড়ল মোনার কথা। ওর কী করেছে কাল্টের নেতারা?

'এসো, এলেনা। হাতে সময় নেই।'

দেরি না করে একটু দূরের পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে হেলিপ্যাডে উঠল রানা, সঙ্গে এলেনা। ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে পাঁচ ফুট উঁচু দেয়াল টপকাতেই সামনে, নিচে দেখা গেল জাহাজের বো।

প্রায় কোনও আওয়াজ না করেই ডেকে চলে এল ওরা, রওনা হয়ে গেল স্টার্নের দিকে। কোথাও থেকে এল না কোনও বাধা।

রানার মন বলল, এরই ভেতর কাল্টের বেশিরভাগ সদস্যকে খতম করেছে এরা। বেঁচে নেই মোনা বা ওর আত্মীয়রাও।

ফ্রেইটারের লম্বা ডেক পেরোলে মস্ত পাথরের মত অ্যাকোমোডেশন ব্লক। হ্যাচ খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। ঘুরে দেখল কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট। একটার ভেতর পেল দু'জন মৃত লোক। তাদের একজন হুমড়ি খেয়ে আছে চেয়ারে, মাথা টেবিলের ওপর। অন্যজন পড়ে আছে ডেকে।

বসে থাকা মৃতদেহের মাথা পিছিয়ে নিল রানা। নীল হয়ে গেছে লোকটার মুখ। বিষ দিয়ে মারা হয়েছে।

জানার উপায় নেই জাহাজের কোথায় ল্যাব, বা কোথায় বন্দিরা। বাধ্য হয়েই একের পর এক কম্পার্টমেন্ট খুঁজতে হবে।

'এলেনা, তুমি মিসাইলের খোঁজে যাও,' বলল রানা, 'ঠেকাতে হবে ওগুলোকে।'

মাথা দোলাল এলেনা। 'এদিকে তুমি কী করবে?'

'ঢুকে পড়ব জাহাজের পেটে। কাল্টের লোক রয়ে গেলে তারা থাকবে অ্যাকোমোডেশন ব্লকেই। অন্যান্য জায়গা কার্গো হোল্ড।'

'সাবধান, রানা,' নিচু স্বরে বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল এলেনা।

ডেস্কের ওপর মৃত লোকটার মাথা আবারও নামিয়ে রেখে রওনা হলো রানা। প্রথম দশ ফুট খুব সতর্ক থাকল, তারপর বাধ্য হয়েই বাড়াল গতি। এক এক করে খুলে দেখছে কম্পার্টমেন্টের দরজা। কেবিন বেশিরভাগই খালি। দু'চারটার ভেতর পাওয়া গেল গুলিবিদ্ধ লাশ।

সামনের সিঁড়ি বেয়ে নামল রানা। নিচ তলাও একই রকম। লাশ ভরা জাহাজ। মনে মনে আশা করল ও, এসব লাশের ভেতর

থাকবে না মোনা, মিনতি বা মিনা ফুফুর মৃতদেহ।

জাহাজের ল্যাবে দাঁড়িয়ে আছে মোনা মোবারক। ওর পাশেই থামল নকল কাউন্ট এবং ওর সহযোগী মার্ডক। শক্তিশালী বাতির কারণে ঝলমল করছে ধাতব দেয়াল।

আরেকবার আই পিসে মাইক্রোস্কোপের ফলাফল দেখল মোনা। সফল হয়েছে কি না, তা বুঝতে হলে রোগীকে ইনজেক্ট করতে হবে ভাইরাস। কয়েক দিন পর আবার পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে সুস্থ হয়ে উঠছে কি না দেহের ডিএনএ। ওর অবশ্য ধারণা, এই ওষুধ ঠিকভাবেই কাজ করবে, স্বাভাবিক করে দেবে মিনতি বা ওর মত রোগীদেরকে।

'কাজ করছে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল মোনা, 'আলাদা হচ্ছে সেল কালচার। জায়গা মত আছে নতুন ডিএনএ।'

মরুভূমির সেই বাগান থেকে জীবন-বৃক্ষের বীজ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সিরাম। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে পরিষ্কার দেখা গেছে, ইউএন-এর সেই বাহক ভাইরাসের ভেতর জেগে উঠেছে জীবন-গাছের বীজের ঘুমন্ত ভাইরাস। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। নতুন সব কোষে দীর্ঘ হয়ে উঠছে টেলোমারগুলো।

মোনার পাশে কয়েকটা সাদা চিহ্ন দেয়া কাঁচের টিউব। ওগুলোর ভেতর জমছে নতুন ভাইরাস। এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, মিসাইলে করে ছড়িয়ে দেয়া যাবে বিশাল এলাকা জুড়ে।

'ঠিকভাবে কাজ করছে তো?' নিশ্চিত হতে চাইল কাউন্ট।

'আগে পরীক্ষা করে দেখা...'

'ল্যাবে ইঁদুর আছে,' বলল কাউন্ট। ল্যাবের পেছনে চলে গেল সে। ওখানে গার্নির ওপর হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে অসুস্থ মিনতিকে। নড়ার উপায় নেই ওর।

'ওকে ছেড়ে দিন,' চমকে গিয়ে বলল মোনা।

‘বেশি কাঁদছিল, তাই ঘুমের ওষুধ দিয়েছি,’ বলল কাউন্ট, ‘তোমার কথা ঠিক হলে মাত্র কয়েক দিনে সুস্থ হয়ে উঠবে ও।’

‘দয়া করে মিনতির ওপর পরীক্ষা করবেন না,’ অনুরোধ জানাল মোনা, ‘জানোয়ারের ওপর টেস্ট করতে পারি আমরা।’

‘ওরা কী দোষ করল?’ হাসল কাউন্ট। ‘মানুষ নয় কেন? আমি চাই তারা আমাকে ভয় করুক।’

‘ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করতে সময় লাগবে না। আপনি চাইলে আমি...’

‘সময় নষ্ট করছ, মেয়ে!’ হঠাৎ বেদম ধমক দিল কাউন্ট। ‘ভাবছ তোমাদেরকে উদ্ধার করবে কেউ— গাধী একটা!’

‘এসব ভাবছি না,’ মিনমিন করে বলল মোনা। ‘কিন্তু এই ওষুধে কাজ না হলে...’

‘সেক্ষেত্রে মরবে তোমার বোন,’ বলল কাউন্ট। ‘তখন রাস্তা থেকে যাকে খুশি ধরে এনে এক্সপেরিমেন্ট করব। মরলে মরুক, ক্ষতি কী! নতুন করে গবেষণার সুযোগ পাবে তুমি! আমার কথা কানে ঢুকেছে?’

মোনা কিছু বলার আগেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল দূরের একটা অ্যালার্ম।

‘মোশন সেন্সার,’ বলল মার্ডক। ‘অতিথি এসেছে।’

বিস্মিত হয়েছে কাউন্ট। প্রথমবারের মত অস্বস্তির ভেতর পড়ল। ‘অনেক আগেই চলে এসেছে। মাসুদ রানাকে যা ভাবতাম, ব্যাটা তার চেয়ে অনেক রিসোর্সফুল লোক।’

‘রানা আপনাকে খুন করবে,’ লোকটার বুকে ভয় ও দ্বিধা পুঁতে দিতে চাইল মোনা। ‘আমাদেরকে খুন করলে নিজেও বাঁচবেন না আপনি। নিশ্চিত থাকুন, আপনাকে ছাড়বে না রানা।’

গতকালের মত গালে চড় খাবে ভেবেছিল মোনা, তৈরিও ছিল, কিন্তু ওটা এল ঝড়ের বেগে। ছিটকে মেঝেতে পড়ল

মোনা। জলে ভরে গেল চোখ।

'ভেবেছিলে অবাক হয়েছি?' হাসল কাউন্ট। 'সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে সে; তাতে কোনও সমস্যা নেই। এটা বড় কিছু নয়। কপাল ভাল, তৈরি হয়ে গেছে ভাইরাস। এবার আসুক রানা। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার। নিজ চোখে দেখুক কী হতে চলেছে।'

'কী করবেন, প্রভু?' জানতে চাইল মার্ডক। অঢেল শ্রদ্ধা তার কাউন্টের ওপর। পনেরোজন মানুষকে গুলি করে মারার কারণে আমেরিকার এক কারাগারে নিশ্চিত মৃত্যু হতো ওর, কিন্তু ওকে সরিয়ে এনেছিল মানুষটা। দীক্ষা দেয় নতুন ধর্মে। সে ভাবতে গিয়ে বুঝে গিয়েছিল, আসলেই স্রষ্টা বলে কেউ নেই।

'ওদের মৃত্যু দেখব আমরা,' বলল কাউন্ট, 'তারপর বিদায় নেব এই দ্বীপ থেকে।'

মার্ডককে নার্ভাস মনে হলো মোনার। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক সে, কিন্তু অন্তর থেকে বিশ্বাস করে কাউন্টকে।

'মিসাইলের দিকে যাবে ওই মেয়েটা,' বলল কাউন্ট, 'ওই কাজে দক্ষ। এদিকে মাসুদ রানা দুনিয়া সেরা এসপিয়োনাজ এজেন্ট। গোপনে জাহাজে উঠে হামলা করতে চেষ্টা করবে আগেই জানি ওরা আসছে। ওকে মেরে ফেলার আগে কিছু কথা বলব।'

'আমি আপনার পাশেই থাকতে চাই,' বলল মার্ডক।

'তোমার জন্যে জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছি,' বলল কাউন্ট। 'অন্যরা মারা গেছে?'

মাথা দোলাল মার্ডক। 'জী, প্রভু।'

'গুড,' খুশি হলো কাউন্ট। 'ওদের কোনও মূল্য ছিল না। পরেরবার আরও সাবধানে ভাল লোক জোগাড় করতে হবে

আগেরটার সঙ্গে যোগ দিল আরেকটা অ্যালার্ম

'আলাদা হয়ে দু'দিকে যাচ্ছে,' বলল মার্ডক, 'একজন ডেকে

অন্যজন ঢুকে পড়েছে ভেতরে।'

'যা ভেবেছি,' হাসল কাউন্ট, 'মরতে আসছে মাসুদ রানা।'

নিচের ডেকে নেমে এসেছে রানা, সামনেই চওড়া বে। ওখানেই থামল ও। মেঝেতে পড়ে আছে কয়েকটা ক্রেট। সব ক'টা খালি, কিন্তু ভেতরে কী ছিল ভাল করেই বুঝে গেছে। আগেও এসব দেখেছে ডুক ব্রামস্ট্রির ওয়্যারহাউসে।

লোকটা বলেছিল আরেক ক্রেতার জন্যে রেখেছে ওগুলো। রানা অবাক হয়নি, সে মিসাইল বিক্রি করেছে কাল্টের কাছে। নীতি বলে কিছু নেই ওই লোকের।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। মাত্র পনেরো মিনিট পর লঞ্চ করা হবে আমেরিকান টমাহক মিসাইল।

নিচে সার্চ করছে রানা, ওদিকে মেইন ডেকে হেঁটে চলেছে সতর্ক এলেনা। চাঁদ না উঠলেও দিগন্তে দেখা দিয়েছে তার মৃদু আভা। ওর মনে পড়ল ব্রায়ান বলেছিলেন, জাহাজের সামনে কোথাও আছে মিসাইল, বসিয়ে দেয়া হয়েছে লঞ্চ রেইলের ওপর।

অ্যাকোমোডেশন ব্লক পেছনে ফেলে নানান কার্গো হ্যাচ ও কাভারের আড়াল নিয়ে চলেছে এলেনা। প্রতিটি পদক্ষেপে টের পাচ্ছে, ও আছে একেবারে খোলা জায়গায়। অনায়াসেই ওর হৃৎপিণ্ড ফুটো করতে পারবে যে-কোনও স্নাইপার।

রাত এখনও নিকষ কালো। কিন্তু আততায়ীর কাছে নাইট ভিশন স্কোপ থাকলে যখন-তখন খুন হবে। বড়জোর এক কি দুই মিনিট, তারপর চারপাশ রুপালি আলোয় ভাসিয়ে নেবে চাঁদ, তখন পরিষ্কার দেখা যাবে ওকে।

হন-হন করে হেঁটে বো-র কাছে পৌঁছল এলেনা। সামনেই দুটো ক্রেন বুম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে লঞ্চ র‍্যাম্প।

ব্রায়ান বলেছিলেন, জাহাজের সামনে ধূসর, মাইক্রোবাসের মত কী যেন। আপাতত কাঁচা হাতে তৈরি কাভার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মিসাইল।

এদের কাছে কী ধরনের মিসাইল, জানে না এলেনা। তবে লঞ্চ র‍্যাম্প আছে যখন, জিনিসগুলো হবে অনেক পুরনো। মনে মনে প্রার্থনা করল এলেনা, এতই ধচাপচা হোক, যেন উড়তেই না পারে।

হাউসিঙের পাশে থেমে আড়াল নিল, বিপদের জন্যে তৈরি। কাল্টের কেউ রয়ে গেলে, সে অস্ত্র হাতে থাকবে আশপাশেই।

কেউ গুলি করল না ওকে লক্ষ্য করে। ধাতব হাউসিং কেটে তৈরি করেছে দরজা, ওদিক দিয়ে উঁকি দিল ও। ভেতরে লঞ্চ রেইলের বুকে শুয়ে আছে টেলিফোনের থামের মত খতনা করা দুই মিসাইল। বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে চট্ করে রাইফেল পরীক্ষা করে নিল এলেনা।

এক দৌড়ে দরজা দিয়ে ঢুকে বৃষ্টির মত গুলি করবে। অপেক্ষার সময় নেই ওর। চারপাশে কেউ নেই বুঝলে প্রথম কাজ হবে মিসাইল স্যাবোটাজ করা। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে লঞ্চ করতে না পারে এসব ক্ষেপণাস্ত্র।

বড় করে দম নিল এলেনা, শক্ত হয়ে উঠেছে দেহের মাংসপেশি। ঝট্ করে উঁকি দিল দরজা দিয়ে।

সাগরের বুক থেকে উঁকি দিল চাঁদের প্রথম রুপালি আলো, কেমন ফ্যাকাসে। ওই ম্লান আলোয় এমন একটা জিনিস দেখল এলেনা, যা আশা করেনি।

দরজার নিচের দিকে মাকড়সার ঝুলের মত সরু ট্রিপওয়্যার।

সাতচল্লিশ

লাউ আনের বক্তব্য শুনতে শুনতে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের মনে হলো, যদি যুবকের কথা মিথ্যা হতো! চায়নিজ-আমেরিকান বিজ্ঞানীর মুখে তিক্ততা আর ভয়।

'সংক্ষেপে সারো,' বললেন ব্রায়ান।

'আপনার কথা মতই ওই ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলাম,' বলল আন, 'ওই ডেটা মিস রবার্টসনের সংগ্রহ করা নয়, ইউএন-এর ওই জাদুর ভাইরাস।'

'তাতে কী দেখলে? আমাদের পরিকল্পনা বদল করতে হবে বলে মনে করছ?'

'তা নয়, কিন্তু কৌতূহল জাগিয়ে দেয়া একটা দিক আছে।'

'এখন আর কৌতূহল দেখিয়ে কী হবে, আন?'

'তা ঠিক,' বলল যুবক বিজ্ঞানী, 'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন। কিন্তু...'

'তুমি জানো না কী হয়েছে,' তাকে থামিয়ে দিলেন ব্রায়ান। 'পৃথিবীর সেরা দু'জন এজেন্ট এখন ওই জাহাজে। হামলা হবে তাদের ওপর। যদি বেঁচেও যায়, ওই দ্বীপই তো মিসাইল মেরে উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। রক্ষা নেই ওদের। কাজেই, আন, তুমি বুঝবে না কেমন লাগছে আমার।'

তাঁর দুঃখিত চেহারা দেখে লাউ আনের মনে হলো, এ মুহূর্তে এই অফিসে না এলেই ভাল করত সে। কিন্তু নিজের দায়িত্ব

এড়াতে পারবে না। কাজেই নিচু স্বরে বলল, 'আপনি বুঝছেন না, স্যর। আপনার কথা মত ওই ভাইরাসের ঘুমন্ত অবস্থা পরখ করে দেখছিলাম।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন ব্রায়ান। 'তুমি না বলেছিলে ওটার ভেতর অংশ ফাঁকা? ওখানে রাখা যাবে ডিএনএ। এর বেশি কী?'

'আপনার কথাই ঠিক, ওটার ভেতর ফাঁকা অংশ আছে,' বলল আন, 'কিন্তু তখনই আরেকটা দিক দেখলাম। ওটার ভেতর রয়েছে একটা মেসেজ।'

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নামল ব্রায়ানের। 'মেসেজ? কীসের?'

আস্তে করে মাথা দোলাল আন।

'কী বোঝাতে চাইছ?' সামনে ঝুঁকলেন এনআরআই চিফ।

'আপনি তো জানেন না ডিএনএ মলিকিউল দেখতে কেমন?' জানতে চাইল আন।

'খুব ভাল করে দেখিনি।'

'ওটার পাশের ওপরের দিককে বলে নিউক্লিওটাইড্স্। মাঝের অংশ মলিকিউল— বলতে পারেন মইয়ের ধাপের মত, ওগুলোকে বলে বেসেস বা বেস জোড়া।'

'বুঝলাম। তো?'

'সাধারণ ডিএনএতে আছে বড়জোর চার ধরনের বেস। অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন আর থাইয়ামিন। আমরা ওদের বলি: এ, সি, জি আর টি।'

'বলতে চাইছ এসব বেস জোড়ায় রেখে দিয়েছে কোডেড মেসেজ,' আন্দাজ করলেন ব্রায়ান। দ্রুত জানতে চাইছেন।

মাথা দোলাল আন। 'ভাইরাসের প্রাইমারি অংশ স্বাভাবিক ডিযাইনের। মইয়ের একের পর এক ধাপ। কিন্তু একেবারে ভেতরে অন্যরকম। একই রকম ধাপ পাবেন। ডিএনএর নির্দিষ্ট

সেকশন এমনই হবে। একই রকম হবে টেলোমারদের সেকশন: টিটিএজিজিজি। কিন্তু ওই ভাইরাসে দেখলাম অন্য কিছু। নতুন করে শুরু হয়ে থেমে গেল সব, তারপর আবারও শুরু হলো নতুন করে।'

'কী ধরনের মেসেজ?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান। চট্ করে দেখলেন হাতঘড়ি। মাত্র কয়েক মিনিট পর ওই জাহাজ উড়িয়ে দেয়া হবে।

'কারণ প্যাটার্ন যথেষ্ট উপর্যুপরি নয়, বা যথেষ্ট এলোমেলো নয়। তার মানে জরুরি কোনও কারণে এভাবে তৈরি করেছে ওই ভাইরাস। একটি বেস জোড়ায় পর পর *তিনটে* ধাপ পেয়েছি আমি। দ্বিতীয় বেস জোড়ায় *নয়টা* ধাপ। তৃতীয় জোড়ায় *একটি* ধাপ। তারপর আবারও প্রথম থেকে শুরু হয়েছে সব। *তিন, নয়* আবার *এক*। *তিন, নয়* আবার *এক*। এটা খুবই অস্বাভাবিক।'

একজন জেনেটিসিস্ট বিস্মিত হয়েছে বলেই অবাক লাগছে ব্রায়ানের। 'এসবের মানে কী?'

'জেনেটিকালি কিছুই নয়,' বলল আন। 'কিন্তু তখনই মনে পড়ল আপনার কথা। বলেছিলেন এনআরআই-এ যোগ দেয়ার অনেক পরে সিআইএ থেকে ডাক পড়েছিল ডেবি ম্যাকেঞ্জির। ওখান থেকে সে যায় ইউএন অফিসে। এখন অ্যালফাবেটিকালি "তিন" নম্বর অক্ষর সি। "নয়" আসলে আই। আর "এক" হচ্ছে এ। অর্থাৎ পেলেন সিআইএ। পর পর তিনবার ওই ভাইরাসের ভেতর লেখা হয়েছে সিআইএ। আবার পাঠানো হয়েছে ভাইরাস প্রাক্তন এক সিআইএ কর্মকর্ত্রীর কাছে।'

সোজা হয়ে বসলেন ব্রায়ান। 'এর কোনও কারণ জানতে পেরেছ? এই ধরনের প্যাটার্ন কেন?'

'সিআইএর এক বন্ধুর কাছে খোঁজ নিয়েছি। যে সময়ে ডেবি ম্যাকেঞ্জি গেল ইউএন অফিসে, সে সময় আলাস্কায় ভয়ঙ্কর এক

দানব তৈরি নিয়ে কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছিল সিআইএর ভেতর। সে কারণে সিআইএ ডেপুটি চিফকে বরখাস্ত করা হলে পালিয়ে যায় লোকটা। নইলে এত দিনে জেল বা মৃত্যুদণ্ড হতো।'

'তুমি শিয়োর এসব ব্যাপারে?'

'মোটামুটি, হ্যাঁ। আমার ধারণা ওই লোকই ভাইরাস পাঠিয়ে দিয়েছে ডেবি ম্যাকেঞ্জির কাছে। হয়তো তার বিরোধিতা করেছিল মহিলা। এরপর পেলাম সাতাত্তর বেস জোড়া। এরপর আবারও এল "আঠারো", এক জোড়া "পাঁচ", এরপর "বাইশ", "পাঁচ", "চোদ্দ" "সাত", তারপর আবার "পাঁচ"। এসব সংখ্যাকে অক্ষর ধরে নিলে আপনি পাবেন একটা শব্দ— রিভেঞ্জ।'

গলা শুকিয়ে গেল জেমস ব্রায়ানের। আমেরিকান সরকারের শক্তিশালী সব সংস্থার একটি সিআইএ, ওটা থেকে বের করে দেয়া বিশেষ ওই লোকটা রনি এমসন ছাড়া কেউ নয়। এলেনা বা মাসুদ রানার প্রতিটি পদক্ষেপের থেকে এক পা এগিয়ে ছিল সে। তার জানা ছিল এনআরআই কোথায় রাখবে ডক্টর আহসান মোবারকের বোন বা মেয়েকে।

নতুন কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করলেন না ব্রায়ান, ফোন তুলে নিয়ে অটো ডায়াল করলেন এলেনার স্যাটালাইট ফোনে। বিড়বিড় করে বললেন, 'বোকা মেয়ে, ফোনটা ধরো!'

ওদিক থেকে রিসিভ করল ব্রিটিশ উচ্চারণে এক লোক। 'গ্রাহাম বলছি।'

'গ্রাহাম, দয়া করে এলেনাকে ফোন দিন,' বললেন ব্রায়ান।

পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর এল জবাব, 'সরি, দেরি করে ফেলেছেন। ওরা উঠে গেছে দ্বীপে।'

সত্যিই, দেরি হয়ে গেছে, মনে মনে আফসোস করলেন ব্রায়ান। নিশ্চিত মৃত্যু-ফাঁদের দিকে চলেছে মাসুদ রানা ও এলেনা রবার্টসন!

আটচল্লিশ

গাইডেড মিসাইল ক্রুযার ইউএসএস লিংকনের ব্রিজ থেকে অফিসারদের ব্যস্ততা দেখছেন ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডেল। গাইডেন্স কমফার্ম করার পর আর্ম করা হবে ওয়ারহেড। এরপর সরিয়ে ফেলা হবে সেফটিগুলো।

'প্রিপারেশন সিকিউয়েন্স কমপ্লিট,' ট্যাকটিকাল স্টেশন থেকে জানাল এক অফিসার। 'রেডি ভার্টিকাল সিস্টেম। টিম ফোর, সেভেন, এইট ও এলেভেন রেডি টু ফায়ার। টিম ইউনিট টুয়েল্‌ভ্‌, ফরটিন, ফিফটিন অ্যাণ্ড নাইনটিন স্ট্যাণ্ডবাই।'

জাহাজের ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডেল। তাঁরা প্রায় তৈরি। একটু পর প্রতিটি বোর্ড হবে সবুজ।

'সব সেফটি সরিয়ে ফেলবে দশ মিনিট পর,' বললেন তিনি।

লঞ্চ ট্রিগারের ওপর থেকে প্লাস্টিকের গার্ড সরানো হলে দেখা দেবে লাল ফায়ার সুইচ।

তিল তিল করে এগিয়ে চলেছে সময়।

আর মাত্র দশ মিনিট!

এরপর ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেই ফায়ার করা হবে একের পর এক মিসাইল। কালো আকাশ লাল করে দিয়ে ঘন ধোঁয়ায় সব ঢেকে জাহাজ থেকে রওনা হবে টমাহক। ওটা টিউব ত্যাগ করলে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর রওনা হবে পরের মিসাইল।

ওই একই সময়ে পারস্য উপসাগরের দুটো জাহাজ থেকে

লঞ্চ করা হবে আরও মিসাইল। মোটামুটি ষাট মাইল দূরের দ্বীপ লক্ষ্য করে ছুটবে চব্বিশটা ক্ষেপণাস্ত্র।

অর্থাৎ, চোদ্দ মিনিট পর ছাই হয়ে যাবে ওই দ্বীপ!

ঊনপঞ্চাশ

মিসাইলের ক্রেট পরীক্ষা করার পর চারপাশ সার্চ করছে রানা। সামনেই চার্ট রুম। ভেতরে একগাদা ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট। পরের কেবিন গুদাম, সেখানে প্রচুর ময়দা, চাল ও অন্যান্য খাবার। আরও এগিয়ে যেতে সামনে পড়ল সাদা এক দরজা, রাবার দিয়ে সিল করা এয়ারলক। কমার্শিয়াল বিমানের দরজার হ্যাণ্ডেলের মতই হাতল।

হ্যাণ্ডেলের একটু ওপরে ছোট, পুরু কাঁচের চৌকো জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। ওদিকে ল্যাবোরেটরি। দেখা গেল আধুনিক কিছু ইকুইপমেন্ট। এক দিকের কোণে কী যেন নড়ল।

হ্যাঁ, দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে মোনা মোবারক, কাঁদছে।

যখন-তখন খুন হবে, ভাবল রানা।

খুব সাবধানে হ্যাণ্ডেল মুচড়ে দরজা খুলল রানা, ঝট করে ঘরে ঢুকেই সরে গেল একপাশে। হাতে তৈরি রাইফেল।

'না, রানা!' ফুঁপিয়ে উঠল মোনা।

একই সময়ে বিকট আওয়াজ হলো ঘরের ভেতর। পিঠে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে সামনে বাড়ল রানা। হাত থেকে মেঝেতে খটাং শব্দে পড়ল রাইফেল। তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে হুমড়ি

খেয়ে পড়েছে বিসিআই এজেন্ট। দু'বার গড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের কোণে দেখল, পেছনের দরজায় এসে থেমেছে এক লোক। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দেখতে সে। কুড়ালের মত চেহারায় চোয়াল যেন চৌকো বাক্স। খুব কাছাকাছি নাকের পাশে সরু দু'চোখ। ঘাড়ে উলকি।

'তুমি আমার বাড়িতে আমন্ত্রিত,' বলল রনি এমসন। কাঁধে তুলেছে চায়নিজদের তৈরি এসকেএস রাইফেল।

হঠাৎ করেই গলা শুকিয়ে গেছে রানার। বিসিআই-এর ফাইলে আছে এ লোকের ছবি। সিআইএ ডেপুটি চিফ ছিল, এখন পলাতক। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চাউর হয়ে গিয়েছিল, রানাকে খুন করবে বলে খুঁজছে সে।

একে-৪৭-এর ৭.৬২ এমএম বুলেটের মতই রানার বুকে লাগল এসকেএসের দ্বিতীয় বুলেট। চিত হয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ল রানা। সামান্য ফুটো হয়ে গেছে ওর বুলেটপ্রুফ ভেস্ট। দম নিতে গিয়ে টের পেল, আটকে গেছে শ্বাস, খাবি খেল কয়েকবার। কুলকুল করে বুক থেকে নেমে বগল ভিজিয়ে দিচ্ছে রক্ত। ঝনঝন করছে কান, আবছা শুনল মোনার আর্তচিৎকার।

এক দৌড়ে রানার পাশে পৌঁছে গেছে মেয়েটা। কিন্তু তখনই দরজা দিয়ে এল আরেক লোক। গণ্ডারের মত সে। রনি এমসনের পাশে থামল।

রানাকে বসতে সাহায্য করবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোনা, বিড়বিড় করে বলল, 'সরি... সরি... রানা...'

'অ্যাই, মেয়ে!' ধমক দিল প্রাক্তন সিআইএ ডেপুটি চিফ রনি এমসন। 'সরে যাও!'

চোখের অশ্রু গাল বেয়ে নামছে মোনার। আবারও ফিসফিস করে বলল, 'সরি... রানা... সরি... আমাকে মাফ করে দিয়ো...'

সামনে বেড়ে মোনার বাহু ধরল রনি এমসনের চেলা মার্ডক,

হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল রানার কাছ থেকে।

উঠে বসতে চাইল রানা, কিন্তু গুলির আঘাতে ফুরিয়ে গেছে ওর দম। ডান বুকে ভীষণ ব্যথা। ধারণা করল, ফুটো হয়ে গেছে ফুসফুস।

'এখন তোকে দেখে মোটেও বিপজ্জনক লাগছে না,' হাসল রনি এমসন। 'অথচ বাহাদুরি কম করিসনি তুই। তোর জন্যেই নষ্ট হয়েছে আমার জীবন। হারিয়ে বসেছি সব সম্মান।'

'কার কথা বলছেন?' শ্বাস চালু হতেই আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'আমি তো আপনাকে চিনিই না। কে আপনি?'

'শালা, চিনিস না?'

রানার মাথার তিন ইঞ্চি দূরের দেয়ালে গর্ত করল বুলেট। ওর গালে চড়াৎ করে লাগল দেয়ালের একটা অংশ। ব্যথায় গাল কুঁচকে ফেলল রানা। সরিয়ে নিল মাথা।

'চিনিস না, শালা?' চিৎকার করল এমসন। 'ভুলে গেছিস কী সর্বনাশ করেছিস আমার?'

সময় আদায় করতে হবে, ভাবল রানা। ফিরছে শ্রবণশক্তি। গায়ের জোরও ফিরবে। কিছুক্ষণ পর হাজির হতে পারে এলেনা। সেক্ষেত্রে হয়তো জটিল হয়ে উঠবে পরিস্থিতি।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা।

'আলাস্কায় তোর কাজ ছিল মরে যাওয়া,' রাগী গলায় বলল এমসন। 'ওই দানবের হাতে তুই মরলে সব সামলে নিতাম আমি। কিন্তু তুই মরলি না। আর তাই সব দোষ এসে চাপল আমার ঘাড়ে।'

'এসব কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝছি না,' অবাক সুরে বলল রানা। আস্তে আস্তে সরছে প্রায়-অবশ ডানহাত।

'তোর জন্যে সিআইএ থেকে বের করে দিল!' বুনো শুয়োরের মত চিৎকার করল এমসন। 'সমাজ থেকে পালিয়ে যেতে হলো!

সবাই বলতে লাগল, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! আততায়ী লেগে গেল পেছনে! কেন? কারণ মরার কথা থাকলেও তুই আলাস্কায় মরলি না!'

কথাটা শেষ হতেই বিকট এক বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠেছে গোটা জাহাজ। দেয়ালে হাত রেখে তাল সামলে নিল রানা। বুঝে গেছে, টমাহক মিসাইলের আঘাত নয়, নইলে এতক্ষণে ছাই হয়ে যেত ওরা। চাপা গুড়গুড় আওয়াজ থেমে গেছে। ঘরে এসে ঢুকছে কালচে ধোঁয়া।

'মেঝেতে শুয়ে সেজদা কর আমাকে,' কর্কশ হাসল এমসন। 'ট্রিপওয়্যারের ফাঁদে পড়ে খুন হয়েছে তোর প্রেমিকা এলেনা। মরবি তুই। এবার পারলে বাঁচতে চেষ্টা কর দেখি, বাঙালি গুপ্তচর!' পায়ে পায়ে সামনে বাড়ছে সে। রানার গলা লক্ষ্য করে তাক করছে রাইফেলের নল। কিন্তু তখনই পিঠ কুঁজো হয়ে গেল তার। ব্যথায় কুঁচকে ফেলেছে চেহারা। ঘরে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলেছে রাইফেলের গুলি।

পৌঁছে গেছে এলেনা।

এদিকে দু'লাফে সামনে বেড়ে সিআইএর প্রাক্তন ডেপুটি চিফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। সরাসরি ধাক্কা খেল দু'জন। তাল সামলাতে না পেরে পড়ল পাশের ঘরের কাঁচের দরজায়। ঝনঝন করে ভাঙল পুরু কাঁচ। ধারালো কাঁচ ভরা মেঝেতে পড়েই পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, খপ্ করে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলল এমসনের শার্টের কলার। পরক্ষণে আরেক টানে খুলে ফেলল লোকটার বুলেটপ্রুফ ভেস্ট। গলা খামচে ধরে প্রায় দাঁড় করিয়ে দিল তাকে।

ওদিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে গার্নিতে বেঁধে রাখা হয়েছে মিনতিকে। রানার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পেছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে পড়ল এমসন। সে সামলে নেয়ার আগেই সামনে বেড়ে হাঁটু তুলে বেদম

গুঁতো দিল রানা তার পেটে। পরক্ষণে ওর কপাল নামল এমসনের নাকের ওপর। চুরচুর হলো হাড়, তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। মাথার পেছন দিক ঠুকে গেছে দেয়ালে। এখনও হাত থেকে ফেলেনি রাইফেল। ওটা ঘুরিয়েই গুলি করতে চাইল রানাকে।

কিন্তু ডানহাতে তার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে রানা, বামহাতে কেড়ে নিতে চাইল রাইফেল।

বিপদ বুঝে ট্রিগার টিপে দিয়েছে এমসন। ম্যাগাযিন থেকে অন্তত বারোটা গুলি বেরিয়ে গেল রানার পাশ দিয়ে। পরের সেকেণ্ডে আরেক পশলা গুলি খালি করল অস্ত্রটা।

কাল্টের নেতার চেলা লুকিয়ে পড়েছে একটু দূরের দেয়ালের কোণে।

রানা টের পেল, আগুনের মত উত্তপ্ত নল ধরেছে বলে পুড়ছে ওর হাতের তালু। হ্যাঁচকা টানে রাইফেল কেড়ে নিল ও, পরক্ষণে কুঁদোটা নামিয়ে দিল এমসনের মুখের ওপর। হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে প্রাক্তন সিআইএ ডেপুটি চিফ, কিন্তু সামনে বেড়ে গলা টিপে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল রানা। বামহাতের পুরো শক্তি ব্যবহার করে ঘুষি বসাল লোকটার চোয়ালে।

ভীষণ ঝাঁকি খেল এমসন, ধরে রাখা হয়নি বলেই ধড়াস করে পড়ল সে। মেঝেতে স্রোতের মত বইছে তার নাকের রক্ত।

তখনই পেছন থেকে এসে চোক হোল্ডে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরল মার্ডক। অন্য হাতে রানার মুখে বসাতে চাইল ঘুষি।

ঝট্ করে বামে ঘুরল রানা, পিছনের লোকটার কনুইয়ের দিকে। চাপ কমল গলার ওপর। এবার দুই হাতে তার দুটো আঙুল ধরে মড়াৎ করে ভেঙে দিল। 'আউহ্!' বলে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, কিন্তু রানার গলা থেকে হাত সরাল না। পায়ে পা বাধিয়ে ওকে পিছনে আছড়ে ফেলতে গেল রানা, কিন্তু তার দরকার পড়ল

না। গণ্ডারের মত লোকটার মাথায় কী যেন নামাল মোনা।

খটাং আওয়াজ হলো হাতুড়ির। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল লোকটা, কিন্তু তখনই কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল নিয়েই গুলি চালাল সে মোনাকে লক্ষ্য করে।

পেট ধরে পেছনের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মোনা, ওখান থেকে মেঝেতে। দু'হাতে চেপে ধরেছে রক্তাক্ত ক্ষত।

ওই একই সময়ে ল্যাবের মাঝখান থেকে এল গুলি।

এলেনা!

ওর গুলি বিঁধল এইমাত্র উঠে বসা মার্ডকের গলায়। পেছনের দেয়ালে ছিটকে লাগল রক্ত। চিত হলো লোকটা, আর নড়ছে না।

এদিকে উঠে মিনতির কাছে পৌঁছে গেছে এমসন, তাকে তাড়া করল এলেনার দুটো বুলেট। কিন্তু সরে গিয়ে মিনতির পেছনে লুকিয়ে পড়েছে লোকটা। ডানহাতে ধরেছে অসুস্থ মেয়েটার আইভি লাইনের ইঞ্জেকটর, বামহাত ওয়াই কানেকশনে। টুথপেস্টের মত বড় দুই টিউব আসলে সিরিঞ্জ, ওপরে বুড়ো আঙুল রাখার মত প্লাঞ্জার। একটা লাল, অন্যটা সাদা।

'আমাকে চিনেছ, মিস রবার্টসন?' কর্কশ হাসল এমসন। 'এবার মরবে তোমরা। গুলি করলে ডাবিয়ে দেব প্লাঞ্জার।'

অসহায় বাচ্চা মেয়েটাকে বর্মের মত ব্যবহার করছে কাপুরুষ লোকটা।

মেঝেতে পড়ে আছে মোনা। শার্টের পেট ভেসে যাচ্ছে রক্তে। মাত্র কয়েক ফুট দূরেই এমসন।

একবার মোনার পাশে পৌঁছুলে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, ভাবল রানা। পায়ে পায়ে রওনা হয়ে গেল ওদিকে।

মোনার চোখে-মুখে তীব্র ব্যথার ছাপ।

এমসন লুকিয়ে আছে মিনতির আড়ালে।

রাইফেল তাক করে চাপা স্বরে বলল এলেনা, 'কী চাও, এমসন? এসব করছ কেন?'

'সবসময় রাজা হতে চেয়েছি,' ফাঁকা হাসল এমসন। 'তা যখন পারিনি, ঠিক করেছি পুরো দুনিয়ার মানুষ দয়া প্রার্থনা করুক আমার কাছে। হাজার বিলিয়ন ডলার দিতে হবে আমাকে।'

'তো এসব করছ কেন? ভাইরাস নিয়ে চলে গেলেই...'

'একটু আগে পৌঁছে গেছ,' এলেনাকে বলল এমসন, 'অবশ্য অপেক্ষা করে বুঝিয়ে দিতাম, তোমরা হেরে গেছ।' মাথার ইশারায় রানাকে দেখাল। 'ওকে শেষ না করে স্বস্তি নেই আমার।'

'বদ্ধ-উন্মাদ তুমি,' বলল এলেনা।

গরম তেলে মশলামাখা পটোল পড়ার মত ছ্যাঁৎ করে উঠল এমসন। 'জানো, এই হারামজাদার জন্যে শেষ হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ার? একদল এজেন্ট কুকুরের মত তাড়া করছে আমাকে! আমেরিকা থেকে বেরিয়ে কয়েকবার খুন করতে চেয়েছি বাঙালি কুত্তাটাকে, কিন্তু প্রতিবার কপালজোরে বেঁচে গেছে। এবার সেই সুযোগ নেই! সুযোগ নেই এই দুনিয়ারও! মাফ নেই কারও!'

'তাই বলে নিজের লোকও মেরে ফেললে?' টিটকারির সুরে বলল রানা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে গার্নির দিকে এগোচ্ছে।

দাঁতে দাঁত পিষে রানাকে দেখল লোকটা। 'ওদেরকে আর দরকার নেই। কখনও বাড়তি লোক রাখি না।'

'তার মানে কাল্ট, হুমকি— সব ভুয়া?' জানতে চাইল রানা। বুঝতে পারছে, অত্যন্ত চতুর এই লোক নাকের কাছে মুলো ধরে ওকে এনেছে এই জাহাজে মনের সুখে খুন করবে বলে। তার হাতে রেযাল্ট ৯৫২ আর জীবন-বৃক্ষের ফলের বীজ। মরণ ভাইরাস ব্যবহার করলে মরবে হাজার কোটি মানুষ, বা জীবন-বৃক্ষের বীজ থেকে নেয়া ভাইরাস দিয়ে বাড়িয়ে দেবে আয়ু। যা খুশি করবে সে। ফলাফল ভয়ঙ্কর। কিন্তু এমসন সব গুছিয়ে

নেয়ার আগেই পৌঁছে গেছে ওরা। এখন পালাতে পারবে না লোকটা। আর বড়জোর দশ মিনিট পর উড়ে যাবে এই দ্বীপ।

'তুমি না নতুন ধর্ম তৈরি করছিলে?' জানতে চাইল রানা।

'ধর্ম বোকাদের জন্যে,' বলল এমসন, 'মন থেকে স্রষ্টাকে বিদায় করলে সে-জায়গায় আর কাউকে রাখতে হবে, গাধাগুলোর জন্যে সে ব্যবস্থা রেখেছিলাম।' এমনভাবে সিরিঞ্জ ধরেছে, যেন ভাল করে দেখতে পায় রানা ও এলেনা। 'এবার দুই পথের যে কোনওটা বেছে নিবি তোরা। লাল প্লাঞ্জার টিপলে মরবে এই মেয়েটা।'

রানা তিলতিল করে সরছে লোকটার দিকে। গুলি করার জন্যে চাই ভাল অ্যাংগেল। দেখল গার্নির ওপর নড়ে উঠল মিনতি, ভাঙছে ঘুম।

'তোমার মিসাইল নষ্ট করে দিয়েছি আমি,' বলল এলেনা।

'মিসাইল নষ্ট হলেও সমস্যা নেই,' বলল এমসন, 'একটা মাত্র অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না ভাল সেনাপতি। মিসাইল হলে চট্ করে ছড়িয়ে যেত ভাইরাস। আরও রাস্তা আছে। এখনও ছড়িয়ে পড়বে, তবে ধীরে। ফলাফল একই।'

ঝড়ের বেগে ভাবছে রানা। অন্য উপায়ে ভাইরাস ছিটাবে। এমসনের দিকের দেয়ালে চোখ পড়ল ওর। ওখানে ঝুলছে তরল ভরা কয়েকটা বিকার, সঙ্গে ইলেকট্রিকাল পাম্প ও সরু পাইপ। পাইপ গেছে ঘর ছেড়ে দূরে কোথাও।

হঠাৎ করেই রানার মনে পড়ল পানকৌড়ি পাখি আর ড্রিপ লাইনের কথা। নিচু স্বরে বলল, 'পাখি!'

মিনতির পেছনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমসন, খলখল করে হাসল। 'তুই সত্যিই চালাক মানুষ, মাসুদ রানা। ছয় মাস ধরে ওসব পাখিকে চিনি দেয়া মাছের ঝোল খাইয়েছি। ট্রেনিং শেষ। এবার পাম্প চালু করলেই টিউব থেকে যাবে ভাইরাস ভরা

খাবার। পাখিগুলো খুব ভাল ক্যারিয়ার। প্রথম কয়েক দিনে কাতার, দুবাই, কুয়েত জুড়ে শুরু হবে মহামারী। ওরা বলবে বার্ড ফ্লু।'

বিকারগুলো দু'ধরনের, খেয়াল করেছে রানা। মৃত্যুর জন্যে লাল দাগ। দীর্ঘ জীবন দেবে সাদা।

খুব ধীরে বিকারের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে রনি এমসন।

'নড়বে না!' ধমক দিল এলেনা। তাক করেছে রাইফেল।

হাসল সিআইএর প্রাক্তন ডেপুটি চিফ। 'সাহস হবে না যে গুলি করবে, নইলে এখনই মরবে ছোট মেয়েটা।'

ঘুম ভেঙে গেছে মিনতির। চোখ খুলেই দেখল ঘরের আরেক পাশে রক্তের পুকুরে পড়ে আছে ওর বোন। 'মোনা আপু! মিনা ফুফু কই?' ঘুমের ওষুধের কারণে মাথা কাজ করছে না ওর। তার ওপর চোখে চশমা নেই।

রানা বুঝে গেল, পুরো সচেতন নয় মেয়েটা।

হাঁ করল মোনা, কিছুই বলতে পারল না। তীব্র ব্যথায় বিকৃত হলো চোখ-মুখ। শুয়ে আছে নিজ রক্তের ভেতর। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিসফিস করল, 'রানা, সরি।' প্রায় শোনাই গেল না ওর কণ্ঠ

ইঞ্চি ইঞ্চি করে বিকার ও পাম্পের দিকে চলেছে রনি প্লাঞ্জার হাতে নিয়ে ল্যাবের মাঝ থেকে তাকে গুলি করতে পারবে না এলেনা। চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল রানা বড়জোর সাত মিনিট, তারপর টমাহক মিসাইলের আঘাতে ছাই হবে ওরা।

ডানহাত তুলল মোনা। মনে হলো অন্ধ। খুঁজছে রানাকে ফিসফিস করে বাংলায় বলল, 'রানা, আমি বদলে দিয়েছি।'

মোনার দুর্বল কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে রানা 'কী বদলে দিয়ে

... মানেই জীবন মিনতি সুস্থ হবে, কিন্তু... শত শত

বছর... বাঁচবে না। শরীরের বাইরে... বাঁচবে না ওই ভাইরাস।' চোখ বুজে পড়ে থাকল মোনা।

একইসময়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে ঝটকা দিয়ে ওয়ালথার বের করেই গুলি করল রানা। লাল প্লাঞ্জার থেকে সরে গেছে এমসনের আঙুল। নিখুঁত একটা গোল গর্ত তৈরি হয়েছে তার মাঝ বুকে। রানার দ্বিতীয় গুলি ছিঁড়ে দিয়েছে মিনতির বাহু থেকে আট ইঞ্চি ওপরের আইভি।

অবিশ্বাস্য লক্ষ্যভেদ! এমসন প্লাঞ্জারে চাপ দিলেও বাচ্চা মেয়েটার দেহে এখন ঢুকবে না ভাইরাস।

গুলিবিদ্ধ এমসনও বুঝেছে, বড্ড দেরি করে ফেলেছে। আহত শরীরে পাম্প সুইচের দিকে ঝাঁপ দিল সে।

কিন্তু ঝড়ের বেগে সামনে বেড়ে গার্নিতে ধাক্কা দিল রানা। ওটাকে ঠেলে চাপিয়ে দিল নিষ্ঠুর পিশাচটার ওপর। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বেকায়দাভাবে আটকা পড়ল লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল সুইচের দিকে। কিন্তু বুকে ভীষণ দুটো ঝাঁকি লাগতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল গার্নির ওপর। এলেনার রাইফেলের গুলি নতুন দুটো গর্ত করল তার বুকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গার্নি। পেছনের দেয়ালে ছোপ ছোপ লাল দাগ।

গার্নি পিছিয়ে নিল রানা। এক সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল রনি এমসন।

দুই সিরিঞ্জ দেখল রানা, চেপে দেয়া হয়নি প্লাঞ্জার।

আরেকবার ঘড়ি দেখল ও।

সাড়ে পাঁচ মিনিট পর আসছে মিসাইল!

'চলো, বেরিয়ে যেতে হবে!' তাড়া দিল রানা। দ্রুত হাতে খুলছে মিনতিকে আটকে রাখা স্ট্র্যাপ।

'আমি ওকে নিচ্ছি,' রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে সামনে বাড়ল এলেনা, বুকে তুলে নিল বাচ্চা মেয়েটাকে।

মোনার পাশে বসল রানা। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা, মুখে প্রশান্তি। কবজি ধরে পাল্‌স্‌ খুঁজল ও, নেই। মুঠো করা হাতে কী যেন।

মোনার ওই মুঠো খুলল রানা। হাতে একটা সিরিঞ্জ। স্ট্রিপে লেখা: লাল। মিনতির জীবনের জন্যে।

তরল ভরা সিরিঞ্জটা বুক পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। আগেই মিনতিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে এলেনা।

এক দৌড়ে বেরিয়ে এসে ঝড়ের গতি তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা। মাত্র আধ মিনিটে উঠে এল ওপরের ডেকে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে এলেনা।

রানা হাত বাড়িয়ে নিল মিনতিকে।

পরস্পরকে দেখল এলেনা ও রানা, তারপর জাহাজের রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল সাগরে।

খুব কাছেই থাকবে গ্রাহাম। ওদেরকে বোটে তুলে নিয়ে ফুল স্পিডে সরে যাবে।

ল্যাবোরেটরির ভেতর জ্ঞান ফিরল রনি এমসনের। ভয়ঙ্কর ব্যথায় মুচড়ে উঠল তার শরীর। কাত হয়ে দেখল, মেঝেতে শুয়ে আছে নিজের রক্তের ভেতর। গার্নির পায়া ধরে দাঁড়াতে চাইল, পারল না। হাঁটুর ওপর ভর করে এগোতে লাগল। বুঝতে পারছে, বাঁচার উপায় নেই। ঘৃণা চালিত করছে তাকে। না, বাঁচতে দেবে না কাউকে! ধ্বংস হোক পৃথিবী! ঘৃণা করে সে সবাইকে!

বিকারগুলোর সামনে পৌঁছে ছোট একটা টেবিলে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। টিপে দেবে পাম্পের সুইচ। এতই ব্যথা, যেন ভেঙে পড়ছে বুক। যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল একবার। ঝটকা দিয়ে অন করল লাল সুইচ, পরক্ষণে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। শুনল, গুনগুন আওয়াজে চালু হয়েছে পাম্প। গুড!

ভাইরাল সাসপেনশন চলেছে ড্রিপ লাইনের মাঝ দিয়ে।

বুজে আসছে এমসনের চোখ, জোর করে মেলে রাখল, প্রতিটি বিকার থেকে কমছে তরল। যাক, মরে গেলেও পৃথিবী জুড়ে তৈরি করেছে সত্যিকারের নরক!

তীব্র ব্যথা সহ্য করে চুপ করে মেঝেতে পড়ে থাকল মৃতপ্রায় নরপিশাচ!

ডানহাতে রেখেছে মিনতিকে, বামহাতে ডুব সাঁতার কেটে উঠতে চাইছে রানা সাগর সমতলে। পানিতে ভিজে ভীষণ ভারী হয়েছে বডি আর্মার, মনে হচ্ছে তলিয়ে যাবে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর ভুস করে ভেসে উঠল রানা। কানের কাছে শুনল গ্রাহামের কণ্ঠ: 'বড় মাছ ধরেছি!'

টেনে তোলা হচ্ছে রানাকে।

বাধা দিয়ে আগে মিনতিকে বোটে তুলে দিল রানা, তারপর উঠে পড়ল সরু ডেকে। আগেই থ্রটলের সামনে বসে পড়েছে এলেনা। মস্ত এক লাফে দক্ষিণের সাগরের দিকে ছুটল পাওয়ার বোট।

চুপ করে শুয়ে আছে রানা, প্রায় বিধ্বস্ত। ফুরিয়ে গেছে দম। চোখ রেখেছে কালো আকাশে। মাথার অনেক ওপরে ঘুরছে বেশ কিছু পানকৌড়ি। হঠাৎই সবগুলো নামতে লাগল দ্বীপের দিকে।

সর্বনাশ! ভাবল রানা, এ হতে পারে না! ড্রিপ লাইন থেকে ভাইরাস ভরা খাবার পাবে, তাই খুব খুশি উড়ন্ত পানকৌড়ির দল!

দ্বীপ পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে দ্রুতগামী বোট। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর দক্ষিণ থেকে হুইসলের মত শব্দ তুলে দ্বীপের আকাশে হাজির হলো মিসাইল— প্রথম দুটোর পর এল আরও দুই টমাহক। এরপর এল নানান দিক থেকে।

গামলার মত পাত্রে পড়ছে খাবার। ধাক্কাধাক্কি করে কালো রঙের ড্রিপ লাইনের সামনে হাজির হয়েছে পাখিগুলো। নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলছে ওরা। ঠোকর দিচ্ছে একে অপরকে।

কিন্তু হঠাৎ করেই মুখ তুলে দক্ষিণ আকাশ দেখল ওরা। অদ্ভুত এক তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসছে তাদের দিকে। মাত্র এক সেকেণ্ড পর বজ্রের মত পাথুরে দ্বীপে নামল সাক্ষাৎ মৃত্যু! হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস আগুনের তাপে মুহূর্তে ছাই হলো সব পাখি।

পাওয়ার বোটের ডেকে উঠে বসল রানা। এক মাইল দূরের দ্বীপে পড়ছে একের পর এক টমাহক মিসাইল। বিস্ফোরণের আওয়াজে মনে হলো বধির হয়ে যাবে ওরা। জ্বলন্ত সব পাথরের মস্ত সব টুকরো লাফিয়ে উঠে গেল আকাশের অনেক ওপরে। নিচে পড়তে লাগল আগুন ভরা উল্কার মত।

চোখের সামনে দেখল রানা, একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো তিনটে মিসাইল। যেন লাফ দিল আস্ত দ্বীপ। ওটাকে ঘিরে ফেলল ব্যাঙের ছাতার মত আগুনের এক প্রকাণ্ড কমলা বল। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর হয়ে উঠল কালচে মেঘের মত।

পিচ্চি মিনতিকে কোলে রেখেছে গ্রাহাম।

এখনও পুরো সচেতন নয় মেয়েটা। অবাক সুরে বলল, ‘আপু? আপু কোথায়?’

বুকের ভেতর তীব্র কষ্ট টের পেল রানা। চুপ করে চেয়ে রইল বিধ্বস্ত দ্বীপের দিকে। আরও কয়েকটা টমাহক মিসাইল পড়ল ওখানে। নতুন করে আবারও লাফ দিল দ্বীপ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ সরিয়ে ফেলল রানা।

পঞ্চাশ

এইমাত্র গাড়ি থেকে নামল রানা, এলেনা ও মিনতি।

ওদের সঙ্গে আসার কথা ছিল রানার বন্ধু জন গ্রাহামের, কিন্তু একেবারে শেষ সময়ে কাজ পড়ে যেতে ছুটেছে সে প্যারিসে।

মাত্র একঘণ্টা আগে রানা, এলেনা ও মিনতি নেমেছে হযরত শাহ্জালাল (রাঃ) এয়ারপোর্টে। কাস্টম্স্ বা ইমিগ্রেশনের দীর্ঘ লাইনে না দাঁড়িয়ে সহজেই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল সাদা, নতুন এক ল্যাণ্ড ক্রুযার। ড্রাইভার হাতে চাবি দিয়ে বিদায় নিতেই এলেনা ও মিনতিকে নিয়ে রওনা হয়েছে রানা।

শুক্রবার বিকেল, বেশিক্ষণ লাগেনি ঝড়ের গতি তুলে মাওয়ার কাছে পৌঁছে যেতে। দু'মাইল দূরে ফেরি ঘাট, ওখানেই তৈরি হচ্ছে পৃথিবীবিখ্যাত পদ্মা সেতু। কিন্তু ডানের সরু, উঁচু-নিচু, কাঁচা এক রাস্তায় নেমে এসেছে রানা। মাত্র পাঁচ মিনিট পর হাজির হয়েছে ছোট একটা একতলা হলদে বাড়ির সামনে।

কিছুদিন হলো এদিকে দেয়া হয়েছে বৈদ্যুতিক সংযোগ। কাঠের দরজার পাশে কলিং বেল দেখে টিপল রানা। ভেতরে মিষ্টি সুরে ডাকল কোকিল।

রানার পাশেই ক্লান্ত সুরে বলল মিনতি, 'এটাই দাদাভাইয়ার বাড়ি?'

'হ্যাঁ, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে,' বলল রানা, 'তোমার দাদীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমার।'

দরজা খুলে যেতেই এক মহিলাকে দেখল রানা। তাঁর পরনে সাদা শাড়ি। যেন মিনতিই, তবে বয়স অনেক বেশি।

'কাকে চাই?' ভারী চশমার ওদিকে ঘোলা চোখ।

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল,' বলল রানা, 'মিনতিকে নিয়ে এসেছি।'

সামান্য ঝুঁকে মিনতিকে দেখলেন বৃদ্ধা। 'দাদাভাইয়া, কেমন আছ? প্লেনে করে আসতে গিয়ে কষ্ট হয়নি তো?'

'না, দাদাভাই,' বলল মিনতি। 'কষ্ট হয়নি।'

'মিনতি দাদাভাইয়া, এসো তো তোমাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরি!' বললেন ডক্টর মোবারকের মা। কয়েক সেকেণ্ড পর সরে দাঁড়ালেন। 'এই দেখো, বুড়ো হয়ে গেছি তো, বসতে বলব তোমাদেরকে, সে-কথাও ভুলে গেছি! এসো, ভাই; এসো, আপু!'

মৃদু হাসল রানা ও এলেনা।

'আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না,' বলল রানা, 'অন্য এক দিন এসে চা খেয়ে যাব।'

'সে কী কথা! এত কষ্ট করে আমার দাদাভাইয়াকে পৌঁছে দিলে, আর আমি...'

'আজ বাদ থাক,' নরম সুরে বলল রানা। আগেই ফোনে ডক্টর মোবারকের মাকে সব খুলে বলেছে। শক্ত মানুষ তিনি, সামলে নিতে পেরেছেন ছেলে, মেয়ে ও নাতনী মোনার মর্মান্তিক মৃত্যু। কিন্তু এই মুহূর্তে রানার মনে হয়নি যে তাঁকে বিরক্ত করা উচিত।

পিচ্চি মেয়েটার পাশে বসে পড়ল রানা। 'মিনতি, একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, ওটা সেরে ফেলতে হবে।' শার্টের বুক পকেট থেকে ছোট একটা সিরিঞ্জ বের করেছে। ওটার তিন ভাগের এক ভাগ তরলে ভরা। খেয়াল করল, অবাক হয়ে ওকে দেখছে

এলেনা। বুঝতে পেরেছে, ওই সিরিঞ্জের ভেতর কী আছে। রানা একটিবারও এটার কথা বলেনি ওকে।

প্যান্টের পকেট থেকে ডিযইনফেক্ট্যান্ট লোশন নিয়ে মিনতির ডানহাতে লাগাল রানা। সিরিঞ্জ দেখিয়ে নরম কণ্ঠে বলল, 'তুমি না অনেক সাহসী? তা ছাড়া, এটা দিতে ব্যথা লাগবে না।'

'হ্যাঁ, আমার অনেক সাহস,' কাঁদো-কাঁদো সুরে বলল মিনতি।

'জানি তো,' বলল রানা। সাবধানে ইনজেক্ট করল সিরিঞ্জের সাদা তরল। 'ব্যস, কাজ শেষ! কয়েক দিন পর দেখবে তুমি পুরো সুস্থ হয়ে গেছ!'

ছলছলে চোখে রানাকে দেখল মিনতি। 'মোনা আপু এই ওষুধ তৈরি করেছিল, তা-ই না?'

'হ্যাঁ,' বাধ্য হয়ে স্বীকার করল রানা, 'তোমার আপু চেয়েছিল তুমি ভাল থাকো।'

মুখ নিচু করে নিয়েছে মিনতি। যেন মিনা ফুফু, মোনা বা ডক্টর মোবারকের মৃত্যুর সব দায় ওর নিজের।

রানা বা এলেনা কিছু করা বা বলার আগেই মিনতিকে জড়িয়ে ধরলেন ওর দাদী। 'একদিন আমার ছেলে, মেয়ে আর মোনার চেয়েও অনেক নাম করবে আমার দাদাভাইয়া, তাই না রে?'

বিড়বিড় করল মিনতি, 'দেখো, তাই করব, দাদাভাই!'

'আমরা এবার আসি, যোগাযোগ রাখব,' বলল রানা।

এলেনার পাশে গাড়ির দিকে পা বাড়াতেই রানা শুনল বৃদ্ধার কণ্ঠ: 'তোমাদের মঙ্গল হোক!' দরজায় নাতনির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মানুষটা, চোখ থেকে টপটপ করে ঝরল ক'ফোঁটা অশ্রু।

এক মিনিট পর গাড়ি ঘুরিয়ে ঢাকার দিকে চলল রানা। চুপ করে আছে এলেনা। হয়তো ভাবছে, এত কষ্ট করেও লাভ হলো না। দীর্ঘায়ু হওয়ার ওষুধ পেল না এনআরআই।

গাড়ি চালাতে চালাতে মৃদু হাসছে রানা।

'কী হলো, হাসছ কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল এলেনা।

'ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার,' বলল রানা। শার্টের পকেট থেকে বের করল দ্বিতীয় সিরিঞ্জ। ওটারও তিন ভাগের এক ভাগ তরলে ভরা। 'তোমাদের ভাগ বুঝে নাও।'

সিরিঞ্জ পার্সে রেখে জানতে চাইল এলেনা, 'তৃতীয় ভাগ পাবে বিসিআই, তা-ই না?'

'না, আর পাবে না,' বলল রানা, 'ওটা আগেই পেয়ে গেছে।'

'কখন পেল?' জানতে চাইল বিস্মিত এলেনা।

'যখন গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ড্রাইভার। ওই বদমাসটাই বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সোহেল আহমেদ।'

'মানে, মাঝে মাঝেই যার গল্প করো, সেই...'

'এখন ওর বাড়ির দিকেই চলেছি। আগামী কয়েক দিন আমার বাড়িতে থাকবে ও। আর তুমি থাকবে আমার সঙ্গে ওর বাড়িতে। নইলে যখন-তখন তলব করবেন বিসিআই-এর সিংহ বুড়ো।'

'তার মানে কড়া অভিভাবকদের রক্তচোখ এড়াতে প্রেমিক-প্রেমিকার মত পালাব আমরা?' ভাবতে গিয়ে মজা পেল এলেনা। 'আর খালি বাড়িতে দু'জন মিলে...'

'জরুরি কাজ নেই, ক্ষতি কী?' দুষ্টু হাসল রানা।

ঝড়ের গতি তুলে ছুটছে ল্যাণ্ড ক্রুযার।

রানার কাঁধে মাথা রেখে ভাবল এলেনা, চিরদিনের জন্যে যদি কাছে পেতাম মানুষটাকে!

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

ইসাটাবুর অভিশাপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: সায়েম সোলায়মান

‘ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। নতুন এক লোক এসেছে।’
‘কে? ট্যুরিস্ট? ...মাসুদ রানা?’
‘হুঁ।’
‘তোমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে চাইলে গিলে ফেলো। হজম করতে পারবে না?’
‘পারব। তবে দাঙ্গা লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই।’
‘ততদিন যদি না থাকে?’
‘তা হলে তো আর চিন্তাই থাকে না। যাতে মানে মানে কেটে পড়ে, সে-ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

রানার নামটা জানা আছে ওদের, পরিচয়টা নয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০